রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয়

সত্যজিৎ

বিষয় সত্যজিৎ

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নাভানা

পি-১০৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭২

প্রাক্-কথন

বিশিষ্ট বাঙালীদের সঙ্গে পাঠকদের সামগ্রিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেবার একটা দায়িত্ব এবং পরিকল্পনা নিয়েছে নাভানা। ২ মে '৮৮ সত্যজিৎ রায়ের ৬৮তম জন্মদিন। এই বিশেষ দিনটিতে নাভানা শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছে এই গ্রন্থোপচারে। পরবর্তী পর্যায়ে আরো কয়েকজন কৃতী বাঙালীর সৃজন কর্মের বিস্তারিত তথ্যের পরিচয় দিয়ে কিছু বই ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করার পরিকল্পনা আমাদের আছে।

সত্যজিৎ রায়—এই নামটির সঙ্গে বাঙালীর মর্যাদা, গৌরব এবং অহংকার প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছে। ১৯৫৫তে সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রায়ণে বাংলা চিত্রজগতের যে মাইলস্টোনটি পুঁতে দিয়েছিলেন, সেই মাইলস্টোনকে ছুঁয়ে পরবর্তী কয়েক দশকের বাংলা চলচ্চিত্র গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছে। 'পথের পাঁচালী'র পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব কিছুদিন আগে পালিত হয়েছে, যেখানে সত্যজিৎ রায়কে নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে আরম্ভ করেছেন বাংলার সুধীসমাজ। প্রায় ২৫টি চলচ্চিত্র পরিচালনার ফাঁকে ফাঁকে সত্যজিৎ শিল্পের আরো কয়েকটি দিকে নিরলস কাজ করে গেছেন। গত কুড়ি বছরে নিরবচ্ছিন্নভাবে কিশোরদের এবং বড়দের জন্য প্রায় তিরিশটিরও বেশি গ্রন্থ রচনা এবং অসংখ্য ছবি ইলাসট্রেশনের কাজে তিনি মগ্ন আছেন। এছাড়া বিগত তিনদশক কাল 'সন্দেশ' পত্রিকার সঙ্গে তিনি একাত্ম। ফেলুদার চরিত্রসৃজন বাংলা গদ্য-সাহিত্যে তাঁর একটি অদ্বিতীয় সংযোজন। এই গ্রন্থে সত্যজিৎকে শুধুমাত্র চলচ্চিত্র শিল্পের মধ্যেই আবদ্ধ রাখা হয়নি। তাঁর সামগ্রিক পরিচয় প্রকাশের প্রয়াস রয়েছে যা প্রতিমুহূর্তে সত্যজিতের নানান প্রতিভা আবিষ্কারে অবাক করে দেয়।

অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বহুশ্রমসাপেক্ষে এই গ্রন্থের লেখক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই গবেষণার কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং বাঙালী পাঠকদের সঙ্গে সত্যজিতের যোগাযোগের একটা নিবিড় মাধ্যম করে তুলেছেন এই গ্রন্থটিকে। পাঠকরা উপকৃত হলে আমাদের ভালো লাগবে। এই পর্যায়ের পরবর্তী গ্রন্থগুলি দ্রুত প্রকাশের আশা আমরা এইসঙ্গে পোষণ করছি।

পল্লব মিত্র
নাভানা-র পক্ষে

কলকাতা-৭০০ ০৭২
বৈশাখ ১৩৯৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিষয় সত্যজিৎ-এর মতো দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধকে একটি দৈনিক সংবাদপত্রে স্থান দিয়ে আজকাল-এর তৎকালীন সম্পাদক শ্রীমদন মিত্র প্রথাভঙ্গের সাহস দেখিয়েছিলেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ-বই যাঁদের সাহায্য ও পরামর্শের কাছে ঋণী তাঁরা হলেন শ্রীঅনিরুদ্ধ ধর, শ্রীউজ্জ্বল চক্রবর্তী, শ্রীদেবাশিস মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দ বিশ্বাস এবং শ্রীরঞ্জন ভাদুড়ী। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

দেশ-পত্রিকার শ্রীসাগরময় ঘোষ, যাঁর প্রেরণায় ও ছত্রছায়ায় চলচ্চিত্র-সমালোচক হিসেবে আমার আত্মপ্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠা, তাঁর কাছেও এই সুযোগে আমার অপরিসীম ঋণ স্বীকার করছি।

আমার লেখার অনেকগুলি হারিয়ে-যাওয়া ক্লিপিং আমার মা পুরনো কাগজের স্তূপ থেকে উদ্ধার করে না দিলে বইটির প্রকাশনা আরও বিলম্বিত হত। মা-র পরিশ্রমী ও সযত্ন গোয়েন্দাগিরির কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

যে মেয়েটির উৎসাহ ও প্রেরণা ছাড়া 'বিষয় সত্যজিৎ' লিখতে পারতাম না, সে আমার স্ত্রী সুকান্তা। তার কাছে আমি এত ব্যাপারে ঋণী ও কৃতজ্ঞ যে নতুন করে আর বোধহয় কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রয়োজন নেই।

র.ব.

মুখবন্ধ

'বিষয় সত্যজিৎ'-এর অন্যতম উদ্দেশ্য, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যজিৎ রায়কে চলচ্চিত্র-পরিচালক এবং সাহিত্যিক হিসেবে আবিষ্কারের কয়েকটি সূত্র ধরিয়ে দেওয়া।

'বিষয় সত্যজিৎ' ১৯৮৪ সালে 'আজকাল' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। এবং বিদগ্ধ মহলে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল।

লেখাটি শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'নাভানা' প্রকাশনার পক্ষ থেকে শ্রীকুণাল রায় ও শ্রীপল্লব মিত্র 'বিষয় সত্যজিৎ' বই আকারে প্রকাশ করার ইচ্ছে নিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমারই আলস্যে বইটি প্রকাশিত হতে প্রায় চার বছর সময় লাগলো।

সত্যজিতের প্রতিটি ছবি নিয়ে কালানুক্রমিক আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। সত্যজিতের সিনেমা এবং গল্পের মধ্যে যে মানসিকতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের যে-দ্বন্দ্ব, যে-মূল্যবোধ, সমাজচেতনা, সংস্কার, নীতিবোধ এবং নারী-পুরুষের সম্পর্ক-রচনায় যে কুণ্ঠা, আড়ষ্টতা বা ইনহিবিশন্ স্পষ্টভাবে কিংবা আভাসে-ইঙ্গিতে ধরা দিয়েছে, তার উন্মোচন এবং বিশ্লেষণই আমার উদ্দেশ্য।

অনেক সময়েই তাঁর চলচ্চিত্রের অনেক অস্পষ্ট ইঙ্গিত, তাঁর লেখার অনেক গহন ব্যঞ্জনা আমার কাছে আত্মজৈবনিক বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সেই সব আভাসিত উচ্চারণের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সব সময় সম্ভব হয়নি একটাই কারণে। তা হল, সত্যজিৎ রায়ের অন্তর্জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেবার মত গবেষণাপ্রসূত তথ্যের অভাব।

'বিষয় সত্যজিৎ' যদি এই ধরনের গবেষণার অভাব এবং প্রয়োজনীয়তাকে আরও সোচ্চার করে তোলে, যদি সত্যজিৎ রায়ের বিস্তারিত অবদানকে ভাবপ্রবণ নিছক স্তুতির চোরাবালি থেকে উদ্ধার করে নির্ভীক, স্বচ্ছ, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের নিরাপত্তায় প্রতিষ্ঠিত করার জরুরি তাগিদটুকু পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়, তাহলেই বইটি তার কাজ করেছে বলতে হবে।

১ বৈশাখ, ১৩৯৫ — রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪ এপ্রিল, ১৯৮৮

সুকান্তা-সৌপ্তিককে

॥ ১ ॥

১৯৮৪তে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের বারো বছর পূর্ণ হল। ১৯৭২-এ প্রথম মুখোমুখি আলাপ শান্তিনিকেতনে। অশনি সংকেত-এর শ্যুটিং করতে গেছেন ওখানে। আমি গেছি শ্যুটিং দেখতে আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওঁকে ইন্টারভিউ করতে। তিন-চার দিন ছিলাম। সুযোগ মত কথা হত ওঁর সঙ্গে। শ্যুটিং-এর অবসরে কিংবা রাত্তিরবেলা কাজ সেরে ট্যুরিস্ট লজে ফিরেও উনি আমাকে কিছু না কিছু সময় দিতেন। আমি কলকাতায় অবশ্য টেলিফোনে সত্যজিৎ রায়কে জানিয়েই গিয়েছিলাম যে শান্তিনিকেতন যাচ্ছি তাঁর শ্যুটিং 'কভার' করতে আমার নিজের পত্রিকা 'নৈঋ‍র্তী'র জন্যে। এইভাবেই প্রথম আলাপ। বারো বছর বড় কম সময় নয়। এই বারো বছরে সত্যজিৎ রায় সাতটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি, দুটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি (পিকু ও সদ্‌গতি) আর দুটি তথ্যচিত্র (ইনার আই, বালা) তৈরি করেছেন। পেয়েছেন আরও অনেক সম্মান, পুরস্কার। বিস্তৃততর হয়েছে তাঁর খ্যাতির পরিধি। সেইসঙ্গে সত্যজিৎকে নিয়ে আরও বিস্তারিত হয়েছে বিতর্ক, তাঁর মূল্যায়নে বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রবণতাও দেখা দিয়েছে।

এই বারো বছরে ইংরেজী ও বাংলা পত্রপত্রিকায় সত্যজিতের এই এগারটি ছবির সমালোচনা ছাড়াও সত্যজিৎ-প্রাসঙ্গিক আরও অনেকগুলি লেখা আমি লিখেছি। কখনও তাঁর ছবিতে প্রেম নিয়ে, কখনও তাঁর ছবিতে রাগ নিয়ে, কিংবা কখনও সংলাপ বা চিত্রনাট্য নিয়ে। এমনকি তাঁর তৈরি প্রচ্ছদ বা ক্যালিগ্র্যাফি নিয়েও লিখেছি, টুকরো টুকরো ভাবে। সত্যজিৎকে নিয়ে আরও বিস্তৃতভাবে লেখার যে ইচ্ছে হয় নি তা নয়, দু-একবার তোড়জোড়ও করেছি, কিন্তু নিজেই পিছিয়ে গেছি। এই পিছিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ কিন্তু আমার সত্যজিৎ-মুগ্ধতা। যখনই লিখতে গেছি ক্রমাগত মনে হয়েছে, নিবিড় মুগ্ধতার মায়াপাশ থেকে যতদিন না বেরতে পারছি, ততদিন সত্যজিৎ সম্পর্কে আমার পক্ষে বিস্তৃতভাবে কিছু লেখা সম্ভব হবে না, উচিতও হবে না। এইসঙ্গে আর একটা কথাও ক্রমশ বুঝতে পারছিলাম—সত্যজিতের কাছ থেকে নিজেকে ক্রমশ সরিয়ে নিতে হবে, ওঁর সঙ্গে বেশি বেশি দেখা হওয়াটা একেবারেই আমার লেখার পক্ষে ঠিক হবে না।

এক সময় সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি আমি প্রায় নিয়মিত যেতাম। এই যাওয়ার পিছনে সবসময়ে যে কোনও কারণ থাকত তা নয়, অকারণের কারণ তৈরি করে নিতে হত আমাকে। তাঁর কাছে যেতাম মূলত তাঁর ব্যক্তিত্বের দুর্বার টানে। সবসময়েই যে কথা বলার অনেক কিছু থাকত তা নয়। তিনি বসে কাজ করছেন, আমি সেই ঘরেই বসে আছি, বই-এর পাতা ওল্টাচ্ছি, মাঝে মাঝে দু-একটা কথা হচ্ছে, এই আপাত সীমিত পাওয়ার মধ্যেই আমার মানস-তৃপ্তির এক উর্বর ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। এখনও তাঁর সঙ্গে কথা বললে, তাঁর কাছে গিয়ে বসলে আমার সাধ্য নেই ঐ বিপুল ব্যক্তিত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়ে। এইজন্যই সত্যজিতের বিষয়ে কিছু লিখতে গেলেই প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন তাঁর কাছ থেকে কিছুটা দূরত্বের। আমি এসব ভেবেচিন্তেই তাঁর কাছে ঘন ঘন যাওয়া কমিয়ে দিলাম। বারবার দেখতে লাগলাম তাঁর ছবি। যেখানে যা কিছু বেরয় তাঁর সম্পর্কে সবকিছু পড়ি, কিন্তু তাঁর সান্নিধ্য এড়িয়ে চলি ইচ্ছাকৃতভাবে। তাঁর ছবিগুলি নিয়ে নানাভাবে ভাবতে চেষ্টা করি, এক একটা লেখাও ক্রমশ তৈরি হয় মনের মধ্যে, দানা বেঁধে ওঠে, আবার ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, বুঝতে পারি এখনও সময় হয় নি। এইভাবেই কেটেছে প্রায় গত দু-বছর। দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, যিনি সত্যজিৎ-তথ্যের একনিষ্ঠ সংগ্রাহক এবং বিপুল ভান্ডারী, তিনিও তাঁর যখের ধনের চাবিকাঠি আমার হাতে দিয়ে বলেন, তথ্যের অভাব হবে না, আপনি লিখুন। কিন্তু শুধুমাত্র তথ্য দিয়ে সত্যজিৎকে ধরব, এমন আস্পর্ধা কোথা থেকে পাই? একসময় নিমাই ঘোষও তাঁর ছবির আশ্চর্য ভান্ডার নিয়ে এসে বলেছিলেন, আসুন মানিকদার ওপর একটা বই করা যাক। কিন্তু আমিই পিছিয়ে গেছি। তবু

বীজের মত মনের মধ্যে ইচ্ছেটা বেড়েছে, ডালপালা ছড়িয়েছে। এবং আমিও মানসিকভাবে ক্রমশ তৈরি হয়েছি সত্যজিৎ রায় প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে লেখার জন্যে।

এই সময়ে নতুন করে তাগাদা এল আজকাল-এর পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে—সত্যজিৎ রায়ের ওপর যেন একটা ধারাবাহিক লেখা আমি লিখি, আর প্রতিটি লেখার সঙ্গে যেন থাকে সুন্দর সুন্দর ছবি। তবুও সাতপাঁচ ভেবে আমার আড়ষ্টতা কাটতে চায় না। ভয়, আড়ষ্টতা, একটি মূল প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই। কি লিখব নয়, কীভাবে লিখব। বলার আছে অনেক কিছু, কিন্তু কোথায় শুরু করব, কোন পথে এগোব, কোথায় শেষ করব, কতটা বলব আর কতটুকু বলব না? এসব জরুরী প্রশ্ন ক্রমে পাকে-পাকে এতই জটিল হয়ে উঠল যে সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে বিস্তৃতভাবে লেখার ইচ্ছেটা মনের মধ্যে আরও কিছুকাল ঘাপটি মেরে রইল।

যাঁর তাগিদ আমায় শেষ পর্যন্ত 'বিষয় সত্যজিৎ' লিখতে ভরসা দিল তিনি হলেন আজকাল-এর তৎকালীন সম্পাদক মদন মিত্র।

আগেই বলেছি, সত্যজিৎ রায় প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে কিছু লিখতে গেলে তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের মোহময় আকর্ষণের কাছ থেকে কিছুটা নিরাপদ দূরত্বের প্রয়োজন। ভেবেছিলাম, তাঁর কাছে ঘনঘন না গিয়ে বুঝি এমন একটা দূরত্ব গড়ে তোলা সম্ভব যাতে মুগ্ধতা জুড়িয়ে যেতে পারে, সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারি তাঁর ব্যক্তিত্বের সংক্রাম থেকে। আজ থেকে এগারো বছর আগে সত্যজিৎ রায়ের উদ্দেশে প্রকাশিত একটি খোলা চিঠিতে লিখেছিলাম: "যেহেতু জীবনের অখণ্ডতায় আপনি এখনও বিশ্বাসী, সেজন্যই আমাদের চিত্রপরিচালকদের মধ্যে আপনাকেই আমার সবচেয়ে ভারতীয় বলে মনে হয়। গোদার-এর প্রতিভা অনস্বীকার্য এ কথা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েও যে কারণে, যে-কোনও সন্ধ্যেবেলা আপনার যে-কোনও ছবি দেখতে রাজি হয়ে যাব, তা হল এই যে, মানসতায় আপনি গোদারের সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ। অনেকবার আপনার বিভিন্ন ছবি দেখে আমার এ কথা বিশ্বাস করতে ভাল লেগেছে, এমন কি কিছুটা গৌরব উপলব্ধিও করেছি হয়ত যে, গোদার যখন এক প্রমিতিহীন ইউরোপের দ্বারা স্পৃষ্ট এবং এক ব্যাপক চিত্তভ্রংশের সামনে বিভ্রান্ত, আপনার ভারতীয় মানসে দুঃখ ও আনন্দ, মঙ্গল ও অমঙ্গল, জীবন ও মৃত্যু ঠিক তখনই পরস্পরের পরিচায়ক ও পরিপূরক। আমার ভাবতে ভাল লাগে যে, কোথাও আপনার দুঃখবোধ তিক্ততার দ্বারা চিহ্নিত নয়। 'দেবী'র শেষ দৃশ্যটি অবশ্য এক উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। এবং অমঙ্গলের সমস্ত অভিঘাত সত্ত্বেও আপনি এখনও একটি অপীড়িত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণে সক্ষম। 'পথের পাঁচালী'তে ইন্দিরা ঠাকরুণের মৃত্যু-দৃশ্যটির চেয়ে নিষ্ঠুর কিছু সাম্প্রতিক ফিল্ম-এ দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। অথচ, এই যে আপনি দৃশ্যটির মর্মান্তিকতাকে কখনই সমগ্র ছবিটার লিরিক মুডকে নষ্ট করতে দিলেন না, ঠিক এই কারণে আরও গভীরভাবে মুগ্ধ করলেন আমায়। আসল কথা, আপনাকে আমার ভাল লাগে, কেননা শিল্পী হিসেবে শেষ পর্যন্ত আপনি মঙ্গলের কাছে অঙ্গীকৃত।" আজ এগারো বছর পরে আমি হয়ত আর ঠিক এইভাবে লিখব না। কিন্তু এখনও লিখতে বসে ক্রমশই বুঝতে পারছি এ লেখার শিকড় চলে যাবে সত্যজিৎকে ভাল লাগার, ভালবাসার জমিতেই। এবং এই ভাললাগার বীজও হয়ত এগারো বছর আগের মূল ক্ষেত্রটি থেকে সরে যায় নি।

সত্যজিৎ রায়কে কখনই আমি শুধুমাত্র একজন আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে ভাবতে পারি না। তাঁর কথা যখনই ভাবি মনে হয় তাঁর মত অত বড় মাপের মানুষ খুব বেশি আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর প্রতিভার প্রসার ও বৈচিত্র্য, তাঁর ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ, তাঁর বৈদগ্ধ্যের দ্যুতি—এই সবকিছুর সমন্বয় জাতে, চরিত্রে এতটাই আলাদা যে তাঁর অনন্যতা অস্বীকার করার উপায় থাকে না। তিনি ছবি করেন, ছবি আঁকেন, এবং লেখেন এবং তাঁর চলচ্চিত্রের শৈল্পিক সাফল্যের সঙ্গে পাল্লা দেয় লেখক ও শিল্পী হিসেবে তাঁর বাণিজ্যিক

সাফল্য। আমি অন্তত সত্যজিৎ বলতে বুঝি, তাঁর আশ্চর্য মন, বিরল ব্যক্তিত্ব, বিস্ময়কর বৈদগ্ধ। 'আশ্চর্য মন' বলতে বোঝাচ্ছি এমন একটি মন, বিভিন্ন ডাকে যার সাড়া দেবার ক্ষমতা, বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে সারাৎসার শুষে নেবার ক্ষমতা এবং যার বিচরণ ক্ষেত্রের পরিধি অসামান্য। সত্যজিৎকে কখনও কখনও খুব অহংকারী মানুষ বলে মনে হতে পারে। আমারও হয়েছে। কারণ একটাই—তাঁর মত প্রবল ব্যক্তিত্বের মানুষ আমরা দেখতে অভ্যস্ত নই। স্বভাবতই আমরা কুঁকড়ে যাই, এবং তাঁকে অহংকারী বা দাম্ভিক ভাবি। তাঁর মধ্যে আমি কিন্তু কখনও অহংভাব থেকে আত্ম-প্রচারের প্রবণতা দেখি নি। তার প্রয়োজনও হয় না। তাঁর ব্যক্তিত্ব এত সোচ্চার, তাঁর প্রতিভা এমনি বহুমুখী যে নিজেকে কোনভাবে জাহির করার তাগিদ তাঁর থাকার কথা নয়। তবে ব্যক্তিত্ব বায়ু-নির্ভর নয়। ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে আত্মবিশ্বাসের জমিতে। আর আত্মবিশ্বাসের গম্ভীর কাঠিন্যে আমরা এতদূর অনভ্যস্ত যে একেই আমরা অহমিকা বলে ভুল করে থাকি। সত্যজিতের সহজাত গাম্ভীর্য, আত্মবিশ্বাস এবং ব্যক্তিত্ব থেকেই যেন সরাসরি উঠে এসেছে তাঁর নিজের কথা বলার ভঙ্গি, এবং তাঁর চিত্রনাট্যের সংলাপ-শৈলী। সত্যজিৎ কথা বলেন গভীর আত্মবিশ্বাস থেকে। তাঁর ব্যক্তিত্বের ওজন তাঁর কথায় এসে লাগে। পরিমিতিবোধ ছাড়া সত্যজিতের মত ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে না। তিনি যে ইচ্ছে করে মেপে মেপে কথা বলেন তা নয়। এত পরিপাটি তাঁর মন, এত ঝকঝকে তাঁর চিন্তা, আর ভাষার ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ এমনি বিস্ময়কর যে, প্রয়োজনের কম বা বেশি তাঁকে বলতে হয় না। আমি দেখেছি, তাঁর লেখার এবং মুখের ভাষার মধ্যে তেমন কিছু পার্থক্য নেই। কী বলায়, কী লেখায়, বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই তিনি ঈর্ষণীয়ভাবে স্বচ্ছ, পরিমিত, ঋজু। আর এই তিনটি বিশেষণের মধ্যে সত্যজিৎ-প্রতিভার মূল চরিত্রটিও হয়ত ধরা পড়ে।

॥ ২ ॥

সত্যজিৎ রায়ের ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে এত কথা বললাম একটাই কারণে—তাঁর ব্যক্তিত্বের দোষগুণ থেকে তাঁর ছবিকে আমি ছাড়িয়ে নিতে পারি না। 'পথের পাঁচালী' থেকে 'ঘরে বাইরে', অর্থাৎ বিভিন্ন মানের পঁচিশটি পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের কাহিনী-চিত্র, কিন্তু প্রত্যেকটি ছবির শিকড় চলে গেছে তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে। এমন কি 'চিড়িয়াখানা'ও সবরকম অবিশ্বাস্য দুর্বলতা নিয়ে তাঁরই ছবি। সংলাপ রচনায়, সঙ্গীতের ব্যবহারে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার পদ্ধতিতে এবং একাধিক দৃশ্যের পরিমিত বিন্যাসে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট। চিড়িয়াখানার (১৯৬৭) এক বছর আগেই তিনি তৈরি করেছেন 'নায়ক', যেটিকে আমি অন্তত মনে করি সত্যজিতের সবচেয়ে ইউরোপীয়ান ছবি। আর চিড়িয়াখানার পরের বছরেই তিনি করলেন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। বোঝাই যাচ্ছিল রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, পরশুরাম, তারাশংকরের কাছে ক্রমাগত ঋণ করতে তাঁর আর ভাল লাগছে না। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও পরশুরামের দুটি ছোটগল্প থেকে তিনি তৈরি করলেন একেবারে ভিন্ন স্বাদের দুটি ছোট ছবি, 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ', ১৯৬৫ সালে। এরপর উত্তমকুমারকে নিয়ে একটা ছবি করবেন ভেবেই তিনি নিজেই লিখলেন 'নায়ক'-এর কাহিনী। তাঁর শাণিত বুদ্ধি, তাঁর ব্যক্তিত্বে গাম্ভীর্য ও হিউমারের সমন্বয়, আধুনিক রুচি এবং ভাবাবেগ বর্জিত পরিমিত কাহিনী বিন্যাসের প্রতি তাঁর সাবলীল প্রবণতা—এই সব কিছু থেকে নায়ক-এর জন্ম। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' (১৯৬২) এবং 'নায়ক'—এই দুটি ছবিতে সত্যজিৎ সবচেয়ে বেশি আধুনিক, হয়ত সবচেয়ে বেশি সাবলীল এবং সাহসীও। অন্তত, এই দুটি ছবি যে তাঁর, শুধুমাত্র তাঁরই ব্যক্তিত্বের অঋণী অভিপ্রকাশ, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-ও 'নায়ক'-এর মত অন্যের লেখা কাহিনীর বীজ থেকে জন্ম নেয় নি। এবং নায়ক-এর মতই কাঞ্চনজঙ্ঘা জন্ম মুহূর্ত থেকেই

সিনেমা। সত্যজিৎ মনে-মনে যে কাহিনী দুটি ভেবেছিলেন, নায়ক এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার চিত্রনাট্য হিসেবেই তা লেখেন। চলচ্চিত্রের বাইরে এ-দুটি কাহিনীর আর কোনও সার্থকতা নেই, এমন কি অস্তিত্বই নেই। সাহিত্যধর্মিতা সত্যজিৎ রায়ের ছবির চরিত্রলক্ষণ। তাঁর সব দূরাভিসারী চলচ্চিত্রই ধ্রুপদী সাহিত্যের কাছে ঋণী—এতটা বললেও অত্যুক্তি হবে না। শুধু মাত্র কাঞ্চনজঙ্ঘা ও নায়ক-এর সঙ্গে সাহিত্যের কোনও সরাসরি সম্পর্ক নেই। এই দুটি ছবির চিত্রনাট্যে সাহিত্যগুণ আছে কি না, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

বলা যেতে পারে এই দুটি ছবিতেই আমরা সত্যজিৎ রায়ের ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বিস্তৃত এবং নির্ভেজাল পরিচয় পাচ্ছি। ছবি দুটি মেজাজে, আঙ্গিকে, বিন্যাসে একেবারে আলাদা। কিন্তু একটি কাহিনী বা সিচুয়েশনকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরতে গেলে সর্ব প্রথম প্রয়োজন ছন্দবোধের। বাংলা সিনেমায় নাচ, গান, সঙ্গীতের যত বাড়াবাড়ি, ছন্দজ্ঞানের তত অভাব। ছন্দময় সুষমা সত্যজিতের ছবির সবচেয়ে বড় গুণ। এই ছন্দ প্রতিটি ছবিতে তিনি গড়ে তোলেন টুকরো-টুকরো উপাদানের মধ্যে গভীর পারস্পরিকতা স্থাপন করে। প্রতিটি দৃশ্যে ক্যামেরা-অ্যাঙ্গেলের সঙ্গে আলোক সম্পাতের, আলোর সঙ্গে সঙ্গীতের, সঙ্গীতের সঙ্গে সংলাপের, সংলাপের সঙ্গে অভিনয়ের এবং অভিনয়ের সঙ্গে বিশেষ দৃশ্যটির মুডের এবং সব রকম নিখুঁত অনুপুঙ্খের কোথাও যেন গরমিল না থাকে—এই হল চলচ্চিত্রের ছন্দের জন্ম-রহস্য। তবে যে কোনও ভাল ছবিতে স্ট্রাকচারাল রিদম-এর যে নিটোল রূপটি আমরা শেষ পর্যন্ত পাচ্ছি তার উৎস ছবিটির এডিটিং বা কাটছাঁটের প্যাটার্ন। কিন্তু এ-কথাও একই সঙ্গে সত্যি যে একজন বড় চিত্রপরিচালক যখন চিত্রনাট্য লেখেন, তখন এডিটিং-এর মূল কাঠামোটা তাঁর মাথাতেই থাকে। প্রতিটি টেক-এর পিছনে যদি এডিটিং-এর ছন্দময় চরিত্রের এতটুকু আভাসও না থাকে, আমার মনে হয় না সত্যিই এডিটিং টেবিলে ছবিটির সামগ্রিক স্ট্রাকচারাল রিদম-এর কোনও রকম ঘনবদ্ধতা নিয়ে আসা সম্ভব। সত্যজিৎ রায় সেই সব চলচ্চিত্রকারদের অন্যতম যাঁরা চিত্রনাট্য লেখার সময় থেকেই এডিটিং টেবিলে ছবিটার কাটছাঁটের অনুপুঙ্খ নিয়ে ভাবতে পারেন। ফলে, তাঁর ছবিতে কাহিনী এগিয়ে চলে, ঘটনা ঘটে, চরিত্রগুলি ক্রমশ যে যার স্বাভাবিক পথে বিবর্তিত হয় অন্তর্লীন ছন্দের দাবিতেই।

বাংলা সিনেমায় কদাচিৎ দেখি কাহিনী এগিয়ে চলছে ছবিটির স্ট্রাকচারাল রিদম-এর অমোঘ দাবিকে মেনে নিয়ে। তার কারণ একটাই, অধিকাংশ পরিচালকের ছন্দের সূক্ষ্ম জ্ঞান নেই বললেই চলে। সত্যজিতের ছবিতে যে ছন্দময়তা আমাদের মুগ্ধ করে, সেটা ওঁর একেবারে ভেতরের ব্যাপার, ব্যক্তিত্বের অঙ্গ। পরিমিত সংলাপ, অযথা নাটুকেপনা বা ভাবাবেগের বর্জন, চরিত্রায়ণের অকৃত্রিম সাবলীলতা, ঘটনা বিন্যাসে আপাত সহজ পারম্পর্য—এই সব কিছুই সত্যজিতের ছবিতে এক অন্তর্লীন ছন্দের বশ্যতাকে স্বীকার করে নেয়। এবং এই ভাবেই, প্রতিটি ছবিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর ব্যক্তিত্বের আধিপত্য।

সত্যজিতের ছবির নিজস্ব চরিত্র গড়ে উঠেছে এক আপাত দ্বন্দ্ব বা বিরোধ থেকে। তাঁর ছবিতে তিনি অপ্রয়োজনে গান কখনও নিয়ে আসেন না। তাঁর ছবি এক অর্থে গান বর্জিত। অন্যধারে তাঁর ছবির শরীরী লাবণ্য গড়ে ওঠে সাঙ্গীতিক ছন্দ থেকে। সন্দেহ নেই, তিনি সচেতন ভাবেই গড়ে তুলতে পারেন এই সাঙ্গীতিক ছন্দ। এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হবে যে সত্যজিতের ছবির ছন্দময় গঠনের পিছনে রয়েছে পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়ের বিস্তৃত অবদান। তিনি সচেতন ভাবে তো তাঁর ছবির শরীরের ছন্দকে গড়ে তুলছেনই পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্ট্রাকচারাল ব্যঞ্জনা থেকে। এ-ছাড়া সত্যজিতের অবচেতন মনে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব এতদূর আধিপত্য বিস্তার করেছে বলে মনে হয় যে তাঁর ছবির সাঙ্গীতিক গঠনের সঙ্গে পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের আত্মীয়তা যেন নিরন্তরভাবে প্রবহমাণ।

সত্যজিতের ছবির ছন্দে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রভাব কিন্তু তেমন ভাবে পাইনি। ভারতীয় সঙ্গীতে রাগ যেভাবে আলাপ থেকে বিস্তারিত হয় তুঙ্গ মুহূর্ত পর্যন্ত, সেই স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন বা শরীরী গঠনের কোনও স্পষ্ট প্রতিধ্বনি আমি সত্যজিতের ছবিতে দেখতে পাই না। যা পাই তা হল বিচিত্র উপাদান থেকে গঠিত পাশ্চাত্য সিম্ফনির শরীরী প্রভাব। পাছে আমাকে কেউ ভুল বুঝে বসেন সেই ভয়ে একটা কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন। সত্যজিতের ছবির ছন্দময়তা বা সাঙ্গীতিক কাঠামো বলতে কিন্তু আমি এখানে আবহসঙ্গীতের কথা বোঝাচ্ছি না। আমি বোঝাচ্ছি তাঁর ছবির কাঠামোর অন্তর্নিহিত ছন্দ। এবং এই স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন থেকেই বোঝা যায় বাখ, বেঠোফেন, মোৎসার্ট, চাইকভ্স্কি, হাইডেনবার্গ এবং শুবার্টের সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর স্মৃতির, তাঁর অবচেতন মনের নিবিড় সম্পর্কের কথা।

আগেই বলেছি সত্যজিৎ-চলচ্চিত্রের পরিমিতি বোধ তাঁর ব্যক্তিত্বের অঙ্গ। এই পরিমিতির শিকড় তাঁর বৈদগ্ধ্য এবং তাঁর মানস গঠনের মধ্যেও চলে গেছে। ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে তাঁর বিস্তৃত পরিচিতির প্রভাব রয়েছে এই পরিমিতিবোধের মধ্যেই। বিশেষ করে তাঁর ছবির স্টাইলে, বিন্যাসশৈলীতে অবশ্যই দেখতে পাওয়া যায় ভারতীয় মিনিয়েচার পেন্টিং-এর প্রভাব। মিনিয়েচার পেন্টিং-এ যেমন আকাশের গায়ে কয়েকটি সাদা ফোঁটা কিংবা কোনও মেয়ের উত্তাল আঁচল থেকে বোঝান হয় বৃষ্টি কিংবা ঝড়ের ব্যঞ্জনা, তেমনি সত্যজিৎ রায়ও তাঁর ছবিতে ছোট্ট দু-একটি ইঙ্গিত থেকে উপড়ে আনতে পারেন অর্থের গভীর ও বিস্তৃত আবহ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সত্যজিতের ছবির সাঙ্গীতিক গঠন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মত যত বিস্তৃত, তাঁর ছবির দৃশ্যগত কাঠামো কিংবা ভিশুয়াল স্ট্রাকচার এবং চিত্রনাট্যের ও চরিত্রায়ণের স্টাইলে পাশ্চাত্য কলাশিল্পের প্রভাব কিন্তু সেই তুলনায় অত্যন্ত ক্ষীণ। তবে একই সঙ্গে এ কথাও আমার মনে হয় যে, সত্যজিতের ছবিতে অনুপুঙ্খ বা ডিটেলের ব্যবহার যত বিস্তারিত ভাবে আসে তার মূলে আছে পাশ্চাত্যের রেনেসাঁস শিল্পীদের প্রভাব। বিশেষ করে তাঁর চলচ্চিত্রের কোনও কোনও ভিশুয়ালে কিংবা কোনও বিশেষ মুডের বিস্তারে একই সঙ্গে মিশে থাকে পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীত ও কলা-শিল্পের প্রভাব। তাঁর ছবির দৃশ্যগত কাঠামো এবং সিচুয়েশন ও চরিত্রের বিন্যাসে ভারতীয় শিল্পের সূক্ষ্ম অবদান আশ্চর্যের কিছু নয়। বরং স্বাভাবিকই। মনে রাখতে হবে বিশ্বভারতীর ছাত্র হিসেবে তিনি নন্দলাল বসু, রামকিংকর বেইজ এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এঁদের প্রভাব থেকেই তাঁর পরিমিতিবোধ এবং আবেগবর্জিত সফিসটিকেশনের সূচনা। আর একটা কথা কেউ তেমন ভাবে বলেননি কেন জানিনা। কথাটা কিন্তু খুবই জরুরী। আমার মনে হয় সত্যজিতের ছবির আঁটসাঁট বাঁধন, অল্প কথা, দৃশ্য এবং আবহসঙ্গীতের বিপুল ব্যঞ্জনা বহনের ক্ষমতা উঠে আসছে আধুনিক বিজ্ঞাপনের ব্যাকরণ এবং স্টাইলের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচিতির জমি থেকে। সংক্ষিপ্ততম স্থান এবং বিস্তৃততম বার্তা : আধুনিক বিজ্ঞাপনের এই হৃদয়-সমাচার সত্যজিতের স্টাইলকে অবশ্যই দিয়েছে চারিত্র্য এবং ঋদ্ধি। মনে রাখতে হবে তিনি চলচ্চিত্রে এসেছিলেন বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্র থেকে একেবারে সরাসরি। টালিগঞ্জের কোনও স্টুডিওতে তিনি শিক্ষানবিশি করেন নি। চলচ্চিত্রের পরিচালক হতে গেলে যে ভিশুয়াল সেন্স-এর প্রয়োজন তা তিনি শিখেছিলেন সাবানের মোড়ক ডিজাইন করতে করতেই হয়ত। আর তাঁর শিক্ষাভূমি ছিল চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশকের একেবারে প্রথম দিকে তৈরি হলিউডের ছবি। তিনি অন্ধকার ঘরে বসে ছবি দেখতে দেখতেই নোট নিতেন। এবং বেশির ভাগ নোট-ই ছিল ছবিগুলির এডিটিং সম্পর্কে, বিশেষ করে সে ছবি হত ওয়াইল্ডার কিংবা ফোর্ড-এর। অনেক পরে তাঁর মনে ইউরোপীয় ছবির ঢেউ এসে পৌঁছয়। বিশেষভাবে তাঁকে প্রাণিত করে রেনোয়া ও ডে সিকার ছবি। একটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বিজ্ঞাপনের শিল্প পুরোপুরি বাণিজ্যিক। চলচ্চিত্রের প্রেরণাও কি বাণিজ্যিক? সত্যজিৎ রায় নিজেই বলেছেন,

'যদি কেউ বলেন, চলচ্চিত্র হল বাণিজ্যিক শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তাহলে তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া করার কিছু নেই।'

আবার 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র প্রসঙ্গে ফিরে আসি। প্রথমেই বলেছি, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সত্যজিতের সবচেয়ে সাহিত্য-অনির্ভর, সবচেয়ে সাহসী এবং সবচেয়ে আধুনিক সিনেমা। সবচেয়ে সাঙ্গীতিক ছবিও 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। অনেকে হয়ত বলবেন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সত্যজিৎ-পরিচালিত একমাত্র বিশুদ্ধ চলচ্চিত্র বা পিওর সিনেমা। বিশুদ্ধ চলচ্চিত্রের ধারণায় আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাসী নই। আমার মনে হয় এই ধারণা চলচ্চিত্রের চরিত্র এবং সংজ্ঞার বিরোধিতাই করছে। চলচ্চিত্র নির্ভুল ভাবে সংকর-শিল্প। বিচিত্র শিল্পের উপাদানের বিস্তৃত মিশ্রণ ঘটেছে চলচ্চিত্রের মধ্যে। চলচ্চিত্রের যদি কোনও শুদ্ধতা থাকে তবে সেই শুদ্ধির শিকড় নিহিত রয়েছে এই বিচিত্র উপাদানের সমন্বিত অবদানের মধ্যে। সঙ্গীত, শিল্পকলা, গ্রাফিকস, অভিনয়, নাটক, সাহিত্য সবকিছুর ক্রস-ফার্টিলাইজেশন বা সংকর-প্রজনন থেকেই চলচ্চিত্রের জন্ম। এই প্রেক্ষিতে বিচার করে বলছি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সত্যজিতের সবচেয়ে সাহিত্য-অনির্ভর ছবি, যদিও এ ছবিতে সাহিত্যগুণ, বিশেষ করে কাব্যগুণ প্রবলভাবে বিদ্যমান। এই কাব্যগুণ এসেছে ছবিটির সাঙ্গীতিক কাঠামো, ভিশুয়াল বিন্যাস এবং কাহিনীর বাহুল্যবর্জিত মিতভাষ বিস্তার থেকে। দার্জিলিং-এর প্রেক্ষাপটে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র সংক্ষিপ্ত কাহিনী যার সময়কাল প্রায় অ্যারিস্টটলের অমোঘ নির্দেশ মেনে নিয়ে, একটি দিনের মধ্যেই সীমিত। পাঁচটি কোম্পানির চেয়ারম্যান ইন্দ্রনাথ চৌধুরী এসেছেন দার্জিলিং-এ বেড়াতে। সঙ্গে স্ত্রী লাবণ্য, শ্যালক জগদীশ, ছেলে অনিল, ছোট মেয়ে মনীষা, বড় মেয়ে অণিমা, জামাই শঙ্কর এবং দু বছরের নাতনি টুকলু। এ ছাড়া ছবিতে রয়েছে অশোক নামের এক বেকার যুবক, অশোকের বাবা শিবশঙ্কর, প্রণব ব্যানার্জি নামের এক বিলেতফেরত যুবক, এবং অনিলের দুই বান্ধবী লিলি ও শীলা। মাত্র একটি বিকেলের মধ্যেই এই এতগুলি চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কে দেখা দিচ্ছে নানা অপ্রত্যাশিত টানাপোড়েন, ওলটপালোট। আমি গল্প বলার মধ্যে যাচ্ছি না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে এই কাহিনীর সংক্ষিপ্ত প্রসার এবং চরিত্রগুলির পরিপাটি বিন্যাসের ভারসাম্য যা ফুটিয়ে তোলে তা হল 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র মিউজিকাল স্ট্রাকচার, অন্তর্লীন ছন্দ। বলতে গেলে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় তেমন কোনও গল্পই নেই। এখানে যা পাই তা হল একটি সিচুয়েশনের ছান্দিক বিস্তার ও বিশ্লেষণ। এই ছন্দময়তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি হয়ে আছে আশ্চর্য তীব্র ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'ই সত্যজিতের প্রথম রঙিন ছবি। হয়ত এমন ইন্দ্রিয়-ঘন রঙের ব্যবহার, রঙের স্পর্শময় বৈচিত্র্য তাঁর আর কোনও ছবিতে আমরা পাই না। কোথায় যেন তাঁর এ ছবির রঙ-কল্পনার মধ্যে চেকোভিয়ান কল্পনার প্রতিভাস ছড়িয়ে আছে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র কাব্যগুণ শুধু যে ছবিটির শরীরী গঠন, ভিশুয়াল আবেদন, সিচুয়েশনের বিস্তার ও বিশ্লেষণ, চরিত্রের ব্যাখ্যা এবং রঙের ব্যবহারের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে, তাই নয়, এই কাব্যগুণের আর এক অনস্বীকার্য উৎস হল ছবিটির আগাগোড়া রোম্যান্টিক এলিজির সুর।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র কোথাও কোনও উঁচু পর্দার নাটকীয়তা নেই। সমস্ত ছবিটাই যেন সূর্যাস্তের মত স্তিমিত সৌন্দর্যের আধার। আগাগোড়া ভাবাবেগের বর্জন সত্যজিতের পরিমিতিবোধের এক তুঙ্গস্পর্শী উদাহরণ। ১৯৬২ সালে সত্যজিৎ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' তৈরি করেছিলেন। গত ছাব্বিশ বছরে এই সাহসী, প্রায় বিপ্লবী পথে তিনি আর পা বাড়াননি। হয়ত সময়ের চেয়ে অনেক আগেই তিনি এ ছবি তৈরি করে ফেলেছিলেন। এ ছবির দাবি মেটাবার মত দর্শক তখনও তৈরি হয়নি। শুধু মাত্র একটি সিচুয়েশনকে ঘিরে পালকের মত পাতলা কাহিনী-নির্ভর ছবি তিনি যে আর তৈরি করলেন না, সেটা আমাদের চলচ্চিত্রের দুর্ভাগ্য। তিনি পরবর্তী সতেরোটা ছবির জন্যে বেছে নিলেন সাহিত্য-নির্ভর 'নাটকীয়' বিস্তৃতির আরও নিশ্চিত পথ। তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্ভার, তাঁর ইনটেলেকচুয়াল ঐশ্বর্যের অবদান এবং তাঁর পরিমিতিবোধের শাসন, সবকিছুই এ-সব ছবিতেও

সোচ্চার। তবু সাহিত্য-নির্ভরতার পথ বেছে নেওয়ায় তিনি নানা দিক থেকে সীমিত হয়েও পড়েছেন। কেমন করে, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

।। ৩ ।।

'পথের পাঁচালী'র প্রসঙ্গে আসার আগে সামান্য একটু ভূমিকার প্রয়োজন আছে। 'পথের পাঁচালী' ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যতই বিস্ময়কর ঘটনা হোক না কেন, ছবিটি আকস্মিক কিংবা ভুঁইফোঁড় নয়। 'পথের পাঁচালী'র মত ছবি কেউ দুম্ করে তৈরি করে ফেলতেও পারেন না। শুধু প্রতিভার মদত নয়, এইরকম একটা ছবির জন্যে প্রয়োজন বিস্তৃত প্রস্তুতি।

ইকোনমিক্স নিয়ে বি এ পাস করার পর ১৯৪০ সালে সত্যজিৎ রায় গেলেন বিশ্বভারতীতে ফাইন আর্টস-এর ছাত্র হয়ে। এখানে নন্দলাল বসুর সান্নিধ্যে আসেন তিনি। নন্দলালের প্রকৃতিবীক্ষণ এবং মানুষের প্রতি গভীর মমতাবোধ সত্যজিৎকে প্রভাবিত করে। এবং তাঁর ছবিতে এই প্রভাব অনস্বীকার্য ভাবে উপস্থিত। তেমনি সত্যজিতের ছবিতে জীবনের রুক্ষতা, কঠোরতা এবং তীব্রতা যে তেমনভাবে চীৎকার করে উঠে আমাদের বুকের শিরা ছিঁড়ে ফেলে না তার কারণও হয়ত শেষপর্যন্ত বিশ্বভারতীর, বিশেষ করে নন্দলালের রোম্যান্টিকতার প্রভাব। একদিকে নন্দলালের সরাসরি প্রভাব, অপরদিকে ব্রেস'র মোলায়েম মানবিকতার প্রতি সত্যজিতের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা : এই সমন্বয়ের জমিতেই তৈরি হচ্ছিল পথের পাঁচালীর প্রস্তুতি পর্ব। ঠিক এই সময়ে বিশ্বভারতীর লাইব্রেরিতে সত্যজিতের হাতে এল পল রোথার লেখা 'ফিল্ম টিল নাউ' এবং সিনেমার থিওরি নিয়ে আর্ন হিম এবং স্পটিস উডের লেখা 'ফিল্ম' এবং 'এ গ্রামার অফ দ্য ফিল্ম' এই দুটি বই। তবে শান্তিনিকেতনে সিনেমা দেখার, বিশেষ করে বিদেশী সিনেমা দেখার কোনও সুযোগ ছিল না। সত্যজিৎ নিজেই লিখেছেন, 'এখনও ভাবলে দুঃখ লাগে যে শান্তিনিকেতনের কাঠফাটা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আমি যখন শিমুল আর পলাশের ছবি আঁকতে ব্যস্ত সেই সময় কলকাতার সবচেয়ে নতুন আর সবচেয়ে বড় প্রেক্ষাগৃহে অরসন ওয়েলস-এর সিটিজেন কেন মাত্র তিন দিনের জন্য এসেই চলে গিয়েছিল।' বিদেশী ছবি বলতে অবশ্য শুধুমাত্র হলিউডের ছবি দেখারই সুযোগ হত এই সময়। সত্যজিৎ নিজেই স্বীকার করেছেন, 'ফরাসী, জার্মান আর সোবিয়েত সিনেমার দিকপালদের নাম আমি শুধু সাইট অ্যান্ড সাউন্ড পত্রিকার পাতাতেই তখন দেখতাম। তাঁদের ছবি দেখার কোনও উপায় তখনও ছিল না। সৌভাগ্যবশত ঠিক এই সময় ইউরোপের কিছু নামকরা পরিচালক হলিউডে গিয়ে ছবি করতে শুরু করেন। হলিউডের ছবির মাধ্যমেই রেনোয়া ও ক্লেয়ারের মত পরিচালকের সঙ্গে আমি পাই প্রথম পরিচিতির পুলক। এর পরেই বেশ কিছু সোবিয়েত ফিল্ম কলকাতায় আসে। উত্তর কলকাতার একটি প্রেক্ষাগৃহে আমি ইভান দ্য টেরিবল প্রথম দেখি। সে অভিজ্ঞতা ভোলার নয়।' সত্যজিৎকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করে ইভান-এর ভূমিকায় চেরকাসভ-এর অভিনয়ের মহান ভঙ্গি, প্রোকোফিয়েভ-এর অবিস্মরণীয় সঙ্গীত এবং সমস্ত ছবিটির মধ্যে বিস্তৃত ছায়াচ্ছন্ন গথিক-বিষণ্নতা। এর কিছুদিন পরে সত্যজিতের হাতে আসে একটি অপ্রত্যাশিত হীরকখণ্ড : রেনে ক্লেয়ারের ছবি 'দ্য গোস্ট গোজ ওয়েস্ট'-এর চিত্রনাট্য। এই প্রথম চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এবং এই অপ্রত্যাশিত যোগাযোগের প্রেরণা থেকে সত্যজিৎ শুধুমাত্র সময় কাটানর জন্যে স্ক্রিপ্ট লিখতে শুরু করেন। সত্যজিৎ রায় যে গল্পটি নিয়ে রচনা করেন তাঁর প্রথম চিত্রনাট্য সেটি হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিলাস মন'। এছাড়া 'ঝিন্দের বন্দী' নিয়েও তিনি চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। যে কাহিনী নিয়ে তাঁর প্রথমেই ছবি করার ইচ্ছে ছিল সেটি হল 'ঘরে-বাইরে', 'পথের পাঁচালী' নয়। এবং বলাই বাহুল্য 'ঘরে-বাইরে'র চিত্রনাট্য তিনি লিখে ফেলেন চলচ্চিত্র পরিচালনায় আসার অনেক আগেই। একদিকে

চলছে এইসব চিত্রনাট্য লেখা। অন্যধারে তিনি পড়ছেন পল রোথা, ভ্লাদিমির নিরেলসেন, পুদভকিন এবং আইজেনস্টাইনের লেখা। আমরা দেখছি, এইসব লেখার পাশাপাশি সত্যজিতের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করছে যেসব চলচ্চিত্র তার মধ্যে অন্যতম ফ্রিৎজ্ ল্যাঙ-এর মেট্রোপলিস এবং ডক্টর ম্যাবিউজ। এছাড়াও তাঁকে মুগ্ধ করে ফোর্ড, ক্যাপরা, হুস্টন, লুবিচ এবং ওয়াইল্ডার-এর ছবি।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সত্যজিৎ। ইওরোপীয় ছবির সঙ্গে তাঁর পরিচিতির সূত্রপাত এই ফিল্ম সোসাইটির মাধ্যমেই। রেনোয়ার 'দ্য সাদার্নার' ছবিটি চলচ্চিত্রের বিষয় ও বিন্যাস নিয়ে তাঁকে নতুন ভাবে ভাবাতে শুরু করে। চলচ্চিত্রের সঙ্গে এই বিস্তৃত ও বিচিত্র পরিচয়পর্বকেই বলা যেতে পারে 'পথের পাঁচালী'র প্রস্তুতিপর্ব।

এই প্রস্তুতিপর্বেরই আর একটি অধ্যায় হল সত্যজিতের পাশ্চাত্য সংগীত চর্চা। বিশেষ করে বেঠোফেন এবং মোৎসার্ট-এর নেপথ্য প্রভাব তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে তৈরি করে সেই ছন্দবোধ যা তাঁর একের পর এক ছবির কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করেছে বহুদূর পর্যন্ত। নন্দলাল ও বিনোদবিহারীর মত শিল্পগুরুর সান্নিধ্যে তিনি যেমন এক ধারে ক্রমশই বুঝতে পেরেছিলেন, প্রতিটি দৃশ্য বা বস্তুর অন্তর্নিহিত ছন্দের উপলব্ধি শিল্পচেতনার অঙ্গ, তেমনি অন্যধারে ইওরোপীয়ান ধ্রুপদী সঙ্গীতের কাছে ঋণী তাঁর ছবির 'সাঙ্গীতিক' গঠন বা কাঠামো। আগেই বলেছি, সত্যজিতের ছবির অনস্বীকার্য অনন্যতা তার ছান্দিক বিন্যাসে। এই বিন্যাসের প্রেরণা-উৎস অবশ্যই মোৎসার্ট। শুধু যে চারুলতার বিন্যাস-ভঙ্গির মধ্যেই শুনতে পাই তা নয়, 'পথের পাঁচালী'র সামগ্রিক স্ট্রাকচারে, সারা ছবিতে আবেগ এবং সংযমের ওঠাপড়ায় মোৎসার্ট-সঙ্গীতের প্যাটার্ন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 'পথের পাঁচালী' এক অবিস্মরণীয় বিস্ময়—একথা স্বীকার করে নিয়েও আমরা বলতে বাধ্য, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে পথের পাঁচালী ঠিক ততটা ভূকম্পন ঘটায় নি, যতটা ঘটিয়েছিল গোদারের ব্রেথলেস কিংবা ওয়েলস-এর সিটিজেন কেন। এর কারণ হল, পথের পাঁচালী বিষয় ও বিন্যাসে অভিনব হয়েও সিনেমার পরিচিত কাঠামোকে একেবারে নস্যাৎ করে দিল না। বরং কাহিনী ও সুপরিকল্পিত কাঠামোর আনুগত্য মেনে নিয়েই সিনেমার ভাষা ও ব্যাকরণকে নতুন ভঙ্গিতে প্রয়োগ করতে চাইল। ব্রেথলেস এবং পথের পাঁচালীর তুলনা টানাটা হয়ত ঠিক হবে না। কিংবা বার্গমান-এর প্রসঙ্গ টানলেও হয়ত এক্ষেত্রে আপত্তি উঠতে পারে। কিন্তু, যেহেতু একমাত্র সত্যজিৎ রায়কেই এই দুই বিপুল প্রতিভার পাশাপাশি ভাবা যায়, তুলনা বা প্রতিতুলনার লোভও তাই খুব স্বাভাবিক। পথের পাঁচালীর বছর চারেক পরে তৈরি হয়েছিল গোদারের প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনী চিত্র 'ব্রেথলেস'। অর্থাৎ, ব্রেথলেস আর অপুর সংসার একেবারে সমবয়সী। কিন্তু একেবারে ভিন্ন 'প্রেমিস্' থেকে এদের জন্ম। অপুর সংসার নিও-রিয়েলিজম্-এর প্রেরণা নিয়েও যেন ধ্রুপদী সাহিত্যের সংজ্ঞার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঘটনার পারম্পর্য, প্লটের বন্ধন, চরিত্রায়ণের যুক্তিগ্রাহ্যতা—সব কিছুর মধ্যে রয়েছে সাহিত্যের বশ্যতাকে স্বীকার করে নেবার প্রবণতা। অন্য ধারে, গোদারের ব্রেথলেস কাহিনীটুকুর জন্যে ত্রুফোর কাছে ঋণী হয়েও সাহিত্যের শাসনকে মেনে নেয় নি। এই সাহসী বর্জন ও অহংকারী অমান্যের মধ্যেই কিন্তু আছে আধুনিক সিনেমার ভাষা, ব্যাকরণ ও রীতির সোচ্চার ঘোষণা।

সত্যজিৎ যেভাবে চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্যে নিজেকে তৈরি করেছিলেন, তার মধ্যে কিন্তু কোথাও তিনি যে রাতারাতি একটা প্রলয় ঘটাতে চাইছেন, তার কোনও ইশারা আমরা পাই না। তিনি বরং চলচ্চিত্রের পরিচিত চেহারাটাকেই যে মেনে নিচ্ছেন, একথাই মনে হতে পারে। আমরা দেখছি, তাঁর একই সঙ্গে ভাল লাগছে আইজেনস্টাইন ও ওয়াইলার, পুদভকিনের দ্বারা চমৎকৃত ও প্রাণিত হয়েও তিনি হলিউডের দ্বারা মোহিত হচ্ছেন। এতে অবশ্যই দোষের কিছু নেই। আমি অন্তত

মনে করি না এই সর্বগ্রাহিতা স্বভাব ও মননের লঘুতাকেই প্রকাশ করছে। বরং, বিশ্বাস ও সম্ভোগের এই অবাধ বিস্তৃতির মধ্যে খুঁজে পাই প্রাণশক্তি ও স্ফূর্তির সাবলীল প্রকাশ, যা বাঙালীদের মধ্যে খুব বেশি দেখতে পাই না।

তবু একথাও অনস্বীকার্য যে, বিশ্ব-চলচ্চিত্র থেকে সত্যজিতের গ্রহণ ও সম্ভোগের ক্ষেত্র ক্রমশ যেমন পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠছিল, তার বর্জন ও বিপ্লবের পথটি তেমন স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় নি, অন্তত যতদিন না তিনি ডে সিকার 'বাইসিকল্ থিভস' দেখেছেন এবং ইটালিয়ান চলচ্চিত্রের নিও-রিয়েলিজম-এর দ্বারা স্পৃষ্ট হয়েছেন। পথের পাঁচালীর আগে পর্যন্ত তাঁর গল্প বাছাইয়ের ধরণ থেকেই বোঝা যায়, হলিউডি কাহিনী বিন্যাসের প্রভাব তাঁর ওপর প্রবলভাবেই কাজ করছে। তিনি পথের পাঁচালীর আগে ঘরে-বাইরের চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। সেই চিত্রনাট্য সম্পর্কে আমাদের আদৌ কোনও ধারণা না থাকলেও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসে আর যাই থাকুক, ডে সিকার ধরনে নিও-রিয়েলিস্টিক চলচ্চিত্রের বিশেষ প্রশ্রয় নেই নিশ্চয়।

সিগনেট-প্রকাশিত 'পথের পাঁচালী'র অলংকরণের সময় সত্যজিৎ উপন্যাসটি নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরির কথা প্রথম ভাবতে শুরু করেন। এর কিছুদিন আগে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় পালুভ্রিনের বিজ্ঞাপনে তিনি শৈলী ও মেজাজের বিপ্লব ঘটিয়েছেন বলা যায়। এই বিজ্ঞাপন থেকেই বোঝা যায়, সিনেমার ছন্দ এবং দৃশ্যবোধ তাঁর মধ্যে ইতিমধ্যেই কত সাবলীল ও স্পষ্ট। প্রায় বোঝা যায় এই অভিনব বিজ্ঞাপনের ভঙ্গি থেকে তিনি একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চিত্রনাট্যে হাত দিলেন বলে যেখানে প্রতিটি ঘটনা বা সিচুয়েশনকে তিনি খন্ড খন্ড সীমিত ফ্রেমের অনুপুঙ্খের মধ্যে নির্ভুল-ভাবে ধরতে পারবেন। সেই সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর আঁকা প্রায় প্রতিটি বিজ্ঞাপন থেকেই যে, তাঁর চিত্রনাট্যের প্রাথমিক গুণ হবে অনুপুঙ্খের প্রতি অপূর্ব যত্ন, কাহিনী বা বিশেষ একটি সিচুয়েশনের বিস্তারে প্রথাগতভাবে সময়ের পারম্পর্যকে স্বীকার করে নিয়ে সাহিত্য বা শিল্পের ধ্রুপদী ছন্দকে চলচ্চিত্রের কাজে লাগানো। অর্থাৎ, সিনেমার পরিচিত প্রথাসিদ্ধ ফর্মকে তিনি যে ভাঙতে চাইবেন না, চাইবেন এই চলতি কাঠামোর মধ্যেই ব্যঞ্জনার দূরাভিসার, প্রায় এতটাই স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে 'পথের পাঁচালী'র আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর কাজ ও ভাবনা-চিন্তা নিয়ে আমরা যদি কিছুটা তলিয়ে দেখি।

'পথের পাঁচালী' নিয়ে ছবি করবেন, কিন্তু কি ভাবে, কোন ভঙ্গিতে করবেন, তা কিন্তু প্রথমেই সত্যজিতের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা দেয় নি। ডে সিকার ছবি 'দ্য বাইসিকল্ থিভস' দেখার পর তাঁর মনে হয়, নিও-রিয়েলিস্টিক ভঙ্গির মধ্যেই 'পথের পাঁচালী'র চিত্ররূপের বীজ নিহিত রয়েছে। পথের পাঁচালী উপন্যাস নিয়ে সত্যজিৎ যেসব কারণে ছবি করতে চাইলেন তার মধ্যে অন্যতম কাহিনীর মানবিকতা, গীতিধর্মিতা এবং কাহিনী বিন্যাসের সাবলীল, আলগা, ঘরোয়া ভঙ্গি যেখানে সাহিত্যের পোশাকি চেহারার কৃত্রিম জৌলুস নেই। এছাড়া এই উপন্যাসের বিশেষ কয়েকটি 'সিনেম্যাটিক' গুণ (যা সাহিত্যগুণ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আলাদা করে দেখা হচ্ছে) সত্যজিৎকে আকৃষ্ট করে। এই গুণগুলির মধ্যে অন্যতম হল বিভূতিভূষণের সংলাপ। বেশ কয়েক বছর আগে বোম্বাইয়ের 'ফিল্ম ওয়ার্ল্ড' কাগজের জন্যে আমি তাঁকে ইণ্টারভিউ করেছিলাম। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'মনে হয় বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসের সংলাপ প্রাত্যহিক জীবনের কথাবার্তা থেকে টেপ রেকর্ড করেছেন। আসলে, তিনি যা শুনতেন, তা ভুলতেন না। অত্যন্ত সজাগ স্মৃতিশক্তি ছাড়া এরকম সংলাপ লেখা সম্ভব নয়।' এছাড়া 'পথের পাঁচালী'র আর যে সিনেম্যাটিক গুণ সত্যজিৎকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করে তা হল বিভূতিভূষণের বর্ণনার ভিশুয়াল গুণ। আশ্চর্য অল্প কথায় তিনি গভীরভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারতেন।

সত্যজিৎ মূলত যে প্রেরণা থেকে 'পথের পাঁচালী' তৈরি করেন তা হল, এই গল্পের মধ্যে সিনেম্যাটিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা যত বিস্তৃত, ঝুঁকির পরিমাণ ততই সীমিত। কাহিনীর প্রয়োজনেই

স্টুডিওর চত্বর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার সুযোগ জুটে গেল। বিস্তৃত আউটডোর শুটিং এবং কাহিনীর ঘরোয়া, সাবলীল মেজাজের তাগিদে অভিনয়ে এল বাস্তবতার নতুন মাত্রা, যা ভারতীয় ছবিতে এর আগে আর কখনও দেখা যায়নি। 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রের অভিনবত্ব এবং মহত্ত্বের অন্তিম উৎস অবশ্যই সত্যজিতের চিত্রনাট্য। একসময়ে তিনি নিজেই বলেছেন, ডে সিকার 'বাইসিকল থিভস' দেখার পরেই তিনি ঠিক করে ফেলেন 'পথের পাঁচালী' তৈরি করবেন ডে সিকার ধরনেই। আবার, ১৯৫৭ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন, 'পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রের সঠিক ভিত্তি নিও-রিয়েলিস্টিক শৈলী নয়। সিনেমার কোনও বিশেষ ঘরানা কিংবা কোনও বিশেষ চলচ্চিত্রের কাছেও পথের পাঁচালী ছবির স্টাইলকে আমি ঋণী বলে মনে করি না। আমার চলচ্চিত্রের ভঙ্গি সরাসরি উঠে এসেছে বিভূতিভূষণের উপন্যাস থেকেই।' অর্থাৎ সত্যজিৎ রায় নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছেন 'পথের পাঁচালী' ছবিটির মৌলিকতার ঋণ সাহিত্যের কাছেই।

স্বয়ং আঁন্দ্রে বাজাঁ 'পথের পাঁচালী'র প্রশংসা করতে গিয়েও সাহিত্যের তুলনা টেনে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন রোমাঁ রোলাঁর 'জঁ ক্রিস্টোফার'-এর কথা। ত্রুফো 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে বলতে গিয়ে ছবিটির কাব্যগুণের কথাই আলাদা করে বলেন যা মূল উপন্যাস থেকেই উৎসারিত বলতে দ্বিধার কোনও কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন, 'সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল, অথচ পুরাতন পরিচিতের মত সে সুস্পষ্ট।' 'পথের পাঁচালী' ছবিটি সম্পর্কে কি একই কথা বলা যায় না? আমরা অন্তত ভারতীয় সিনেমার একটা নতুন জিনিস পেয়েছিলাম অথচ সিনেমার পুরনো, পরিচিত চেহারার ভিত্তিমূলে তেমন কোনও ওলটপালট ছিল কি?

।। ৪ ।।

'পথের পাঁচালী'র অভিনবত্ব এবং অনন্যতার কথা বলতে গিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই গোদারের প্রথম ছবি 'ব্রেথলেস'-এর কথা উঠেছিল। 'পথের পাঁচালী' আর 'ব্রেথলেস'-এব প্রতিতুলনার সূত্র ধরে একটা খুব জরুরী কথা মনে এল। কথাটা হল সত্যজিৎ রায় এবং জঁ লুক গোদার—এ'রা দুজনেই চূড়ান্ত অর্থে শহুরে মানুষ। সত্যজিতের শিক্ষাদীক্ষা, বড় হয়ে ওঠা এবং প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে যেমন জড়িয়ে রয়েছে কলকাতা, তেমনি গোদারের অভিজ্ঞতা ও প্রেরণার মূল উৎস প্যারিস। কিন্তু গোদার যে অর্থে প্যারিসের, সত্যজিৎ সেই অর্থে কলকাতার নন। অন্তত, তাঁর ছবি দেখে তা মনে হয় না।

মনে রাখতে হবে, চলচ্চিত্রপরিচালক হিসেবে সাত বছরের অভিজ্ঞতা এবং পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি পেরিয়ে আসার পরই তিনি কলকাতাকে প্রথম 'বিষয়' হিসেবে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন 'মহানগর' ছবিতে। (আমি ইচ্ছে করেই অপুর সংসারের [১৯৫৯] কথা তুলছি না। এ ছবির পশ্চাৎপটে কলকাতার উপস্থিতি অবশ্যই অনস্বীকার্য। তবু শহর এখানে বিষয় হয়ে ওঠে না।) এরপর আবার তিনি কলকাতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন সাত বছরের জন্যে। সত্তরের দশকেই বলতে গেলে সাম্প্রতিক কলকাতা তাঁকে প্রথম প্রাণিত করল। ১৯৭০-এ 'সীমাবদ্ধ', পরের বছরেই 'প্রতিদ্বন্দ্বী' এবং ১৯৭৫-এ 'জন-অরণ্য'—এই তিনটি ছবিরই মানসপট এবং ঘটনাভূমি কলকাতা। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৪-র মধ্যে তিনি আর একবার মাত্র কলকাতাকে, বা বলতে পারি আধুনিক শহুরে জীবনকে ছুঁয়ে গেছেন ফরাসী টিভির জন্যে তৈরি একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিতে। নাম পিকু।

অথচ সত্যজিৎ রায় আদ্যোপান্ত শহুরে মানুষ। তিনি শহরে থাকেন, এই স্থূল ভৌগোলিক অর্থেই তিনি শুধু শহুরে নন। তাঁর আধুনিকতা, তাঁর মানস-ভঙ্গি, তাঁর সফিসটিকেশন, এমন কি তাঁর অভিজাত বাঙালীয়ানা, এসব কোন কিছুর মধ্যেই গ্রাম্যতার চিহ্নমাত্র নেই। তিনি যে ভাষায় কথা বলেন এবং যে ভাষা লেখেন, তাও একান্তভাবে এই শহরের চলতি বাংলা, যার মধ্যে গ্রামীণ বাংলা বা বাঙাল বাংলার প্রভাব একেবারেই পড়েনি। এক কথায়, সত্যজিৎ রায়ের বাংলা নির্ভেজাল 'ঘটি' বাংলা— একেবারে কলকাত্তাই। তাই কিঞ্চিৎ অবাক না হয়ে পারি না যখন দেখি কলকাতা তাঁকে তেমনভাবে নাড়া দেয়নি, সাম্প্রতিক শহুরে জীবন তেমন বিস্তৃতভাবে হতে পারেনি তাঁর প্রেরণার উৎস। কথাটা খুবই জরুরী। কেন না, এরই মধ্যে প্রোথিত রয়েছে তাঁর শিল্পসৃষ্টির চরিত্র, তাঁর পরিচালনার ভঙ্গি ও শৈলীর বীজ, তাঁর বিপুল প্রতিভার দিকনির্ণায়ক কম্পাস।

সত্যজিতের অধিকাংশ ছবিতেই শহুরে তাড়না বা অভিজ্ঞতার অনুপস্থিতিকে কেবলমাত্র রোম্যাণ্টিকতা বলে ব্যাখ্যা করলে ভুল হবে। শহরকে কিছুটা এড়িয়ে যাবার এই ভঙ্গির পিছনে মূলত তিনটি কারণ রয়েছে বলে আমার মনে হয়। এক, সত্যজিৎ এমন বিষয় বা অভিজ্ঞতা নিয়েই সচরাচর ছবি করতে চেয়েছেন যার সঙ্গে তিনি নিজে কোনওভাবেই জড়িয়ে নেই, যে-বিষয় বা অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর দূরত্ব ততটাই যতখানি প্রয়োজন বিষয় এবং প্রেক্ষিতের সার্বিক উপলব্ধির জন্যে। দুই, সত্যজিৎ তাঁর অধিকাংশ ছবিতে একটি কেন্দ্রীয় মুডকে খুব ধীরে সঙ্গীতের মত বিস্তার করেন।

মানুষের মঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিচিত্র ব্যঞ্জনাকে তিনি ফুটিয়ে তোলেন অতি যত্নে। এই উন্মোচনের গতি শ্লথ, ছন্দ বিলম্বিত। আধুনিক শহুরে জীবনের ঝোড়ো গতির মধ্যে সত্যজিৎ যেন তাঁর মেজাজের প্রশ্রয় পান না। আধুনিক শহরের রিদম্ বা ছন্দ তাঁর মনের স্বাভাবিক প্রবণতার যেন বিরোধিতাই করছে—এটা বললেও অত্যুক্তি হবে না। তিন, সবচেয়ে যে বিষয়টি সত্যজিৎ রায়কে টানে তা হল মানুষের মন, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। এই কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে সত্যজিৎ সম-সময়ের প্রেক্ষাপট থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চান একটাই কারণে—যাতে স্থান ও কালের সীমা পেরিয়ে যেতে পারে।

১৯৫৫ থেকে ১৯৮৪, অর্থাৎ 'পথের পাঁচালী' থেকে 'ঘরে-বাইরে' পর্যন্ত সত্যজিৎ রায়কে যদি আমরা এক ঝলকে চিনতে চেষ্টা করি, তাহলে দেখব এই তিন প্রবণতা থেকেই তৈরি হয়েছে তাঁর পরিচালনার ভঙ্গি এবং ধারা, তাঁর চলচ্চিত্রের মেজাজ ও চরিত্র, এবং তাঁর প্রতিভার ক্রমবিকাশের পথ। তিনি যে নিউ-ওয়েভকে গ্রহণ করতে পারেননি, এমন কি চুম্বনের প্রসঙ্গ তুলে বিদ্রূপও করেছেন, তার পিছনেও কিন্তু কাজ করেছে সম-সময় এবং আধুনিক শহুরে জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার প্রবণতা। সত্যজিৎ ক্রমাগত যে সব বিষয় বা কাহিনী বেছে নিয়েছেন তাঁর ছবির জন্যে, তাদের মেজাজ এবং হৃদস্পন্দনের ছন্দ থেকেই উঠে এসেছে তাঁর ছবির স্টাইল। নিউ ওয়েভের স্টাইলও কিন্তু কাহিনী বা বিষয়ের হৃদস্পন্দনের ছন্দ থেকেই জন্ম নিয়েছিল। গোদার, ত্রুফো, শাব্রল, রোমার, রিভেত—প্রত্যেকেই বুঝতে চেয়েছিলেন কিভাকে চলচ্চিত্রের ভাষাকে আরও গভীর আর ব্যঞ্জনাময় করে তোলা যায় তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিতে। সত্যজিৎ বেছে নিলেন নব-তরঙ্গ শৈলীকে বর্জনের পথ—তাঁর মেজাজের সমর্থন ও প্রেরণা থেকেই। হলিউডের ছবিই ছিল মূলত তাঁর শিক্ষাভূমি। গল্প বলায় ওয়াইলার, ওয়াইল্ডার, ক্যাপরা, ফোর্ড—এঁরা প্রত্যেকেই অনন্য। এঁদের সহজ, সাবলীল রীতিকেই সত্যজিৎ প্রথম থেকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। রেনোয়ার এবং ডে-সিকার ছবির সঙ্গে পরিচয়ের পরেই মনে হয় সত্যজিতের চলচ্চিত্র ভাবনায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। গল্প বলব, অথচ হলিউডি সিনেমার ঢঙে বললে হবে না—এই গভীর উপলব্ধি থেকেই তৈরি হল 'পথের পাঁচালী'। পঞ্চাশের দশকের ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটে 'পথের পাঁচালী' নিয়ে যে কেউ ছবি করার কথা আদৌ ভাবতে পেরেছিলেন, এর চেয়ে

বিস্ময়কর আর কি হতে পারে? রেনোয়া এবং ডে-সিকার প্রভাব আর প্রণোদনা ছাড়া হয়ত বিভূতিভূষণের উপন্যাসের মধ্যে সম্ভাব্য সিনেমাকে চিহ্নিত করতে পারতেন না সত্যজিৎ।

।। ৫ ।।

'পথের পাঁচালী' যে-পরিচালকের প্রথম ছবি, তিনি যে নিজেই হয়ে পড়বেন নিজের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী, সেটাই তো স্বাভাবিক। 'পথের পাঁচালী' যখন করেন তখন সত্যজিৎ রায়ের বয়েস একত্রিশ। তিরিশ বছর আগে এই প্রথম ছবিতেই তিনি নিজের জন্যে এমন একটি মান বা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করে ফেললেন, যে ১৯৫৫ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত তাঁর কাটল এই স্ব-প্রতিষ্ঠিত স্ট্যান্ডার্ড-এর সঙ্গে যুদ্ধ করে, প্রতিযোগিতা করে। এই প্রতিযোগিতায় তিনি শেষ পর্যন্ত কতটা জিতলেন, কতটা হারলেন, কোথায়-কোথায় 'পথের পাঁচালী'র বিপুল প্রতিভাবান চলচ্চিত্রকারের দায়িত্বভার বয়ে বেড়াতে তিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন, তার মূল্যায়নের সময় এখন অবশ্যই এসেছে। 'পথের পাঁচালী' ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি একেবারে অভাবনীয় ঘটনা। এ-দেশে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত বহমান চলচ্চিত্র-ধারার প্রেক্ষিতে 'পথের পাঁচালী' এতদূর অভিনব, এতখানি মৌলিক যে, কোনও উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য বা পরিচিত চরিত্রের সূত্র ধরে এ-ছবির মূল্যায়ন সম্ভব নয়। চল্লিশের দশকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে আমরা এমন কোনও প্রবণতা কিংবা সুপ্ত স্রোতের ইশারা পাই না যা থেকে গন্ধ পেতে পারি 'পথের পাঁচালী'র আগমন-বার্তার। চল্লিশ দশকের বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র যদি আমরা সরে আসি, তাহলে খুব বড় হয়ে দেখা দেন প্রমথেশ বড়ুয়া। পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে প্রমথেশ যে ধারণা, আদর্শ ও প্রেরণার দ্বারা চালিত হচ্ছিলেন, সেখানে হলিউডের পোশাকি অনুকরণটাই বড় হয়ে উঠেছিল, আধুনিক চলচ্চিত্র-চিন্তার কোনও আভাস ছিল না। 'পথের পাঁচালী' তৈরির আগে সত্যজিৎ রায় প্রমথেশ বড়ুয়ার কোনও ছবিই দেখেন নি—এ-কথা তাঁর নিজের। তিরিশ এবং চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি বাংলা ভাষায় যে-সব চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে, 'পথের পাঁচালী'র ওপর তার বিন্দুমাত্র প্রভাবও নেই। ফটোগ্রাফিতে হলিউডের মেকি অনুকরণ, অযাচিত নাটুকেপনায় সস্তা পশ্চিমী চলচ্চিত্রের নকল করার প্রবণতা, এমনকি শিল্প-নির্দেশনায় বাস্তববোধের আমূল বর্জন—এই তো হল ১৯৪৫ পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্রের মূল চেহারা। এখানে 'পথের পাঁচালী'র শিকড় কোনও ভাবেই পাওয়া যাবে কি? প্রমথেশ সম্পর্কে সত্যজিতের বক্তব্যে একদা ঝড় উঠেছিল। সত্যজিৎ বলেছিলেন, 'এই মহারাজার পুত্র যে বার্লিনে সিনেমা নিয়ে লেখাপড়া করেছিলেন, তা আশ্চর্যের কিছু নয়। বড়ুয়ার অভিনয় আমার খুবই খারাপ লাগে। বড় বেশি দেখানোপনা, আত্মপ্রেম, মেকআপের বাড়াবাড়ি, তার ওপর আবার অক্সফোর্ড-এর কায়দায় বাংলা বলার ঝোঁক। বড়ুয়ার শ্রেষ্ঠ ছবি 'দেবদাস'। এ-ছবিটাকেও নষ্ট করেছে তাঁর উপস্থিতি এবং অসংযত ভাবাবেগ।' নিষ্ঠুর শোনালেও কথাগুলো সত্যি। এবং প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ও মানের সম্পূর্ণ বর্জন ছাড়া 'পথের পাঁচালী' কি সম্ভব হত? দেবকী বসু ও নীতিন বসুকে বরং সত্যজিৎ প্রমথেশ বড়ুয়ার তুলনায় অনেক বেশি বাস্তবানুগ ও গ্রহণীয় বলে মনে করলেন। যে-কারণে দেবকী বসুর 'কবি' বা অন্যান্য ছবিতে তাঁর মন সহজে সাড়া দিতে পারল তা হল এই পরিচালকের বাঙালীত্ব। দেবকী বসুকে প্রমথেশ বড়ুয়ার মত দেশের মাটি, সংস্কৃতি ও পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হল না। দেবকী বসুর চলচ্চিত্র-ভাবনার সঙ্গে সত্যজিতের চলচ্চিত্রবোধের আত্মীয়তা নেই বললেই চলে। কিন্তু সত্যজিৎ নিজেই স্বীকার করেছেন 'কবি'র পরিচালকের সঙ্গে তাঁর মানসিক সাযুজ্যের কথা। তাঁদের চলচ্চিত্র ভাবনার দূরত্ব সত্ত্বেও এই মানস-নৈকট্য অনস্বীকার্য। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে সত্যজিৎ রায় ও দেবকী বসু উভয় পরিচালকেরই রুচি, মূল্যবোধ, ও

জীবনচেতনার শিকড় নিহিত রয়েছে। এইখানেই এঁদের আত্মীয়তা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে দেবকী বসুও 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস থেকে ছবি করবার কথা ভেবেছিলেন। মূলত যে কারণে নীতিন বসুকেও পরিচালক হিসেবে সত্যজিতের প্রমথেশের তুলনায় অনেক বেশি বিশ্বাস্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ মনে হল, তা হল বাঙালী জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে নীতিন বসুর গভীর পরিচয়। কিন্তু সত্যজিৎ যখন ছবি করতে এলেন, তখন দেবকী কিংবা নীতিন বসু, কিংবা অন্য কোনও ভারতীয় চলচ্চিত্রকারের বিন্দুমাত্র প্রভাব তাঁর ওপর কাজ করল না। এই বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যেই পাওয়া যায় তাঁর প্রতিভা ও মৌলিকতার মাপ। কিন্তু এর চেয়েও বেশি আশ্চর্যের হল, হলিউডের প্রভাবকেও সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করে যাওয়ার ক্ষমতা। তিনি ক্রমেই বুঝতে পারছিলেন, গভীরভাবে বাঙালী কিংবা ভারতীয় বিষয়ের সঙ্গে হলিউডি শৈলীর বিরোধ কত ব্যাপ্ত। বুঝতে পারছিলেন, ভারতীয় জীবনের, বিশেষ করে গ্রামীণ জীবনের মন্থর ছন্দের সঙ্গে কখনই আত্মীয়তা হতে পারে না মার্কিন ছবির দ্রুত মন্তাজ-পদ্ধতির। বুঝতে পারছিলেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রকে যদি ভারতীয় জীবনের হৃদ্‌স্পন্দনকে ধরতেই হয়, তাহলে সেই চলচ্চিত্রের প্রকৃতি, চরিত্র ও ছন্দকে উঠে আসতে হবে আমাদের জীবনের মূল ভঙ্গি, আমাদের রুচি ও সংস্কৃতির মূলধারা থেকেই। বুঝতে পারছিলেন, জীবনের সঙ্গে আমাদের চলচ্চিত্রের সংযোগ আরও ব্যাপ্ত, তীব্র ও গভীর হওয়া প্রয়োজন। বুঝতে পারছিলেন, মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য আমাদের চলচ্চিত্রকে বর্জন করতে হবে হলিউডি কৃত্রিমতা, স্টুডিও-সর্বস্বতা। বুঝতে পারছিলেন, যে-মুহূর্তে ভারতীয় চলচ্চিত্র লেডি অফ শ্যালটের মত বেরিয়ে আসবে মেকি পরিবেশ থেকে, বর্জন করবে স্টুডিওর তৈরি সেট আর সাজানো আলোর ঝুটা রোম্যাণ্টিকতা, সেই মুহূর্তে শ্যালটের বন্দিনী নারীর আয়নার মতই চুরমার হয়ে যাবে ভারতীয় চলচ্চিত্রের পরিচিত কাঠামো, খুলে পড়বে নাটুকেপনা আর ভাবাবেগের সব জনপ্রিয় বুনন। বুঝতে পারছিলেন, স্টুডিওর কৃত্রিমতা বর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আবশ্যিক হয়ে উঠবে বিষয়ের অকৃত্রিম প্রাসঙ্গিকতা, সংলাপের সাবলীল স্বাভাবিকতা, কাহিনী বিন্যাসের স্বতন্ত্র শৈলী, যার মধ্যে হলিউডি কৃত্রিমতার কোনও প্রভাব থাকবে না। শুধু বুঝে উঠতে পারছিলেন না, কোন পথে, কি ভাবে ঘটানো যায় এই বৈপ্লবিক বিবর্তন।

সত্যজিৎ রায়ের জীবনে হঠাৎ ঘটে যায় দুটি বিদ্যুৎবাহী যোগাযোগ। 'হঠাৎ' শব্দটি একটু নাটুকেপনার ঝুঁকি নিয়েও খুব ভেবেচিন্তে ব্যবহার করছি। সত্যজিৎ রায়ের ওপর ভার পড়ল বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র অলংকরণ বা ইলাসট্রেশনের। অর্থাৎ, তিনি আবার উপন্যাসটি খুব মন দিয়ে পড়লেনই না, বিভিন্ন ঘটনা, সিচুয়েশন, চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্ক—এইসব কিছুকে ছবির মাধ্যমে কিভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় তারই বিস্তৃত ভাবনার প্রেক্ষিতে উপন্যাসটিকে নতুন ভাবে চেনবার চেষ্টা করলেন। অর্থাৎ, 'পথের পাঁচালী'র বিষয়টি তাঁর ভাবনায় সরে এল, এই প্রথম, সাহিত্য থেকে ছবিতে। তবু চিত্রনাট্য রূপ নিল না 'পথের পাঁচালী' অলংকরণের সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন 'পথের পাঁচালী'কে যদি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করতেই হয় তাহলে সেই রূপান্তরের শৈলী, ব্যাকরণ এবং পদ্ধতিকে হলিউডি চলচ্চিত্রধারার কাছে সম্পূর্ণভাবে অঋণী থাকতেই হবে। এ-কথাও তিনি বুঝতে পারেন নি এমন নয় যে, 'পথের পাঁচালী'র চলচ্চিত্র-ভাষা উঠে আসবে উপন্যাসের চরিত্র, শৈলী এবং প্রাণরস থেকে। তবু ভারতীয় চলচ্চিত্রে সাহিত্যের 'ট্রিটমেণ্ট' থেকে তিনি এমন কোনও সূত্র আবিষ্কার করতে পারলেন না যেখান থেকে পাওয়া যেতে পারে 'পথের পাঁচালী'র চলচ্চিত্র রূপায়ণের ভঙ্গি ও ভাষার ইঙ্গিত।

১৯৫০ সালে সত্যজিৎ রায়কে মাস পাঁচেকের জন্যে বিলেত যেতে হল বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজে। তাঁর প্রথম লণ্ডন-সন্ধ্যাটি তিনি খরচ করলেন 'কার্জন' প্রেক্ষাগৃহে। পর পর দেখলেন দুটি ছবি : 'মার্ক্স ব্রদার্স'-দের 'এ নাইট অ্যাট দ্য অপেরা' এবং ডে সিকার 'বাইসিক্‌ল থিভস'। বাইসিক্‌ল

থিভস্‌-ই তাঁর সামনে খুলে দিল অপ্রত্যাশিত উপত্যকা। তিনি প্রথম স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারলেন হলিউডি ছবিকে সুচারু ভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি হল স্টুডিওর বাইরে অপেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়ে শ্যুটিং করা। এই প্রাথমিক বোধের সঙ্গে সঙ্গে এক জায়গায় একটা খটকাও লাগল : স্টুডিওর বাইরে কাজ করলে সাউন্ড রেকর্ডিং-এর অসুবিধে অতিক্রম করা যাবে তো? কিন্তু, তাঁকে ভরসা দিল একটাই প্রশ্ন—ইতালিতে যা সম্ভব, ভারতবর্ষেই বা তা সম্ভব না কেন? লন্ডনে থাকতে ডে সিকার 'মিরাকল ইন মিলান'ও তিনি দেখেন। ছবিটির প্রথম অংশ তাঁর বিশেষ ভাল লাগে, তোতোর চরিত্রায়ণের মধ্যে তিনি খুঁজে পান চলচ্চিত্রের এক নতুন মাত্রা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পথের পাঁচালীর অনেক পরে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ভিসকন্তি এবং রোসেলিনির মত পরিচালককে। লন্ডনে আর যে-সব ছবি তাঁকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে তাদের মধ্যে রয়েছে রেনোয়ার 'দ্য রুলস অফ দ্য গেম', ফ্ল্যাহার্টির 'নানুক অফ দ্য নর্থ' ও 'লুইসিয়ানা স্টোরি' এবং ডনস্কয়ের 'চাইল্ডহুড অফ ম্যাক্সিম গোর্কি'। এই সবকটি ছবির প্রভাবের বিস্তৃত বুননের মধ্যেই নিদ্রিত রয়েছে পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রের ভ্রূণ। সত্যজিৎ রায়ের আত্মপ্রকাশের মৌলিকতাকে অস্বীকার না করেও একথা বলা যায়।

নিও-রিয়েলিস্টিক চলচ্চিত্রের দ্বারা প্রাণিত হয়ে সত্যজিৎ পথের পাঁচালীর চলচ্চিত্রায়ণের যে-পথটি খুঁজে পেলেন, তা তাঁকে মুহূর্তে নিয়ে গেল একেবারে এক অভিনব পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে চলতি ভারতীয় ছবির কোনও 'রেফারেন্স' আর পাওয়া যায় না। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে নাটকের সম্পর্কের কথা কেউ কোনও দিন ছিন্ন করার কথা ভাবতে পারেন নি। 'পথের পাঁচালী' প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র যেখানে মঞ্চের কোনও প্রভাব পড়ল না। চলচ্চিত্র স্টুডিওর বেড়া ডিঙিয়ে সরে এল জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কের ভূমিতে।

পথের পাঁচালীর অভিনবত্ব ও অনন্যতা একদিকে নিটোল কাহিনী-ধর্মী মার্কিন সিনেমা, অন্যধারে বিশুদ্ধ মনন-নির্ভর ইউরোপিয়ান আর্ট-সিনেমার মাঝামাঝি একটা জায়গা করে নেবার মধ্যেই। ঠিক এই কারণেই একদিকে যেমন শুধু কাহিনীর বিশ্লেষণে সত্যজিতের পথের পাঁচালীকে সম্পূর্ণভাবে ধরা যায় না, তেমনি আর্ট-সিনেমার বিচারেও পূর্ণ উন্মোচন সম্ভব নয়। পথের পাঁচালীর বিশিষ্টতা একটি সম্যক এবং ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যে। এই বিস্তৃত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে চরিত্রগুলি যে-ভাবে 'হয়ে' উঠেছে, সেই মন্থর বিস্তারিত পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের একাত্মতাই পথের পাঁচালী দাবি করে এবং জোরের সঙ্গে উপার্জনও করে। অর্থাৎ বিশ্লেষণ ও ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে পথের পাঁচালীর বিস্তার ব্রাম কিংবা স্ট্রাভেনস্কির মন্থরগতি সঙ্গীতের মত। পথের পাঁচালী প্রসঙ্গে, ইওরোপিয়ান ধ্রুপদী সঙ্গীতের রেফারেন্স আবশ্যিক ভাবেই আসে। সত্যজিৎই প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্রকার যিনি পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারেন চলচ্চিত্রের সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত আত্মীয়তার কথা। সঙ্গীতের মত সময়কে মাধ্যম করেই সিনেমার বিস্তার। সিনেমার প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি শট, প্রতিটি ফ্রেম নির্দিষ্ট সময়সীমার দ্বারা নির্ধারিত। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের আলাপী বিস্তারে তাৎক্ষণিক আবিষ্কার, উন্মোচন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সুযোগ ও প্রবণতা এত বেশি যে সময়ের সীমিত নির্দেশিকা সেখানে বিকল। ইওরোপীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত কিন্তু সময়ের অঙ্কের কাছে এতদূর বশ্যতা মেনে নিয়েছে যে সেখানে খেয়াল-খুশি মত আলাপী সঞ্চারের কোনও অবকাশ নেই। অথচ, এই বশ্যতার মধ্যেই রয়েছে ইওরোপিয়ান মার্গ সঙ্গীতের স্বাধীনতা, মহত্ব এবং মৌলিকতা। আধুনিক চলচ্চিত্রের চরিত্রও যে গড়ে উঠেছে এই আপাত স্ব-বিরোধী উপাদান থেকেই, এটাই সত্যজিৎ রায় বুঝতে পেরেছিলেন।

পথের পাঁচালীর সত্যজিৎ রায়ের বিরুদ্ধে সত্যজিৎকে যুদ্ধ করতে হয়েছে আজীবন। কখনও তিনি এই লড়াইয়ে হেরেছেন, কখনও জিতেছেন। 'পথের পাঁচালী' থেকে

'ঘরে বাইরে' (কাঞ্চনজঙ্ঘা একমাত্র ব্যতিক্রম) পর্যন্ত চলে এলে আমরা দেখতে পাই সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রের মেরুদন্ড হিসেবে বেছে নিচ্ছেন কাহিনীবিন্যাসের ঠাসবুনন কাঠামোকেই। কিন্তু পথের পাঁচালীর স্টাইল এবং প্রাণরস মূল কাহিনীর ভূমি থেকে যেভাবে উঠে এসেছিল, তা আর অনেক সময়েই সত্যজিতের অন্যান্য ছবিতে আমরা পাচ্ছি না। পথের পাঁচালীর বৈপ্লবিক অভিনবত্ব একাধিক কারণে যেন আর তাঁর আয়ত্তের মধ্যে নেই। ভারতীয় সিনেমায় মিউজিকাল স্ট্রাকচারের সূচনা পথের পাঁচালীতে। সত্যজিৎ এই সাঙ্গীতিক কাঠামোর সূত্র ধরেই পেঁৗছেছিলেন 'চারুলতা'র তুঙ্গতম সাফল্যে। আবার পথের পাঁচালীর পরিচালকের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছিলাম 'চিড়িয়াখানা'র অবিশ্বাস্য মাঝারিয়ানা। এই ওঠা-পড়া, সাফল্য-অসাফল্য, এই প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতা এবং স্বপ্রতিষ্ঠিত মান বা স্ট্যাণ্ডার্ডের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই—এইসব কিছু মিলিয়েই সত্যজিৎ রায়। তাঁর প্রথম ছবি যদি এক অনন্য 'মাস্টারপিস' না হত, তাহলে হয়তো এমনটা ঘটত না।

।। ৬ ।।

জীবনকে দেখার, চেনার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, যাকে বলা যেতে পারে জীবনদর্শন, তা চিহ্নিত করে প্রত্যেক মহৎ শিল্পী বা শিল্পকে। সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই বিষয়ের এমন বৈচিত্র্য, বিচরণের এমন বিস্তৃত ক্ষেত্র, যে সেখান থেকে সত্যজিতের জীবনদর্শনের একটি নির্দিষ্ট, স্পষ্ট রূপরেখা প্রতীয়মান হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শনের কতটুকু পরিচয় আমরা পাই তাঁর ছবিতে—এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি খুব বেশি ঘাঁটাঘাঁটিও হয়নি এ পর্যন্ত। একটা কথা খুব পরিষ্কারভাবে প্রথমেই বলে রাখা ভাল। কথাটা হল, বার্গমান বা গোদারের জীবনদর্শন নিয়ে যেভাবে গবেষণা হতে পারে, সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা। তার কারণ, সত্যজিৎ রায় মূলত ছবি করেন 'গল্প' বলার জন্যে, এমন কোনও কেন্দ্রীয় জীবনদর্শনকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্যে নয় যার সূত্র টানা যায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত বিবর্তনের মধ্যে দিয়েও। অবশ্যই তাঁর প্রতিটি চলচ্চিত্রে কাহিনীবিন্যাসের, চরিত্রায়ণের, এবং ঘটনার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, আলাদা করে চিনতে পারার মত জীবনবোধ, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা। কিন্তু চলচ্চিত্রকে তিনি তাঁর নিজস্ব জীবনবোধের, তাঁর গভীর উপলব্ধির এষণাকে প্রকাশিত করার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন বলে মনে হয় না। সত্যজিৎ রায় যখন একটি বিশেষ 'গল্প'কে ভেবে দেখেন ছবি করার জন্যে, তখন তাঁর প্রাথমিক প্রশ্ন হল, গল্পটা কতদূর সিনেম্যাটিক। অর্থাৎ গল্পটার মধ্যে সিনেমাগুণ কতদূর বর্তমান, সেইটে তিনি প্রথমে খুঁটিয়ে দেখে নেন। এক কথায় বলতে গেলে, তিনি সিনেমার জন্যে সাহিত্যের দ্বারস্থ হচ্ছেন একথাও যেমন সত্যি, তেমনি, সাহিত্যের মধ্যে সিনেমাকে আবিষ্কারের অ্যাডভেঞ্চারও যে তাঁর প্রাথমিক প্রেরণা হিসেবে কাজ করছে, তাও সত্যি। ছোট্ট একটা কথা এখানে পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল। যে মুহূর্তে সত্যজিৎ রায় বলছেন, তিনি একটি 'গল্প'কে প্রাথমিকভাবে বাছেন 'সিনেম্যাটিক কোয়ালিটি'র জোরে, সেই মুহূর্তে প্রশ্ন উঠবে, সিনেম্যাটিক গুণাবলী বলতে কি তিনি নিজের ধরনের সিনেমার কথাই বলছেন না? অবশ্যই তাই। তিনি যে কাহিনীকে প্রগাঢ়ভাবে সিনেম্যাটিক বলে চিহ্নিত করবেন, গোদার বা বার্গমান হয়ত তাকেই একান্ত সিনেমা-বিরোধী বলে বাতিল করে দেবেন। আবার সত্যজিৎ রায়ও গোদারের মত পাতা তিনেকের একটা খসড়া থেকে ছবি করার কথা ভাবতেই পারবেন না।

সিনেম্যাটিক গুণাবলী বলতে সত্যজিৎ রায় ঠিক কি বোঝেন—এই আপাত মামুলী প্রশ্নটিকে

এখানে না তুলে উপায় নেই। সাহিত্যের সিনেম্যাটিক গুণ বলতে সত্যজিৎ রায় বোঝেন, এক : লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, বর্ণনার ডিটেল। যেমন পাওয়া যায় বালজাক-এর উপন্যাসে, কিংবা দেবী চৌধুরানীর বজরার বা নগেন্দ্রনাথের (বিষবৃক্ষ) বাড়ির বর্ণনায়। অর্থাৎ লেখককে সত্যজিৎ দেখতে চান প্রায় শিল্প নির্দেশকের ভূমিকায়। দুই : কাহিনীর চরিত্র, ঘটনা ও স্থান যেন লেখার জোরে চাক্ষুষ হয়ে ওঠে, যেভাবে চরিত্র ও পরিবেশকে চলচ্চিত্র চাক্ষুষ করে তোলে। তিন : গল্প বা উপন্যাসের সংলাপ যেন হয় স্বাভাবিক, সাবলীল। পথের পাঁচালীর যেসব সিনেম্যাটিক গুণ সত্যজিৎকে মুগ্ধ করে তার মধ্যে বিভূতিভূষণের সংলাপ অন্যতম। এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের বাংলা সিনেমায় চটকদারি সংলাপের চলতি ধারার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ সত্যজিতের পথের পাঁচালীর জীবন্ত ভাষা। অবশ্য সত্যজিৎ তাঁর ছবির জন্যে যেসব কাহিনী বেছেছেন, সেগুলি যে তাঁর মতে সব দিক থেকে সিনেম্যাটিক, এমনও নয়। ঘরে-বাইরে উপন্যাসে ডিটেলের অভাব নিয়ে তিনি অভিযোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সংলাপও সিনেমায় অচল। তা সত্ত্বেও তিনি ঘরে-বাইরে নিয়ে ছবি করেছেন, কেন না এ গল্পে রয়েছে এমন একটি উপাদান যার আকর্ষণ তাঁর কাছে দুর্বার। অবশ্যই আমি বলছি, নারী-পুরুষের গহন সম্পর্কের কথা।

* * *

যে কথা পাড়তে এত কথা বলা প্রয়োজন হল, তা হচ্ছে 'পথের পাঁচালী' থেকে 'ঘরে-বাইরে' পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমির দিকে বিহঙ্গদৃষ্টিতে তাকালে মনে হয়, এই যে তিনি একের পর এক কাহিনী বেছে নিচ্ছেন মূলত বিভিন্ন ধরনের গল্পের চলচ্চিত্রায়ণের তাগিদ থেকে, তার পিছনে কোনও গভীর জীবনবেদ, সমাজচেতনা কাজ করছে না। এবং অনেক ক্ষেত্রেই তিনি যেন সমসময় থেকে ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। তিনি অন্যের কাহিনী অবলম্বনে চলচ্চিত্র করছেন মূলত কিসের তাগিদে? অবশ্যই গল্প বলার তাগিদে—যেখানে মুনশিয়ানার প্রধান আধার হবে শৈলী। তবে, কাহিনী বিন্যাসের পরিচিত কাঠামোতে যেন বৈপ্লবিক ওলটপালট না ঘটে যায় সেদিকেও নজর রাখেন তিনি। গল্পের বিষয়ের একটা পোশাকী প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু 'পথের পাঁচালী' থেকে 'ঘরে-বাইরে' পর্যন্ত চলে এলে আমরা কোনও জীবনদর্শনের ক্রমবিবর্তন লক্ষ করি কি? না করাটাই স্বাভাবিক, কারণ সত্যজিৎ নিজেই বলেছেন, কোনও পরিচালক তাঁর ছবিতে নিজস্ব দৃষ্টি-ভঙ্গি তুলে ধরলেই তাঁর শিল্পী-পরিচয়ের প্রমাণ দেবেন না।

মহৎ সাহিত্য-নির্ভর কদর্য চলচ্চিত্রের অভাব নেই জগতে। এবং এমন চলচ্চিত্রেরও বাণিজ্যিক রমরমা দেখতে অভ্যস্ত আমরা যা শুধু গল্পের জোরে করে খাচ্ছে। এই সব দেখে শুনে মনে হতেই পারে, চলচ্চিত্রের মননধর্মিতার ওপর অযথা গুরুত্ব দেওয়াটা ঠিক হবে না। চলচ্চিত্রের বক্তব্যে পরিচালকের মতাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র, কিন্তু সেটা তাঁর যথার্থ পরিচয় নয়। আর যদি সেইটাই তাঁর যথার্থ পরিচয় হয়, তবে এইটুকুই শুধু প্রমাণিত হবে যে তিনি একজন সৎ মানুষ। এ-কথা সত্যজিৎ রায়ের নিজের। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের শৈল্পিক গুণকে সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের বিষয় থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছেন। সত্যজিৎ একেবারে স্পষ্ট উচ্চারণে বলেছেন যে, চলচ্চিত্রকারের শিল্পসত্তা ধরা পড়ে চলচ্চিত্রের স্টাইলে, অর্থাৎ কিভাবে গল্পটা বলা হল তার মধ্যে। আবার একই সঙ্গে সত্যজিৎ বলেছেন, যাঁরা শুধু স্টাইল-ভিত্তিক ছবি করেন, যেখানে বক্তব্যটা একেবারেই গৌণ, তাঁদের শিল্পী বলার চেয়ে ওস্তাদ কারিগর বলাই ভাল। এবং তিনি এ কথাও স্বীকার করেছেন যে নিজের সৃষ্টির মধ্যে জীবন ও সমাজ সম্পর্কে কোনও দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তুলবেন না এমন শিল্পীর কথা ভাবা শক্ত। তাহলে চূড়ান্ত প্রশ্নটি হল, সত্যজিতের মত চিত্রপরিচালকের জীবনদর্শন তাঁর সাহিত্য-ভিত্তিক চলচ্চিত্র থেকে কিভাবে আমরা বুঝে উঠতে পারি? সত্যজিৎ নিজেই এ প্রশ্নের একটা উত্তর খাড়া করেছেন—সাধারণত চলচ্চিত্রকারের দৃষ্টিভঙ্গি নিহিত থাকে তার উপাদান বাছাইয়ের মধ্যেই।

এবার তাহলে দেখা যাক সত্যজিৎ রায়ের উপাদান বাছাই থেকে তাঁর জীবনদর্শন কতটা ফুটে উঠছে এবং আদৌ এই জীবনদর্শনের বিবর্তনের কোনও সূত্র ধরে রাখা যায় কিনা গত তিরিশ বছর ধরে। ‘পথের পাঁচালী’ এবং ‘অপরাজিত’ এই দুটি ছবির মধ্যে আমরা মা ও ছেলের সম্পর্কের গভীর এবং স্পর্শকাতর ট্রিটমেন্ট দেখে মুগ্ধ হই। বিভূতিভূষণের মানসিকতার সঙ্গে সত্যজিতের মানসিকতার সান্নিধ্য ছাড়া এই দুটি ছবি মেজাজে ও বুননে এতটা ভরপুর ও জমাট হয়ে উঠত না। এই সঙ্গে ধরা পড়ে সত্যজিৎ রায়ের রোম্যান্টিকতা এবং মৃত্যুচিন্তায় তাঁর উপলব্ধির গাম্ভীর্য এবং সংযম। ‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’ এবং ‘অপুর সংসার’ এই তিনটি ছবিতে আমরা পরপর পাঁচটি মৃত্যুর ঘটনা পাচ্ছি। প্রথমে ইন্দিরা ঠাকরুণ তারপর দুর্গা এবং পরে হরিহর, সর্বজয়া এবং অপর্ণা (অপুর স্ত্রী) মারা যাচ্ছে। কোথাও যেমন মৃত্যু কুৎসিত হয়ে উঠে তার মহত্ত্ব হারাচ্ছে না, তেমনি আবার ভাবাবেগের বাড়াবাড়িতে মৃত্যুর মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না।

সত্যজিতের গল্প বাছাই থেকে আরও যে কয়েকটি বিশেষ গুণ আমাদের চোখে পড়ে তার অন্যতমটি হল নারী-পুরুষের মানস-আদান-প্রদানের সূক্ষ্ম রণনগুলি ধরবার দিকে তাঁর প্রবণতা। আমার মনে হয় ‘চারুলতা’ তাঁর প্রেমের ছবির তুঙ্গতম সাফল্যের নিদর্শন। কিন্তু, একই সঙ্গে তাঁর ছবিগুলির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিস্তৃত ব্যঞ্জনাকে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমসময়ের প্রেক্ষিত থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। ‘মহানগর’ ছবিতে তিনি অবশ্য লড়াই করেছেন রোম্যাণ্টিক প্রবণতার বিরুদ্ধে, সর্বকাল থেকে সরে এসেছেন সমকালের প্রেক্ষাপটে। কিন্তু ‘নায়ক’ এবং ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’তে তিনি আবার সরে গেছেন ‘অন্য এক সময়ে’র মধ্যে।

‘নায়ক’-এর প্রায় সমস্ত ঘটনাই ঘটছে একটি চলন্ত রেলগাড়ির মধ্যে এবং নায়ক নিজেই ক্রমশ ছিন্ন হয়ে পড়ে তার চারপাশের পৃথিবী থেকে। ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’, ‘সীমাবদ্ধ’ এবং ‘জনঅরণ্য’—এই তিনটি ছবি থেকে সত্যজিৎ রায়ের জীবনদর্শন যদি কিছু ফুটেও ওঠে তবে তা তাঁর শহর-মুখিতার নয়, শহর-বিমুখিতারই পরিচায়ক। ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ শেষ হয় এক প্রশান্ত অ্যামবিভ্যালেন্সের মধ্যে যেখানে গৃহীত হয় একই সঙ্গে মৃত্যু ও পাখির ডাক। আর ‘সীমাবদ্ধ’ শেষ হয় আর এক ধরনের স্বার্থবোধে যেখানে সাফল্যের তুঙ্গতম মুহূর্তে পরাজয়ের গ্লানি আরও নিশ্ছিদ্র হয়ে ওঠে।

তবু একথা ভাবতে একটু খটকা লাগতেই পারে যে সত্যজিৎ রায়ের মত শিল্পীর জীবন-দর্শন আমাদের খুঁজতে হবে রবীন্দ্রনাথ থেকে শংকর পর্যন্ত সাহিত্যিকের কাছে উপাদান-অর্জনের বিচিত্র ক্ষেত্রে। তিনি তাঁর নিজের ধরনের গল্প বলার ভঙ্গিকে সমর্থন জানাবার মত এমন একটি গল্পকে বাছছেন মাত্র যা তাঁর মানসিকতার সরাসরি বিরোধিতা করছে না—এই হল ‘পথের পাঁচালী’ থেকে ‘ঘরে-বাইরে’ পর্যন্ত তাঁর বিবর্তনের মূল চেহারা। একদিকে যেমন তাঁর ছবির স্টাইল অনেক দূর পর্যন্ত উৎসারিত হচ্ছে গল্পের চরিত্র এবং দাবি থেকে, অন্যধারে তেমনি তাঁর জীবনবোধের কিছু পরিচিতি আমরা খণ্ড-খণ্ডভাবে পাচ্ছি কাহিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ প্রবণতা থেকে। আমার অন্তত মনে হয়, তিনি একটা গল্প বাছার সময়ে সেই কাহিনীটিকে কতখানি নিজের স্টাইলের উপযোগী করে নিতে পারবেন তাই প্রথমে ভাবেন। ‘ঘরে-বাইরে’ কিংবা ‘শতরঞ্জ কি খিলাড়ি’র মত গল্প তিনি বাছেন চলচ্চিত্রের স্ট্রাকচারে হয়ত কিছু অভিনবত্ব আনার জন্যেই। এবং এই দুটি কাহিনীর এতটাই যে দাবি, তারও কোনও সন্দেহ নেই।

তবু একটি চূড়ান্ত প্রশ্ন আমাদের সামনে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে : সত্যজিৎ রায় বারবার অন্যের কাছে কাহিনী ধার না করে একটি ‘থিম’ বা ‘বিষয়’কে কেন্দ্র করে ছবি করলেন না কেন ? তাতে সাহিত্যের দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত বা সীমাবদ্ধ হতে হত না তাঁকে। অন্যের লেখা গল্পের দাবি মেটাবার কোনওরকম দায়িত্বও থাকত না তাঁর ঘাড়ে। এবং তাঁর জীবনদর্শনের পরিচিতি

আমাদের আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝে নিতে হত না ধার করা কাহিনী এবং বিষয়ের প্রেক্ষাপট থেকে। যেহেতু গল্পের দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে হত না সত্যজিৎকে, থিম-ভিত্তিক চলচ্চিত্রে তিনি শৈল্পীক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আরও বিস্তারিত হতে পারতেন নিঃসন্দেহে। অন্য কোনও লেখকের গল্প থেকে নয়, তাঁর নিজেরই অন্তরে লালিত কোনও বিষয় থেকে যদি জন্ম নিত তাঁর চিত্রনাট্যগুলি এবং তাদের পিছনে থাকত তাঁর ভুবনকাঁপানো প্রতিভার অবদান, তবে তিনি কিছুতেই এ-কথা বলতে পারতেন না যে, ছবির বিষয়ে ধরা পড়ে চিত্রনির্মাতার ব্যক্তিত্বের অংশমাত্র, এবং তাঁর শিল্পী সত্তার পরিচয় থাকে শুধুমাত্র ছবির স্টাইলে। বার্গমানের বা গোদারের ব্যক্তিত্ব এবং শিল্পীসত্তাকে কি তাঁদের ছবির মধ্যে ঐ-ভাবে আলাদা করে ছেঁকে নেওয়া যায়?

।।৭।।

'পথের পাঁচালী'তে আর একবার ফিরে আসা যাক। প্রথম ছবি হিসেবে 'পথের পাঁচালী'কে বেছে নেওয়ার পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। আগেই বলেছি, বিভূতিভূষণের এই উপন্যাসটির অলঙ্করণের ভার পড়ে সত্যজিতের ওপর। ইলাস্ট্রেশন করতে গিয়ে তিনি কাহিনীটির সিনেম্যাটিক সম্ভাবনা ক্রমশ আরও ব্যাপ্তভাবে আবিষ্কার করেন। বুঝতে পারেন, এই কাহিনীটিকে যদি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করা যায়, তাহলে কাহিনীর মেজাজ ও চরিত্র থেকেই উঠে আসবে এক অনন্য সিনেমা। ডে সিকার দ্য বাইসিকল্ থিভস দেখার পর তিনি স্পষ্টই অনুভব করেন যে, 'পথের পাঁচালী' থেকে চলচ্চিত্র বানাতে হলে নিও-রিয়েলিস্টিক ইতালিয়ান চলচ্চিত্রের কাছে ধারী হতেই হবে। 'পথের পাঁচালী' থেকে আর যে কারণে সত্যজিৎ ছবি করতে চাইলেন তা হল, বিভূতিভূষণের সংলাপ। তিনি নিজেই বলেছেন, 'পথের পাঁচালী'র অধিকাংশ সংলাপই বিভূতিভূষণের বই থেকে উঠে এসেছে। 'সেই সময়ে সংলাপ লেখার ব্যাপারে নিজের ক্ষমতায় আমার কোনও আস্থা ছিল না। সিনেমার সংলাপ কি করে লিখতে হয়, জানতামই না।'

এছাড়া, বিভূতিভূষণের বাস্তববোধ, মানুষ, প্রকৃতি, পরিবেশ, সব কিছুর সঙ্গে বিভূতিভূষণের নিবিড় পরিচয় এবং কাহিনী বিন্যাসের স্বাভাবিক ক্ষমতা—এই সব কিছু 'পথের পাঁচালী'কে প্রথম ছবির উপাদান হিসেবে কিছুটা সহজে গ্রহণীয় করেই তুলেছিল। 'পথের পাঁচালী' থেকে বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র করার কথা তখন কেউ ভাবতেই পারতেন না একটাই কারণে—বাণিজ্যিক ভারতীয় ছবির যে কাঠামোটি তখন চালু তাতে 'পথের পাঁচালী'র বিষয় ও মেজাজ ধরা দিত না। 'পথের পাঁচালী'র বিষয় থেকেই সিনেমার একটি নতুন ফর্ম বা স্ট্রাকচার যে উঠে আসতে পারে, সেটা সত্যজিৎ রায় বুঝতে পারেন হাতে-কলমে একটিও ছবি করার আগেই। কিন্তু একথাও একই সঙ্গে স্বীকার্য যে, বিভূতিভূষণের গল্প এবং তাঁর জীবনবোধকে কোনওভাবে অতিক্রম করে যাবার চেষ্টা সত্যজিতের ছবিতে আমরা দেখি না। এ-কথা 'পথের পাঁচালী,' 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার' —এই তিনটি ছবি সম্পর্কেই প্রযোজ্য। 'বিভূতিভূষণের জীবনদর্শন এবং তাঁর জীবনবোধ থেকে আমি আমার ছবিতে কোথাও সরে যাই নি', এই স্বীকারোক্তি বা ঘোষণা সত্যজিৎ রায়ের নিজের। সত্যজিৎকে শ্যাম বেনেগাল যখন প্রশ্ন করেন, কোনও ভাবেই কি তাঁর ট্রিলজির একটিও ছবিতে বিভূতিভূষণের জীবনদর্শন নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলেন নি, বা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার ওপর কিঞ্চিৎ 'টীকা' জুড়ে দেন নি, সত্যজিৎ পরিষ্কার বলেন, 'না না, একেবারেই না'। শ্যামের পরের প্রশ্ন, 'বাট ডু ইউ ফিল কমফার্টএবল উইথ দিস সেন্স অফ অর্ডার?' সত্যজিতের উত্তর : 'আই ডিড। আই ডিড অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট। টু মি ইট ফেল্ট রাইট'। শ্যামের 'ডু'-এর উত্তরে সত্যজিতের 'ডিড' আমাদের চমকে দেয়। তাহলে কি ১৯৮৪-তে সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' এবং

'অপুর সংসার'—এই তিনটি ছবির বিষয়-ভাবনা থেকে তাঁর ইনটেলেকচুয়াল দূরত্বকে মেনে নিচ্ছেন? তিনি কি তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির ভূমিতে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন বিভূতিভূষণের রোম্যাণ্টিকতা থেকে?

* * *

'অপরাজিত' তেমন চলে নি। সুতরাং পরশুরামের গল্প নিয়ে সত্যজিতের পরের ছবি 'পরশ-পাথর' তৈরি হল একেবারে ভিন্ন মেজাজে। সত্যজিৎ নিজেই বলছেন, 'পরশপাথর অপরাজিত'র চেয়ে ভাল চললেও, বাণিজ্যিক ভাবে এমন একটা কিছু সফল হওয়া গেল না। সুতরাং ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না, কি ধরনের ছবি করব। বাংলা সিনেমায় নাচগানের ফরমুলায় বাঙালী দর্শক অভ্যস্ত। আমিও নাচগান নিয়ে একটা ছবি করবার কথা ভেবেই তৈরি করলাম জলসাঘর।' খেয়াল রাখুন সত্যজিৎ বললেন না কিন্তু তিনি সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয় বা ফিউডাল ডেকাডেন্স নিয়ে ছবি করার কথা ভেবেই 'জলসাঘর' করলেন। বললেন না, তার কারণ সেইরকম কোন সামাজিক এবং রাজনৈতিক তাড়না থেকে তিনি ছবিটা করেন নি। তারাশঙ্করের মূল গল্পের মধ্যেও আমার মনে হয় না কোনও গভীর সামাজিক চৈতন্য কাজ করছে। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতেও আমরা সমাজ-দর্শন ও রাজনৈতিক-চেতনার কোনও উপরি পাওনা পেলাম না। সত্যজিৎ নিজেই বলছেন, তিনি কিঞ্চিৎ দিশেহারা অবস্থায় একটি নাচ-গানের ছবি করতে গিয়ে 'জলসাঘর' করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য, ছবির শৈল্পিক মান যেন বাণিজ্যিক দিকটাকে একেবারে নষ্ট না করে দেয়। অর্থাৎ তিনি শিল্প ও বাণিজ্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার একটা পথ খুঁজে পেয়েছিলেন 'জলসাঘর' গল্পে। জমিদারের চরিত্রটির মধ্যেও বাণিজ্যের উপাদান আছে। বুর্জোয়া অবক্ষয়ের রোম্যাণ্টিকতা সাধারণ মানুষকে টানে। একটা অতি মোটাদাগের উদাহরণ দিচ্ছি সাহিত্য থেকে—'সাহেব-বিবি-গোলাম'। সাহিত্য ও চলচ্চিত্র হিসেবে এই গল্পের বাণিজ্যিক সাফল্য অবক্ষয়ের বেদনাদীর্ণ সৌন্দর্যের মাধ্যমকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। এবার একটি অতি উঁচুমানের শিল্পের উদাহরণ দিই চলচ্চিত্র থেকে—অরসন ওয়েলসের 'দ্য সিটিজেন কেন'। এই উপন্যাস এবং এই চলচ্চিত্র—কোনওটির আবেদনই তৈরি হয়নি সামাজিক ও রাজনৈতিক কমিটমেন্ট থেকে, যদিও সিটিজেন কেন-এর আপাতবিষয় রাজনীতি। সত্যজিতের 'জলসাঘর' প্রসঙ্গেও ঐ একই কথা বলা যায়: তারাশঙ্করের গল্প ধার করেও, তিনি ছবিটিতে নিয়ে আসতে পারতেন সামন্ততন্ত্রের ওপর এমন এক বিশ্লেষণী আলোক-পাতের দায়িত্ব যা হতে পারত তাঁর সমসময়ের উপযোগী এবং তাঁর নিজস্ব সামাজিক চৈতন্যের দূরাভিসারী পরিচায়ক। এইখানে আরও একটা কথা স্পষ্টভাবে বলা উচিত: 'জলসাঘর'-এ সামন্ততন্ত্রের রোম্যাণ্টিক ট্রিটমেণ্ট সরাসরি বিরোধিতা করছে 'দেবী' ছবিতে ফুটে ওঠা সামন্ত-তন্ত্রের ভিন্ন মাত্রার সঙ্গে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় জমিদারের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস। এবং দুটি ছবি তিনি যখন তৈরি করেন তখন আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে একদিকে যেমন সামন্ততন্ত্রের ধস নামছে, উৎপাটিত হচ্ছে জমিদারি প্রথা, অন্যধারে তেমনি গজিয়ে উঠছে জোতদারি নয়া-ধনবাদ। এই ওলটপালটের সূত্র ধরে গড়ে উঠছে নতুন মূল্যবোধ, রাজনৈতিক মতবাদের ভিন্ন কোণ, ভিন্ন ভূমি। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে শুরু হচ্ছে মতামতের বহুমুখিতা। প্রেক্ষাপটে এই বিস্তৃত বিবর্তনের কিন্তু কোনও আভাস পাওয়া যায় না 'দেবী' কিংবা 'জলসাঘর'-এ, যদিও এই দুটি ছবির বিষয় থেকেই সামাজিক রেলিভ্যান্সের একটা তৃতীয় মাত্রা উঠে আসতে পারত। যেটা বরং আমাদের নজরে পড়ে, যে প্রসঙ্গ আমরা ইচ্ছে থাকলেও এড়িয়ে যেতে পারি না, তা হল 'দেবী'র আপাত-কঠোরতার তলায় সুপ্ত রোম্যাণ্টিকতা, যা ছবিটিকে সমস্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও কোথায় যেন 'জলসাঘর'-এর আত্মীয় করে তোলে। এবং এই আত্মীয়তার সূত্র ধরেই দুটি ছবিতেই উপস্থিত থাকেন ছবি বিশ্বাস।

।। ৮ ।।

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে গল্প বলা, এই হল সত্যজিৎ-পরিচালিত চলচ্চিত্রের মূল উদ্দেশ্য। এ-কথাটা অস্বীকার করবার বা এড়িয়ে যাবার তেমন কোনও উপায় দেখছি না। গল্প বলার মধ্যে আসতে পারে নানা ধরনের বৈচিত্র্য, আসতে পারে শৈলীর অভিনবত্ব, চরিত্রায়ণের নতুন মাত্রা, এমন কি অপরিচিত বিষয়ের উদ্ঘাটনও। কিন্তু একটি চলচ্চিত্রকে মূলত একটি গল্প বলতেই হবে—এই ভিত্তিভূমি থেকে অধিকাংশ চিত্রপরিচালকের মত সত্যজিৎ রায়ও সরে দাঁড়ান না।

এবং প্রতিটি চলচ্চিত্রের শুরুতে, স্ক্রিপ্ট লেখার অনেক আগে, সেই বিস্তৃত, পরিশ্রমী পর্বটিকে সত্যজিৎ-ও মেনে নেন, যার নাম গল্প-বাছাই পর্ব। এই প্লট-বাছাইয়ের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে সাহিত্যপাঠ। ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে হুজুগে বেস্টসেলার—এই বিস্তৃত ক্ষেত্রের যেখান থেকে খুশি চলচ্চিত্রকার তাঁর ছবির কাহিনী বা বিষয় আহরণ করতে পারেন। কপিরাইটের মেয়াদ চলতি থাকলে চলচ্চিত্রকার বা প্রডিউসার গল্প কিনে নেন নগদ মূল্যে। স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ও পরিচালক হিসেবে এই প্যাটার্নের মধ্যে পড়েন। যেখানে তিনি অন্যের গল্প নেন নি, সেখানে তিনি নিজেরই প্রকাশিত গল্পের কাছে নিজের ছবিকে ঋণী করিয়েছেন। উল্টোটা কখনই করেন নি। অর্থাৎ, তিনি এমন কোনও কাহিনী এখনও লেখেন নি যা তাঁর ছবির কাছে বিষয় ও বিন্যাসের জন্য ঋণী। বার্গম্যানের সেই বিপুল উক্তি, সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের কোনও সম্পর্কই নেই—এই নিরিখে সত্যজিৎ-পরিচালিত প্রায় কোনও চলচ্চিত্রেরই বিচার চলে না। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' আর 'নায়ক' এই দুটি চলচ্চিত্রের কথা মনে রেখেই 'প্রায়' শব্দটি ব্যবহার করলাম। মাত্র এই দুটি ছবিতেই সত্যজিৎ সনাতন কাহিনী-কাঠামো যতদূর সম্ভব বাতিল করে দিয়ে 'থিম্যাটিক ন্যারেটিভ' বা বিষয়ভিত্তিক (ঘটনাভিত্তিক নয়) বিন্যাসের দিকে ঝুঁকেছেন। আগেই বলেছি, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' আর 'নায়ক'-এর জন্ম সরাসরি চিত্রনাট্য হয়েই—অর্থাৎ, চলচ্চিত্রের বাইরে এই দুটি কাহিনীর আর কোনও অস্তিত্ব নেই, কোনও রকম সাহিত্যিক যাথার্থ্য এদের টিঁকিয়ে রাখে না। ন্যারেটিভ স্ট্রাকচার থেকে থিম্যাটিক স্ট্রাকচারে সরে আসার এই প্রচেষ্টা, বিশেষ করে 'নায়ক' ছবিতে, আমাদের বার্গমান এবং আন্তোনিওনির কথা মনে করিয়ে দেয়। 'নায়ক' ছবির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, বার্গমান এবং আন্তোনিওনির বেশ কিছু ছবির মত 'নায়ক'-এর অন্তর্নিহিত বিষয়ও হল যাত্রা। এই প্রতীকী বিষয়টির ট্রিটমেন্টে সত্যজিৎ, বার্গমান এবং আন্তোনিওনির ব্যবধান মেরুপ্রতিম। বার্গমান-এর 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি' এবং সত্যজিতের 'নায়ক'—এই দুটি ছবিকে প্রতিতুলনার দাবি মেটাতে পাশাপাশি রাখতেই হয়। 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি' তৈরি হয় ১৯৫৭ সালে। ঠিক এগার বছর পরে ১৯৬৬-তে 'নায়ক'। 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি'র কেন্দ্রীয় চরিত্র এক বৃদ্ধ বিজ্ঞানী, 'নায়ক'-এর নায়ক এক চিত্রতারকা। দু-জনেই যাচ্ছে এক শহর থেকে অন্য শহরে প্রতিভার স্বীকৃতি নিতে। এই আপাত সাদৃশ্য এমন অনস্বীকার্যভাবে স্পষ্ট যে বলতে লোভ হয়, সত্যজিৎ শুধু উত্তমকুমারকে মনে রেখেই 'নায়ক'-এর চিত্রনাট্য লেখেন নি, তিনি বার্গমান-এর ভূতকেও মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি। 'নায়ক'এর পিছনে 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি'র নেপথ্যচারিতা আক্ষরিক অর্থেই হতে পারে ভবিষ্যৎ গবেষণার মৃগয়াভূমি।

'নায়ক'এর অরিন্দম এবং 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি'র আইজ্যাক—দুজনেই যাত্রী। এই যাত্রার ট্রিটমেন্টেই ধরা পড়ে সত্যজিৎ এবং বার্গমান-এর মূল প্রভেদটা। এই পার্থক্য তাঁদের মেজাজের, মানসিকতার, মূল্যবোধের, বিশ্বাসের, এমন কি কমিটমেন্টের। এক কথায়, 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি'র যাত্রা যত দূরপ্রসারী অর্থে প্রতীকী, নায়কের দিল্লি যাত্রার প্রতীকী তাৎপর্য তত গভীর নয়। নয়, তার কারণ, নায়কের দিল্লি যাত্রার ঘটনাটাকেই যেন শরীরীভাবে উপস্থিত করা সত্যজিতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এখানেও তিনি মূলত একটা ঘটনাকেই যেন আঁকড়ে ধরছেন। ঘটনা থেকে মনন, বিশ্লেষণ, উন্মোচনের প্রচেষ্টায় সরে যেতে তেমন যেন উৎসাহবোধ করছেন না। এই

'অহেতুক' জটিলতায় ছবিটার বাণিজ্যিক সম্ভাবনার ক্ষতি হতে পারে, এমন একটা ভয়ও তাঁর মনের মধ্যে কাজ করছে বলে মনে হয়। ফ্ল্যাশব্যাক সিকোয়েন্সে যতটুকু জটিলতা এসেছে, কিংবা শ্লথ হয়ে পড়েছে ছবির গতি, তার ক্ষতিপূরণ হিসেবেই যেন সত্যজিৎ 'নায়ক'এ নিয়ে এসেছেন গ্ল্যামারবাহী উত্তম-উপস্থিতির নির্যাস। সামাজিক সাফল্য এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার পিছনেও কিভাবে লুকিয়ে থাকতে পারে হতাশা, ব্যর্থতা, গ্লানি, আত্মহত্যার প্রবণতা, এই বিষয়টিই যেন 'নায়ক' এবং 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি' ছবিতে ডালপালা ছড়িয়ে বিচিত্র স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। এবং এই ছড়িয়ে পড়ার, বিস্তৃতির অনেকটাই এসেছে ফ্ল্যাশব্যাক-এর মাধ্যমে। এই জটিল এবং গম্ভীর বিষয়ের চূড়ান্ত দাবি মেটাতে সত্যজিৎ রায় এবং বার্গমান, উভয়কেই একাধিকবার দাঁড়াতে হয় প্রবল কিছু প্রশ্নের সামনে। কিন্তু সত্যজিৎ যেন ইচ্ছে করেই বেছে নেন সহজীকরণের পথ, বিশেষভাবে যত্নবান হয়ে পড়েন 'নায়ক'-এর নির্ভার স্ট্রাকচার-এর মেদবিহীন চেহারাটি যতদূর সম্ভব বজায় রাখতে। হয়ত ভারতীয় দর্শকের কথা ভেবেই তিনি 'নায়ক'-এর নির্মেদ দ্যুতিকে কোনওভাবেই বিষয়-জটিলতায় ক্ষুণ্ণ হতে দিতে পারেন নি। তুলনায় বার্গমানকে আমার বেশি দূরাভিসারী ও সাহসী মনে হয়। 'হিউম্যান ফেলিওর' এবং 'পাবলিক সাকসেস'—এক কথায় 'নায়ক' এবং 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি' উভয় ছবিই দাঁড়িয়ে আছে এই কেন্দ্রীয় বিষয়ের ওপর। কিন্তু বার্গমান-এর ছবিতে আইজ্যাক-এর ব্যর্থতা, তার মানস-শূন্যতা, তার অন্তরের দেউলিয়া অবস্থাটা যেন এক অপ্রত্যাশিত পাতালের অন্ধকার থেকে উঠে আসে। অরিন্দমের মানস-উদ্ঘাটনে সত্যজিৎ কিন্তু ঐভাবে পাতালস্পর্শী হতে চান না। বরং তিনি এক নরম, রোম্যাণ্টিক অ্যাম্বিভ্যালেন্সের দিকেই যেন ক্রমশ ঝুঁকে পড়েন। এক সময়ে সত্যজিৎ নিজেই বলেছিলেন, দ্য সিনেমা হ্যাজ নাউ অ্যাটেন্ড এ স্টেজ হোয়্যার ইট ক্যান হ্যান্ডেল শেকস্‌পিয়ার অ্যান্ড সাইকিয়াট্রি উইথ ইকুয়াল ফেসিলিটি। কিন্তু 'নায়ক'-এ তিনি যেন এই 'ইকুয়াল ফেসিলিটির' চ্যালেঞ্জকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেলেন। আর বার্গমান 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি'র ফ্ল্যাশব্যাক-জটিলতায় এই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে সরাসরি পাঞ্জা লড়েছেন। 'নায়ক'-এর যে দৃশ্যে চন্দ্রালোকিত ছুটন্ত কঠিন রেললাইনের দিকে তাকিয়ে অরিন্দমের মনে ক্রমশ ঘনিয়ে আসে আত্মহত্যার ইচ্ছে, সেখানে আমি শুনতে পাই বার্গমান-এর অনস্বীকার্য প্রতিধ্বনি। 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি'তেও রয়েছে এমনই এক মৃত্যুময় পূর্ণিমা-রাত। সারা আর সিগফ্রিড পিয়ানোর কাছ থেকে ডিনার টেবিলে চলে যাবার পরেই আইজ্যাক-এর চোখ পড়ে আকাশে ছড়িয়ে যাওয়া চাঁদের আলোর দিকে। এ কোনও পূর্ণচাঁদের মায়া নয়, যা বৃদ্ধ আইজ্যাক-কে স্মৃতিমেদুর করে তুলবে। আকাশজোড়া এই ঠান্ডা নীল পূর্ণিমা যে শুধু মৃত্যুর প্রতীক, তাও নয়। তার চেয়ে জটিলতর কিছু—এই ঠান্ডা নীল আলোয় যেন ঘোষিত হয় আইজ্যাক-এর যৌন-জীবনের চূড়ান্ত পরাজয়। সেক্সুয়ালিটির শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত যেন নিঃশেষ হয়ে যায় এখানে। 'নায়ক'-এও আছে অরিন্দমের যৌন-জীবনের ব্যর্থতার প্রসঙ্গ—কিন্তু কখনই তীব্রভাবে নয়, আভাসে, ইঙ্গিতে। পূর্ণচাঁদের আলোয় আইজ্যাক দাঁড়ায় জানলার ধারে, দেয়ালের গায়ে একটা পেরেকে লেগে তার হাত কেটে যায়, রক্ত পড়ে চাঁদের আলোয়। চাঁদের আলোয় আইজ্যাক-এর রক্তাক্ত হাত নিঃসন্দেহে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় পাপ এবং মোক্ষ প্রাসঙ্গিক ক্রিশ্চান তর্কের সামনে। অরিন্দমের শূন্যতাবোধ, তার দীর্ণ হৃদয়ের হাহাকার কোনওভাবেই আইজ্যাক-এর মর্মভেদী দেউলিয়া অবস্থার প্রতিযোগী হয়ে ওঠে না বলেই, 'নায়ক'-এ রোম্যান্টিকতার সম্পূর্ণ বর্জনও হয়ত প্রয়োজনীয় মনে হয় না সত্যজিতের। পাপ, পুণ্য, যৌনতা, প্রেম—এই সব মানুষী অভিজ্ঞতা ঘিরে 'নায়ক'-এর বিস্তার তাই শেষপর্যন্ত রোম্যান্টিক অ্যাম্বিভ্যালেন্স বা উভয়বলতার মধ্যে বেছে নেয় পরিণতির চরম বিন্দু।

।। ৯ ।।

এক সময়ে সত্যজিৎ রায়ের বেশ কিছু শুটিং স্ক্রিপ্ট আমি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলাম। তাঁর হাতের লেখা এবং তাঁর আঁকা ছোট ছোট স্কেচ সমৃদ্ধ এইসব শুটিং স্ক্রিপ্ট বড় ভাল লাগে দেখতে। সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা রয়েছে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত জায়গায়, মার্জিনাল নোট বা পার্শ্বলেখনের ঠাসবুনন বৈচিত্র্যে। সত্যজিতের প্রায় প্রতিটি চিত্রনাট্যকে তার আদিরূপ থেকে একেবারে পরিণত শুটিং স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা চলে। এবং যে টুকরো টুকরো ভাবনাগুলি অসংলগ্ন বিক্ষিপ্ততা থেকে ক্রমে ঘনিয়ে এসে চিত্রনাট্যটিকে তার সংহত পরিণতির দিকে এগিয়ে দেয় সেগুলিকে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে আবিষ্কার করি পার্শ্বলেখনের অসংখ্য বন্ধনীর মধ্যে। আমাদের চোখের সামনে খুলে যায় ভাবনার অপ্রত্যাশিত জানলা। বুঝতে পারি এইসব বন্ধনীধৃত ছোট ছোট মন্তব্যের শিকড় জীবন, বন্ধুতা, রিরংসা, ভালবাসা, কামনা, প্রেম বিষয়ক ভাবনার অনেক গভীরে চলে গেছে। প্রায় বছর তিন-চার আগে আমি এ-সব শুটিং স্ক্রিপ্ট মন দিয়ে দেখেছিলাম। আশ্চর্য হয়ে তখন লক্ষ করেছিলাম সত্যজিৎ রায়ের মার্জিনাল নোটে কোথাও সাহিত্যিকতা সহজ উপলব্ধিকে বর্ণাঢ্য করে তোলেনি। এ-সব পার্শ্বলেখন পড়ে আরও নির্দ্বিধায় আমি বলতে পারি সত্যজিৎ রায়ের জীবনবোধে আগাগোড়া বিস্তৃত রয়েছে এক বিধুর রোম্যাণ্টিকতা। চারধারের স্খলন, পতন, মূল্যবোধের ভাঙচুর, মানসিক স্বাস্থ্যহানি ও আধুনিক মানুষের ব্যর্থতা ও বিচ্ছিন্নতা-বোধকে তিনি যন্ত্রণার সঙ্গে স্বীকার করে নিচ্ছেন না তা নয়, কিন্তু তাঁর রোম্যান্টিকতা, পলায়নীবৃত্তি কিংবা ভবিষ্যৎ-ধর্মিতা তাঁকে এগুলিকেই চরম বলে মেনে নিতে দিচ্ছে না। তাই তাঁর ছবিতে ক্রোধের বদলে আসছে সূক্ষ্ম 'আয়রনি'। তাঁর শুটিং স্ক্রিপ্টের পার্শ্বনোট পড়ে এবং তাঁর সব ছবি বারবার দেখে আরও যে ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছে তা হল, এই বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত আধুনিক পৃথিবীতে সত্যজিৎ বিশ্বাস করেন যে, বন্ধুতার মত অঘটন আজও সম্ভব, আজও হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগে জন্ম নেয় ভালবাসা, পৃথিবীতে কেউ-কেউ কখনও-কখনও কাউকে-কাউকে স্পর্শ করে অনেক গভীরে, আর মেয়েরাই এ পৃথিবীতে শান্তি ও সৌন্দর্যের অন্তিম আধার।

'কাপুরুষ' শুটিং স্ক্রিপ্টের কয়েকটি পার্শ্বলেখনে আমি চমকে উঠেছিলাম : 'করুণার (মাধবী মুখোপাধ্যায়) চুলে কাঁধে বৃষ্টির জল—অল্প।' অথবা, 'করুণা দরজার একটা পাল্লা খুলে দেয়। তার গরম লাগছে।' আর একটি জায়গায়, 'করুণা জল খেয়েছে। ঠোঁটের দু-পাশে লেগে থাকবে কি ?' কাপুরুষ-এর সমস্ত গল্পটি জুড়ে যখন সত্যজিৎ দুটি ভিন্ন জাতীয় পুরুষের নৈতিক ও আত্মিক দারিদ্র্যের দিকটা আমাদের কাছে খুলে দিচ্ছেন, তখন তিনি করুণার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন এবং আমাদেরও পাইয়ে দিচ্ছেন এমন এক ঐশ্বর্যের আভাস যা এই দুটি পুরুষের পৃথিবী থেকে একেবারে বিলুপ্ত। করুণা এসে দরজার একটা পাল্লা খুলে দেয়। তার প্রেমিকের (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) ঘরের দরজার একটি পাল্লা। কেননা তার গরম লাগছে। পার্শ্বলেখনের এই উক্তিটি আমার কাছে গভীর ভাবে প্রতীকী। করুণা হাঁফিয়ে উঠছে সত্যিকার বন্ধুতার জন্যে, ভালবাসার জন্যে। প্রেমহীন ক্লস্ট্রোফোবিয়া থেকে সে মুক্তি চায়। 'করুণার চুলে কাঁধে বৃষ্টির জল' করুণা চরিত্রের কারুণ্য-টুকুই যে শুধু ফুটিয়ে তোলে তাই নয়, আমাদের কাছে ঐ একটি মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে তার হৃদয়ের ভিজে-ভিজে অবস্থার ছোঁয়াচ এসে পেঁৗছায়। জল খাওয়ার পর করুণার ঠোঁটের দু-পাশে জলের রেখা লেগে থাকবে কিনা—এই আপাতসামান্য প্রশ্নে সত্যজিতের সৌন্দর্য চেতনার এমন একটি দিক আমাদের সামনে মুহূর্তে খুলে যায় যা হয়ত অনেক তর্ক-আলোচনাকে উপেক্ষা করেও অনুদ্ঘাটিত থাকতে পারত। ঠোঁটের দু-পাশে জল লেগে থাকার ধারণাটা শুধু যে নিছক বাস্তব বোধ থেকে এসেছে তাই নয়। ঠোঁটের কোণে জল—এই ছবিটার মধ্যে রয়েছে অনস্বীকার্য ইন্দ্রিয়-মগ্নতা। করুণা সুন্দরী কিনা সেটা বড় কথা নয়। বড় কথাটা হল, সত্যজিতের সব নারী চরিত্রের

মত (বিমলা একমাত্র ব্যতিক্রম। সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি।) করুণারও আবেদন মূলত লিরিকাল ও সেনশুয়াস। ভিজে ঠোঁট এই জাতের আবেদনের একটি নির্ভুল অস্ত্র মাত্র। 'কাপুরুষ' ছবির অন্তিম দৃশ্যে যখন করুণার কাপুরুষ প্রেমিক তাকে দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যান করল তখন করুণা আঘাত পেল কিনা সে-কথা সত্যজিৎ স্পষ্ট করে বলেন নি। করুণা স্টেশনে সত্যিই ঘুমের ওষুধের শিশিটি ফিরিয়ে নেবার জন্যে এসেছিল, না স্বামীকে ছেড়ে প্রেমিকের সঙ্গে ঘর ভেঙে চলে যাবার জন্যে এসেছিল, এই চূড়ান্ত প্রশ্নটির কোনও উত্তর দেননি সত্যজিৎ। গল্পের এই অন্তিম 'অ্যামবিভ্যালেন্স' খুবই তাৎপর্যময়। এই উভয়বলতাই করুণার চরিত্রে বিচিত্র সম্ভাবনার একটি মাত্রা যুক্ত করে।

সত্যজিৎ রায়কে মেয়েদের যে-সব গুণ সবচেয়ে আকর্ষণ করে তা হল, সাহস, সততা ও মানসিক দৃঢ়তা। 'মহানগর' ছবির আরতির (মাধবী মুখোপাধ্যায়) মধ্যে এসব গুণ পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'মহানগর'-এর শুটিং স্ক্রিপ্টে একটি পার্শ্বলেখন চোখে পড়ার মতন। মন্তব্যটি আরতির স্বামী সুব্রতর (অনিল চট্টোপাধ্যায়) ছোট বোন বাণী (জয়া ভাদুড়ী) সম্পর্কে। সত্যজিৎ লিখছেন, ঝগড়ার সময় বাণী পিণ্টুকে (সুব্রত-আরতির পুত্র) সরিয়ে নিয়ে যায়।' বাণীর নিজের বয়েসই অল্প। সে এখনও ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেনি। তার বয়েস অল্প বলেই এই মন্তব্যের তাৎপর্যটা আমাদের কাছে আরও বেড়ে যায়। আমরা বুঝতে পারি মেয়েদের মধ্যে প্রোটেক্ট করার, আশ্রয় দেবার প্রবণতা প্রায় ইনস্টিংটিভ, ওটা বয়েস বা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না। সত্যজিতের ছবির প্রায় প্রতিটি নারী চরিত্রের মধ্যেই এই প্রোটেকটিভ ইনস্টিংটটা অল্পবিস্তর কাজ করছে।

সত্যজিতের নায়িকাদের মধ্যে যাদের প্রোটেকটিভ ইনস্টিংট আমাদের সবচেয়ে মুগ্ধ করে তারা হল 'নায়ক' ছবির অদিতি (শর্মিলা ঠাকুর) এবং 'সীমাবদ্ধ' ছবির টুটুল (শর্মিলা ঠাকুর)। এখানে ইচ্ছে করেই এমন দুটি নারী চরিত্র বেছে নিচ্ছি যারা প্রেমিকা ও বান্ধবীর মাঝামাঝি। অপুর মা সর্বজয়া এবং দিদি দুর্গার কথা আলাদাভাবে লিখব বলে এখানে ওদের প্রসঙ্গ টানছি না। বিশেষ করে অপু এবং তার মার মধ্যে সম্পর্ক এত জটিল যে সে প্রসঙ্গে আলাদাভাবে না লিখে উপায় নেই। এখানে 'নায়ক' ছবির চিত্রনাট্য থেকে খানিকটা উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে। মেয়েদের বন্ধুতা বলতে সত্যজিৎ ঠিক কি বোঝেন, তার আবেদন ও সৌন্দর্যটা ঠিক কোথায় সেটা অনেক দূর পর্যন্ত ধরা দিয়েছে অরিন্দম-অদিতির এই মিতভাষ সংলাপে :

অরিন্দম : কোথায় যেন একটা ফাঁক, একটা অভাববোধ......

অদিতি : কেন ?

অরিন্দম : মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না। আপনি ত আর আমাদের লাইনে আসবেন না।

অদিতি : তা আসব না। জানেন, আমাদের জগতটাই আলাদা। আমরা ট্রামে বাসে চড়ি, রাস্তায় ঘাটে ঘোরাফেরা করি......

দুজনে পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। অরিন্দমের চাহনিতে তখন ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নেই। অদিতির দৃষ্টিতে রয়েছে একটা সহজ সংবেদনশীল সৌহার্দ্য।

অরিন্দম : পরপর তিনটি ছবি মার খেলেই কিন্তু আমিও ও জগতে ফিরে যেতে পারি।

অদিতি : তা হবে না। নিশ্চয়ই হবে না। আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন। অনেক দিন। আপনার বাজার ঠিকই থাকবে। অরিন্দম মৃদু হাসে। অদিতির ব্যাগ খোলাই ছিল, সে তার ভিতর থেকে একতাড়া কাগজ বার করে।

অদিতি : আপনার ইন্টারভিউ......

অদিতি কাগজগুলো একসঙ্গে কুণ্ডলী পাকিয়ে সামনে রাখা জলের গেলাসের ভিতর গুঁজে দেয়।

অরিন্দম : ও কি। আপনি কি মন থেকে লিখবেন নাকি ?

অদিতি : মনে রেখে দেব। চলি।

বন্ধুতা, প্রেম ও মহিলাদের প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের ভাবনা রোমাণ্টিকতাকে কতদূর প্রশ্রয় দেয় সে প্রসঙ্গে তাঁকেই সরাসরি প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'হয়ত তুমি ঠিকই বলছ, মহিলাদের বিষয়ে আমার ধারণাটা শেষ পর্যন্ত রোম্যান্টিকই। সেই কারণেই আমার অধিকাংশ ছবিতে (বিমলা এবং চারুলতা চূড়ান্ত ব্যতিক্রম) মূল কাহিনী থেকে আমি তাদের একটু সরিয়ে রাখি। আমি পুরুষদের সঙ্গে তাদের মূল পার্থক্যটা এইভাবেই দেখাতে চাই। পুরুষদের কাজের পরিধিটা অনেক বড়। তাদের কমিটমেণ্ট, ইনভল্ভমেণ্ট অনেক বেশি। পুরুষদের কাজের জগৎ থেকে মেয়েরা স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন। সুতরাং আমার ছবির মেয়েদের মধ্যে আমি নিয়ে এসেছি একটা নির্লিপ্তি, একটা ডিট্যাচমেন্ট। মেয়েদের একা, নিঃসঙ্গ, আত্মমগ্নভাবে ভাবতে আমার ভাল লাগে। তাতে মেয়েদের চরিত্রে শক্তি আর সৌন্দর্যের দিকটা আমি সহজে বুঝতে পারি। আমার মনে হয় মেয়েদের মনের জোরটা পুরুষদের চেয়ে ঢের বেশি, তাদের এক ধরনের সততা বা ইণ্টিগ্রিটি আছে যেটা পুরুষদের মধ্যে সচরাচর পাওয়া যায় না। বলতে পার মেয়েদের মনের ঐশ্বর্য আমাকে মুগ্ধ করে। সে জন্যে দেখবে আমার ছবিতে মেয়েদের ভাবনার জগৎটা তাদের কাজের জগতের চেয়ে অনেক বেশি বড়। আমি মেয়েদের তুলে ধরি একটা প্রসেস অফ ইনটেলেকশনের মধ্যে দিয়ে। তাদের মনটা আমায় ফ্যাসিনেট করে। এবং সেটাকে আমি নানা দিক থেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করি।'

'মহানগর' ছবির চিত্রনাট্যে আরও দুটি 'মার্জিনাল' লেখন আমার মনে আছে। প্রথমটি হল, 'বাণী মাটিতে শোয়।' দ্বিতীয়টি, 'পরের দিকে আরতি ঘুমচ্ছে, সুব্রতর ঘুম নেই।' বাণী মাটিতে শোয়—এই ছোট্ট উক্তিটির মধ্যে মেয়েটির ত্যাগের দিকটা বোঝা গেল। তার মাটিতে শোয়ার কারণ সে অন্যদের জায়গা ছেড়ে দিয়েছে, এবং তার কাছে 'বদান্যতা' এত স্বাভাবিক যে সে-জন্যে তার মধ্যে কোনও অহঙ্কার, দুঃখবোধ বা পরশ্রীকাতরতা নেই। কিন্তু বাণীর এই ক্ষুদ্র মহত্ত্ব, এই আপাতসামান্য স্বার্থত্যাগ (যা গল্পের দিক থেকে আদৌ প্রয়োজনীয় নয়) সত্যজিৎকে এতটাই মুগ্ধ করল যে বাণী মাটিতে শোয় এই খবরটি দর্শকদের আলাদা করে পৌঁছে দেবার তাগিদ তিনি অনুভব করলেন।

তিনি বাণীর ত্যাগের দিকটা দেখালেন কিন্তু সেটাকে চিরাচরিত বাঙালী প্রথায় সেণ্টিমেণ্টালাইজ করলেন না। ছোট্ট মেয়ের মানসিক দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় পেলাম আমরা, বয়েসে ছোট হয়েও সে যে ভেতরে ভেতরে অনেক বড় হয়ে উঠেছে সে-কথা বুঝতে পারলাম, কিন্তু কোথাও এই ঋজু রেখার স্বল্প পরিসর চরিত্রায়ণটি ভাবালুতায় ঝাপসা বা অবিশ্বাস্য হয়ে উঠল না। এর থেকে দুটো জিনিস পরিষ্কার বোঝা গেল। প্রথমত, মহিলা-প্রাসঙ্গিক ভাবনায় সত্যজিৎ সেণ্টিমেণ্টালিটি বা ভাবালুতা এড়িয়ে চলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি কখনই কৃপা বা করুণার দৃষ্টিতে মেয়েদের দেখেন না। তিনি নিজেই আমাকে বলেছেন, 'দৈহিক শক্তিতে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে নিশ্চয়ই দুর্বল। কিন্তু বুদ্ধিতে কিংবা মানসিক শক্তিতে তারা কোনও ভাবে পুরুষদের চেয়ে কম নয়। সুতরাং আমি শেষ পর্যন্ত মেয়েদের প্রতি বিশ্বাস হারাতে পারি না। পুরুষদের চেয়ে তারা অনেক বেশি যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করতে পারে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সত্যজিৎ রায়ের নারী চরিত্রগুলি সম্পর্কে মারী সীটন-এর এই উক্তিটি: সত্যজিৎ রায়ের নারী চরিত্রগুলির একটিকেও সরাসরি ফেমিনিস্ট বলা চলে না। কিন্তু ছবিগুলি দেখতে দেখতে আমরা আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করি কিভাবে ফেমিনিস্ট অ্যাটিটিউডটা গড়ে উঠছে। আসলে সত্যজিতের পুরুষ ও নারী চরিত্রগুলি সেই সহজাত সৃষ্টিশীলতা থেকে জন্ম নিয়েছে যা কোনভাবেই পুরুষের সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স-এ বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। ১৯৬১ সাল থেকে এই ব্যাপারটা আরও ভালভাবে বোঝা যায়। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র মণীষা চরিত্রে এই নতুন মোড় নেওয়াটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তারপর 'অভিযান' ছবিতে গুলাবী তার কলঙ্কিত অতীত সত্ত্বেও

নরসিংহকে পাপের পথ থেকে সরে আসবার অনুপ্রেরণা দেয়। 'মহানগর' ছবিতে আনিতা একার সাহসে শেষপর্যন্ত যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তখন কিন্তু সে তার স্বামীকে মানসিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার জন্যে পরিত্যাগ করে না। 'চারুলতা' এমন একটি সময়ের পটভূমিকায় তৈরি যখন সমস্ত পৃথিবীতেই মেয়েরা নিজেদের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্যে চেষ্টা করছিল। চারু স্বভাবতই সাহিত্যরচনায় ও ভালবাসায় তার সাহসের পরিচয় দেয়। আর 'কাপুরুষ' ছবির যে মেয়েটি একদা তার যৌবনে এক কাপুরুষ প্রেমিকের জন্যে সব কিছু ত্যাগ করতে চেয়েছিল সে-ই শেষপর্যন্ত আপাতমধুর রোমান্সের লোভ সংবরণ করে তার নির্বোধ স্বামীর সঙ্গে বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দেবার সাহসী সিদ্ধান্ত নেয় যদিও এই স্বামীর সঙ্গে সহবাসে তার 'মাথা ধরে'।

॥১০॥

সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' এবং সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে-বাইরে'—এই দুটি ছবির মধ্যে ওপরকার মিল অনস্বীকার্য। 'চারুলতা'র প্রতিধ্বনি সত্যজিৎ রায় খুব ভেবেচিন্তে 'ঘরে-বাইরে'তেও এনেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য যেন স্টাইলের এই প্রতিধ্বনির মাধ্যমে তুলে ধরা দুটি ছবির আপাত সাদৃশ্য সত্ত্বেও, মৌলিক পার্থক্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রটিকে। পার্থক্যের এই বিস্তারিত ক্ষেত্রে রয়েছে দৃষ্টি-ভঙ্গির তফাত, ট্রিটমেন্টের ফারাক, চরিত্রায়ণের প্রতিতুলনামূলক সঞ্চার। বিশেষ করে এই তফাতটা গড়ে উঠেছে চারুলতা ও বিমলার চরিত্রকে ঘিরে। এবং এই পার্থক্যের পিছনে চারুর স্বামী ভূপতি এবং বিমলার স্বামী নিখিলেশের অবদানকে কখনও ইঙ্গিতে, কখনও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন সত্যজিৎ রায়। 'চারুলতা' এবং 'ঘরে-বাইরে' ছবি দুটি পাশাপাশি দেখলে যে তফাতটা প্রথমেই চোখে পড়ে তা হল মানসিকতার, এবং ভিন্ন মানসিকতা থেকে উঠে আসা স্টাইলের। 'চারুলতা'র মধ্যে যে গভীর ও বিস্তারিত লিরিসিজম বা গীতিধর্মিতা আমরা পাই 'ঘরে-বাইরে'তে তা 'ইচ্ছাকৃত' ভাবেই অনুপস্থিত। অথচ 'ঘরে-বাইরে'-র সেট, দৃশ্যায়নের চরিত্র, রঙের ট্রিটমেন্ট এবং ভিশুয়াল আবেদনে 'লিরিকাল'কে অস্বীকার করবার উপায় নেই। 'চারুলতা'র বহিরঙ্গের লিরিসিজম তার অন্তরের গীতিধর্মিতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে। ছবিটির ভিশুয়াল এবং থিম্যাটিক ঋদ্ধি এই পরিপূরকতা থেকেই সম্ভব হয়েছে। 'ঘরে-বাইরে'-র টেক্সচার এবং স্ট্রাক-চারকে কিন্তু বুঝতে হবে বহিরঙ্গের গীতিধর্মিতা ও অন্তরের তীব্র তিক্ততা এবং বিস্তারিত আয়রনির প্রেক্ষিতে। এবং এই পরিপূরকতা ও পার্থক্যের সূত্র ধরেই যথাক্রমে বুঝতে হবে সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা ও সত্যজিৎ রায়ের বিমলাকে।

প্রথম ছবিটিতে মনে হতে পারে বিমলা এবং চারুলতা একই মুদ্রার এ-পিঠ ও ও-পিঠ। তাদের মূল সমস্যাকে যদি একাকিত্ব বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে তাদের মধ্যে সাদৃশ্যটা আরও ঘন হয়ে আসে। কিন্তু সত্যজিতের ছবিতে (মূল কাহিনীর প্রসঙ্গে আমি যাচ্ছি না) এই দুই নারীর একাকিত্ব সমধারার নয়। চারুর একাকিত্ব প্রথম থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত 'ইমোশনাল'। স্বামী ভূপতি রাজনীতি এবং কাগজ নিয়ে এতই ব্যস্ত যে চারুলতাকে সঙ্গ দেবার তার সময় নেই। কিন্তু চারুলতা যে নিঃসঙ্গ এবং সে যে এভাবে যন্ত্রণা পাচ্ছে সে কথা ভূপতি বোঝে। এইখানেই ভূপতি চরিত্রের লাবণ্য এবং স্নিগ্ধতা। ভূপতি তার ভাই অমলকে বাড়িতে নিয়ে আসে চারুলতার মধ্যে সুপ্ত সাহিত্য-প্রবণতাকে প্রেরণা দেবার জন্যে। ভূপতির ট্র্যাজিক প্রমাদটা ছিল জীবন ও মন সম্পর্কে তার সীমিত ধারণায়। মনের একটি প্রবণতাকে কখনও সমগ্র মনের বাসনা, ইচ্ছে, স্বপ্ন, মান-অভিমান থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যায় না। চারুলতার মধ্যে সাহিত্যিক প্রবণতাকে ইন্ধন যোগাতে গিয়ে অমল যে চারুর সুপ্ত মনের এক অপ্রত্যাশিত শিকড় স্পর্শ করে ফেলে তাই ত স্বাভাবিক।

আর এইখান থেকেই হয় অন্তিম ট্র্যাজেডির সূত্রপাত। সত্যজিৎ রায় 'চারুলতা'য় এই ট্র্যাজেডির আকস্মিকতা (ভূপতির দিক থেকে) এবং অমোঘতা (দর্শকের দিক থেকে) একই সঙ্গে তুলে ধরেছেন। 'ঘরে-বাইরে'তে বিমলা কিন্তু চারুলতার ভঙ্গিতে নিঃসঙ্গ নয়। আমার ত মনে হয় নিষ্কর্মা স্বামীকে দেখতে দেখতে সে ক্লান্ত। নিখিলেশ সারাদিন কি করে? এ প্রশ্নের কোনও সরাসরি স্পষ্ট উত্তর ছবিতে নেই। সত্যজিৎ রায় এ কথা আমাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে একদা নিখিলেশ শখের রাজনীতি করত (সাবান তৈরি ইত্যাদি), কিন্তু এখন তার আর কোন শখের বালাই নেই। এটা কি পরিপক্কতা বা ম্যাচুয়রিটির লক্ষণ? সত্যজিৎ রায় সে সম্পর্কে খুব স্পষ্ট নন। এবং যেহেতু তিনি সত্যজিৎ রায়, আমি ধরেই নিচ্ছি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই স্পষ্ট নন। তীব্র শ্লেষ এবং বিস্তারিত আয়রনিকে আড়াল দেবার জন্যে নিখিলেশের চরিত্র-বিশ্লেষণের এই 'অ্যামবিভ্যালেন্স' প্রয়োজনীয়। নিখিলেশ সারাদিন কি করে—এ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে অন্তত খুব সহজ। সে কিছুই করে না, সারাদিন তার স্ত্রীর দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চারুলতা ভূপতিকে দূরবীন দিয়ে দেখে। এবং চারুলতার দিকে তাকাবার ভূপতির কোনও সময় নেই। 'ঘরে-বাইরে'তে বিমলা কিন্তু কখনও চারুলতার মত করে নিখিলেশকে কাছে পেতে চায় না। কারণ নিখিলেশের সঙ্গে তার আপাত দূরত্ব একেবারেই নেই বললেই চলে। বরং 'ঠাণ্ডা' নিখিলেশ যেভাবে বিমলার পিছন-পিছন টিপ্পুনি কেটে ঘুরঘুর করে, তাতে বিমলা তিতিবিরক্ত। একাধিকবার তাঁর ছবিতে সত্যজিৎ রায় এই ব্যাপারটা স্পষ্ট করে তুলেছেন। বিমলার গান শেখার দৃশ্যে নিখিলেশ যেভাবে ঢুকে পড়ে, তাতে বিমলা খুশি হয় না। চারুলতা বাগানে যেখানে অমলের সঙ্গে একা সেখানে ভূপতি ঢুকে টিপ্পুনি কাটছে, একথা আমরা ভাবতে পারি না। ভাবতে পারি না তার কারণ সেটা ভূপতি চরিত্রের ট্র্যাজিক গ্র্যাঞ্জারের সঙ্গে খাপ খায় না। সন্দীপের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ বিমলার উদ্দেশে ইংরেজী সুর ভাঁজার জন্য টিপ্পুনি, কিংবা পূর্ণিমার রাত্তিরে বারান্দায় বিমলার প্রতি কটাক্ষ কিংবা চাঁদের আলোয় বৌয়ের সঙ্গে বিছানায় ইনটিউইশন শব্দটিকে অতি প্রচেষ্টভাবে গড়িয়ে দিয়ে সন্দীপকে ব্যঙ্গ করা (সন্দীপই ছবিতে প্রথম ইনটিউইশন শব্দটিকে ব্যবহার করছে)—এই সব কিছুর মধ্যে রয়েছে নিখিলেশের ঠাণ্ডা অত্যাচারী মনের পরিচয়। যাকে আমি এক ধরনের 'ম্যালিগনিটি' বলতেও পিছিয়ে যাব না। এবং বিমলাকে সত্যজিৎ দেখিয়েছেন এই ম্যালিগনিটির শিকার হিসেবে।

সত্যজিতের 'চারুলতা'য় ভূপতি কিন্তু একেবারেই নিষ্কর্মা নয়। এবং এই কাজের জগতের সূত্র ধরেই সে নিঃসঙ্গও নয়। তার বন্ধুবান্ধব আছে, খবরের কাগজ আছে, এবং এক অর্থে তার চারুও আছে। ভূপতি যখন বলে, 'আমার চারু আছে', তখন সেই কথাটার পিছনে আয়রনি যতই গভীর হোক না কেন, কোথাও কিন্তু শ্লেষের তিক্ততা নেই। সত্যজিতের নিখিলেশ কিন্তু নিজেই নিঃসঙ্গ। সে রোম্যান্টিক ডিলিউশনের চূড়ান্ত শিকার। সে তার বৌকে নিয়ে সাবান তৈরির মতই যে পুতুল খেলাটা খেলে তার বীজ কিন্তু রয়েছে, অন্তত আমার মতে, তার মানসিক অবসাদ এবং দৈহিক 'অকর্মণ্যতা'র মধ্যে। সত্যজিৎ রায় এমন কিছুই রাখেন নি তাঁর ছবিতে যা আমার এই ধারণার সরাসরি প্রতিবাদ করবে। বরং এই একটিমাত্র প্রেমিস-এর ওপরেই তাঁর তৈরি নিখিলেশ বিশ্বাস্যভাবে দাঁড়াতে পারে। নিখিলেশের শয়তানির মধ্যে এমন কি ইয়াগো কিংবা তৃতীয় রিচার্ড-এর মহানতাও আমি পাই না (কারণ সত্যজিৎ সেই স্কেল-এ নিখিলেশকে তৈরি করেন নি) যাতে নিখিলেশকে আমি ট্র্যাজিক ক্যারেক্টার বলতে পারি। বরং 'ঘরে-বাইরে'র দৃশ্যায়নে এবং চাউনি-বিন্যাসে যে জমক তা কিন্তু নিখিলেশের সামান্যতা ও ভিলেনির 'ফয়েল' হিসেবেই কাজ করেছে। এই বিরোধিতা থেকেই উৎসারিত 'ঘরে-বাইরে'র বাতায়ন।

চারুলতাকে যেমন বুঝতে হয় ভূপতির স্নেহময় অবহেলার পরিপ্রেক্ষিতে, তেমনি সত্যজিৎ রায়ের বিমলাকে বুঝতে হবে নিখিলেশের শীতল সংসর্গ এবং স্বামীর সঙ্গে তার দৈহিক দূরত্বের সূত্র

ধরে। সত্যজিৎ 'চারুলতা'য় ভূপতির সঙ্গে চারুর কোনও বিছানা-দৃশ্য নিয়ে আসার প্রয়োজন বোধ করেন নি, তার কারণ এই দুই চরিত্রের বিভেদের মূল ক্ষেত্র হিসেবে দেহকে তিনি তুলে ধরতে চান নি। চারুর সঙ্গে অমলের সম্পর্ক স্থাপনে চুম্বনেরও কোনও প্রয়োজন তিনি দেখেন নি। চারু যে দৃশ্যে অমলের বুকের ওপর মুখ গুঁজে কাঁদে, সেখানে চুম্বন ছাড়াই চারুর 'সারেন্ডার' সম্পূর্ণ কারণ এই সমর্পন মূলত ইমোশনাল। অমল চলে গেলে চারুর অস্তিত্বে অনেকগুলো শিকড় উপড়ে নিয়েই সে চলে যাবে। চারুর সঙ্গে অমলের জড়িয়ে পড়ার মধ্যে প্লেটোনিক প্রেম ছাড়া আর কিছুই দেখছি না এমন নাবালক কথা আমি বলব না। সেক্স-বর্জিত প্লেটোনিক প্রেমের কোনও অস্তিত্ব আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখলে এমন প্রেমের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা খুবই শক্ত হবে যেখানে সেক্সের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। কিন্তু 'চারুলতা'য় সত্যজিৎ নায়িকার সারেন্ডারকে ইমোশনাল নতি হিসেবেই তুলে ধরেছেন। ভূপতি ও চারুলতার নীড় যে নষ্ট হয়ে গেল তার কারণও কিন্তু তাদের ক্রমবর্ধমান মানসিক ফারাক। এই মানসিক ব্যবধানের সূত্র ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে দৈহিক ব্যবধান গড়ে উঠবে সে কথা তীব্র ইঙ্গিতে সত্যজিতের ছবিতে এসেছে। তবু 'চারুলতা'র মূল ক্ষেত্র কিন্তু ভূপতি ও চারুর সেক্সুয়াল সম্পর্ক কিংবা অমল ও চারুর মধ্যে ইনসেসটুয়াস বা অবৈধ যৌন সম্পর্ক নয়।

'চারুলতা' ও 'ঘরে-বাইরে' দুটি ছবিতেই নারী মুক্তির ভাবনাটি মূল চিন্তাধারার একটি। কিন্তু সত্যজিৎ রায় চারু ও বিমলার ভিন্ন রূপায়ণের মাধ্যমে দুটি আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে নারীমুক্তির ব্যাপারটাকে দেখেছেন। দৃষ্টিকোণের এই পার্থক্যকে তাই এই দুই কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রায়ণের প্রেক্ষিতেই ব্যাখ্যা করতে হবে। চারুলতার মনের গভীরতা, তার সাহিত্যপ্রীতি এবং তার আত্মচেতনা অনেক গভীর, অনেক বিস্তৃত। অমলের সঙ্গে তার সাহিত্যচর্চার ভিত্তিভূমি তার মনের প্রবণতার মধ্যেই রচিত হয়েছে। তাকে ওপর থেকে ইংরেজী গানে, কথায় সাজানো হচ্ছে না।

ভূপতি বা অমল তাকে খোঁটা দিয়ে জিজ্ঞেস করে না যে সে মেমসায়েবদের মত চা ঢালতে শিখেছে কিনা। চারুর মানস-বিকাশ ঘটছে সহজ পথে, সাবলীল ভাবে। এবং এই প্রস্ফুটনের প্রেরণা হিসেবে কাজ করছে যে-অমল, তার সঙ্গে চারুর জড়িয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। ভূপতির ট্র্যাজেডিটা হল, এই খুব স্বাভাবিক ব্যাপারটাই যে ঘটতে পারে সে সেটা আন্দাজ করতে পারে নি। উল্টোদিকে, সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে-বাইরে' অনেক দূর পর্যন্ত নারীমুক্তির ভাবনাটির ওপর এক ধরনের আয়রনিক আলোকপাত। নিখিলেশ যেভাবে বিমলাকে একটা ওপরের পালিশ লেপটে দিয়ে অন্দরমহলের বাইরে নিয়ে যায় তাতে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে বিমলার তথাকথিত আধুনিকতা কোনও গভীর মূল্যবোধ, জীবনবোধের ওপর দাঁড়িয়ে নেই।

আমি এ কথা বলতেও দ্বিধা করব না যে সন্দীপ বিলিতি জিনিস ভালবাসে বলেই যেন স্ত্রীর গায়ে একটু বিলিতি পালিশ লাগিয়ে নিখিলেশ তাকে সন্দীপের হাতে তুলে দিল—ব্যাপারটা এতই 'সুপারফিশিয়ালি' দেখানো হয়েছে।

ফলে উপন্যাসে যাই ঘটুক না কেন সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে বিমলার মনের ঐশ্বর্য আমাদের মুগ্ধ করে না। চারুলতা সত্যজিতের রোম্যান্টিক নায়িকা। বিমলা তা নয়। যদি স্ত্রী-স্বাধীনতার ভাবনাকে আমরা 'চারুলতা' ও 'ঘরে-বাইরে'র পশ্চাৎপট বলে ভেবে নিই, তবে, এই মূল ভাবনা

কিন্তু এই দুটি ছবির ভিন্ন 'প্রিজম্'-এ বিম্বিত। 'চারুলতা'র নায়িকার সঙ্গে আমরা অতি সহজে প্রেমে পড়ি। সত্যজিৎ নিজেও যেন চারুলতাকে ভালবাসেন—ছবিটি দেখতে দেখতে তা-ই মনে হয়। তাঁর মুগ্ধতা আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় প্রবলভাবে। চারুলতার 'অন্যায়'কেও আমরা মনে মনে সমর্থন না করে পারি না, ন্যায়-অন্যায়ের ওপরে সেই সুন্দরীর দ্বারা এতদূর প্লাবিত হই। বিমলা ও সন্দীপের প্রেমের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে অন্তত রোমান্টিকতার চিহ্ন মাত্র নেই। সত্যজিৎ রায় ইচ্ছাকৃতভাবেই চারুলতার রোমান্সকে এখানে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন। বিমলা এবং সন্দীপের মধ্যে যা ঘটে তার প্রেক্ষিতে রোমান্সের কোনও সমর্থনই নেই। নিখিলেশ অত্যন্ত সচেতনভাবে তার এক ধরনের দর্শকামুকতার পরিতৃপ্তির জন্যেই যেন বিমলাকে সন্দীপের প্রতারক ফাঁদের মধ্যে নিক্ষেপ করে। তাই 'চারুলতা'র ট্র্যাজেডির মধ্যে যে অমোঘতা আছে এবং যে মহত্ত্ব আছে, 'ঘরে-বাইরে'তে তা নেই। কিন্তু 'ঘরে-বাইরে'র অপরিসীম তিক্ততা অতুলনীয়। এই তিক্ততার বাহক একদিকে নিখিলেশ, অন্যদিকে সন্দীপ। নিখিলেশ এবং সন্দীপ আমার মনে দুই ভিন্নজাতের ভিলেনির অসামান্য প্রতিভূ।

সন্দীপের ভিলেনি অকপট, সোচ্চার এবং নির্লজ্জ। সে কতদূর বেহায়া সেটা সবচেয়ে ভাল বোঝা যায় একেবারে শেষের দিকে যখন সে বিমলার চুলের কাঁটাটা নিখিলেশের সামনেই পকেটে পুরে বলে সেটা সে নিয়ে চলল। নিখিলেশ জগতের বিরল স্বামীদের একজন যারা সন্দীপের এই আহাম্মকি নিরুত্তরভাবে মেনে নেবে এবং সেই মেনে নেওয়ার মধ্যেও কোনও 'ট্র্যাজিক প্যাশন' থাকবে না। বিমলার ঠোঁটে নিখিলেশের অন্তিম চুম্বন কিন্তু কোনভাবেই এই ট্র্যাজিক প্যাশনের বাহক নয়। এই চুম্বনের মধ্যে দিয়ে সে তার আহত ইগোকে কিঞ্চিৎ 'ঘোষণা' করছে মাত্র। নিখিলেশের আত্মহত্যার মধ্যেও ওথেলোর আত্মহত্যার মহত্ত্ব নেই— নিখিলেশের মধ্যে ভালবাসার প্যাশন নেই বলে। ডেসডেমনা একদিকে যেমন ইয়াগোর চাতুরির এবং 'মোটিভলেস ম্যালিগনিটি'র শিকার তেমনি অন্যদিকে সে ওথেলোর অনিরুদ্ধ প্যাশনের শিকার। ডেসডেমনা অসহায় পুতুল মাত্র। বিমলা কিন্তু কোনভাবেই অসহায় পুতুল নয়। সে জেনেশুনে নিখিলেশের মত বরফের দহন থেকে পালিয়ে গিয়ে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিচ্ছে। এবং এই ঝাঁপ দেওয়ার মধ্যে কোনও রোম্যান্টিক প্রেরণা থাকছে না। উপন্যাসে সন্দীপের রাজনীতি এসেছে, অন্তত প্রাথমিকভাবে, রোম্যান্টিক চুম্বকের মত, 'ওথেলো' নাটকে ডেসডেমনার কাছে যেমন আসে ওথেলোর মুখে সাতরাজ্যের গল্প। 'ঘরে-বাইরে' ছবিতে বিমলা যে সন্দীপের দিকে পা বাড়াচ্ছে তার পরোক্ষ কারণ নিখিলেশের যৌন-শৈত্য। আর প্রত্যক্ষ কারণ বিমলার নিজেরই অতৃপ্ত তাড়না। এক কথায়, বিমলা সত্যজিৎ রায়ের সবচেয়ে তাড়িত নারী। আমি জানি না সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবির শেষ দৃশ্যে বিমলাকে বিধবা দেখিয়ে এই তাড়নার অবসানের বা কোনরকম ক্যাথারসিসের ইঙ্গিত আনতে চেয়েছেন কিনা। আমার সেই দৃশ্যে মনে পড়েছে তাঁর 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিতে সেই অতৃপ্ত বিধবাটির (কাবেরী বসু) কথা, যার বৈধব্যের আপাত প্রশান্তির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে শরীরী বাসনা। আমার ত মনে হয় 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র এই অস্ফুটভাবে তাড়িত বিধবাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের বিমলার বীজ।

'ঘরে-বাইরে'র ঠিক আগেই আরও একটি যৌনতা তাড়িত নারীর কথা সত্যজিৎ রায় বলেছেন তাঁর 'পিকু' ছবিতে। সত্যজিতের নিজের লেখা গল্প থেকে এই ছবি। 'ঘরে-বাইরে'র মত এই ছবিতেও মূল চরিত্র তিনটি—স্বামী, স্ত্রী এবং স্ত্রীর প্রেমিক। এ-ছবিতেও স্ত্রীর সঙ্গে তার প্রেমিকের সম্পর্ক যে দেহজ সে বিষয়ে কোনরকম ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। স্বামীটি জানে যে তার স্ত্রী অন্য এক পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী। শুধু তাই নয়, তারই বেডরুমে এই ব্যাপার প্রতিদিন দুপুরে ঘটছে। এবং স্বামীটি তা জানতে পারে মাথার বালিশে অন্য পুরুষের চুল দেখে। এই স্বামীর সঙ্গে নিখিলেশের পার্থক্য, এত ক্ষীণ প্রমাণ থেকেও সে যন্ত্রণা পেতে পারে, স্ত্রীকে সন্দেহ করতে পারে। আবার এই স্বামীটির সঙ্গে নিখিলেশের সাযুজ্য হল চরিত্রে প্যাশনের অভাবে। পিকুর

নায়িকা কিন্তু বিমলা কিংবা চারুর চেয়ে অনেক বড় এক চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে—একদিকে যৌনতার তাড়না, অন্যদিকে মাতৃত্বের দাবি। মাতৃত্বের মধ্যেও যদি নারীর দেহজ তাড়নার নিরসন না হয় তাহলে বৈধব্যের মধ্যে সেই তাড়নার প্রশমন ঘটবে, এ কথা মেনে নিতে পারি না। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র সত্যজিৎ রায়ও পারেন না। তিনি রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যেন নিজের বিরোধিতা করেই বিমলার বৈধব্যের মধ্যে সেক্সুয়াল প্যাশনের ক্যাথারসিসকে নিয়ে এসেছেন। আমার কাছে বিমলার এই পরিণতি খুবই দুর্বল। কিন্তু দমিত যৌনতার স্টাডি হিসেবে সত্যজিতের নায়িকাদের মধ্যে বিমলা নিঃসন্দেহে অনন্যা।

ভারতীয় ছবিতে ভয়ারিজম বা দর্শকামের ট্র্যাজিক শিকার হিসেবে বিমলা ছাড়া আর কোনও নারীকে আমি ভাবতে পারি না। 'নায়ক' ছবির সেই চরিত্রটির কথা আমাদের মনে আসে যে নিজের স্ত্রীকে তার কেরিয়ারের জন্যে তার বস্-এর হাতে তুলে দিতে চায়। এই চরিত্রের মধ্যে ভিলেনি আছে, আছে ঘৃণ্য ক্লীবতা এবং শঠতা, কিন্তু ভয়ারিজম নেই। স্বামীটি এখানে নিরন্ধ্র স্বার্থপরতা থেকে কেবল মাত্র কেরিয়ারের কথা ভাবছে কিন্তু স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সম্ভোগে দেখে তার যে কোনরকম তৃপ্তি হবে সে ইঙ্গিত কোথাও নেই। যদিও স্বামীটির স্বার্থপর শৈত্যের মধ্যে যেন ঘুমিয়ে আছে নিখিলেশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'দেবী' ছবির স্বামী উমাপদর (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) কথা। উমাপদর সঙ্গে তার স্ত্রী দয়াময়ীর (শর্মিলা ঠাকুর) সম্পর্কের ওপর ভয়ঙ্কর ছায়া ফেলে দাঁড়ায় উমাপদর বাবা কালীকিঙ্কর (ছবি বিশ্বাস)। কালীকিঙ্করের চোখে তার বৌমার রূপান্তর ঘটে—সে হয়ে ওঠে দেবী। কালীকিঙ্কর তার আরাধনা করে। এবং স্বামীর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক থেকে 'দেবী' ছিন্ন হয়ে যায়। লড়াই শুরু হয় 'ডিভিনিটি' এবং 'সেক্সুয়ালিটি'র মধ্যে।

উমাপদর মধ্যে এমন জোর নেই যে সে তার স্ত্রীকে দেবীর আসন থেকে নামিয়ে আনতে পারবে। সে চেষ্টা সে করে নি তা নয়, কিন্তু কালীকিঙ্করের দাপট এবং তার আকর্ষণের অমোঘতা প্রায় গ্রীক ট্র্যাজেডিতে ভাগ্য এবং অলৌকিকের মত। কালীকিঙ্কর যে প্রবল ক্ষমতায় দয়াময়ীকে দেবীত্বের ডিলিউশনের মধ্যে নিয়ে যায় এবং আটকে রাখে, তার মধ্যে তার নিজের দমিত, বিকৃত বাসনা যে কাজ করছে এ-কথা প্রায় অনস্বীকার্য। উমাপদর সঙ্গে দয়াময়ীর দেহজ সম্পর্কের টান এতই স্তিমিত যে কালীকিঙ্করের পৌরুষ ও প্রতাপের সামনে তা দাঁড়াতে পারে না।

দয়াময়ী যে দেবীত্বের ডিলিউশনকে আঁকড়ে ধরে শেষ পর্যন্ত মতিচ্ছন্ন হয়ে যায় তার পিছনে রয়েছে নিজের দমিত কিংবা প্রচ্ছন্ন মনের তাড়না। উমাপদ তাকে একেবারে মুক্তির কিনার পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। সে কালীকিঙ্করের 'ফাঁদ' থেকে স্বামীর সঙ্গে পালাতেই পারত। কিন্তু উমাপদর মধ্যে সেই পৌরুষ, সেই প্রতাপ, সেই ভাবাবেগ বা সেক্সুয়ালিটি কোথায় যে দয়াময়ীকে সে আটকে রাখবে? দয়াময়ী স্ব-ইচ্ছায়, এক ধরনের প্রচ্ছন্ন তাড়না এবং ভয় থেকেই ফিরে যায় কালীকিঙ্করের কাছে। উমাপদর সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের শীতল রিয়েলিটির তুলনায় তার কাছে কালীকিঙ্করের সংস্পর্শে দেবীত্বের ডিলিউশন বা বিভ্রান্তি অনেক শ্রেয়। 'দেবী' আমার কাছে অন্তত ধর্মের আচ্ছাদন টেনে ইনসেস্ট বা অবৈধ সম্পর্কের এক অতুলনীয় 'বিশ্লেষণ'।

আমি আগেই 'ঘরে-বাইরে'তে 'চারুলতা'র শৈলীগত প্রতিধ্বনির কথা উল্লেখ করেছি। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে সেটি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। এইসব প্রতিধ্বনি বা ক্রসরেফারেন্সের মধ্যে রয়েছে সত্যজিতের সযত্ন সচেতনতা। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই এই প্রতিধ্বনিগুলি এনেছেন 'ঘরে-বাইরে'র তিক্ততা এবং আয়রনিকে আরও প্রকট করে তুলতে, 'ঘরে-বাইরে' ও 'চারুলতা' এই দুটি ছবির বাতায়নকে আরও স্পষ্ট রেখায় ভাগ করে দিতে। 'চারুলতা'র মত 'ঘরে-বাইরে'তেও রয়েছে একাধিক বারান্দা-দৃশ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'পিকু' ছবিতে বারান্দার ব্যবহার। কিন্তু চারু যে দৃশ্যে অপেরা গ্লাস হাতে বারান্দা দিয়ে হেঁটে যায়, সেই দৃশ্যের দ্রুতি প্রতিতুলনীয় নিখিলেশ যে দৃশ্যে বারান্দা দিয়ে বিমলাকে নিয়ে বারমহলে আসে তার শ্লথতার সঙ্গে। এই স্লো-মোশনের

মধ্যে যে স্যাটায়ার এবং ভাগ্যের অমোঘতা প্রতিভাত হয় তা যেন আরও জোর পায় 'চারুলতা'র বারান্দা দৃশ্যগুলির প্রেক্ষিতে। আমার নিজের মনে হয় নিখিলেশের সঙ্গে বিমলার বারান্দা অতিক্রমণের ধীরগতি দৃশ্যটি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে একই সঙ্গে সিনেম্যাটিক এবং প্রতীকী সময়কে। প্রতীকী সময় বলতে আমি বুঝছি বিমলার পক্ষে বাইরে বেরিয়ে আসার বিপুল এবং দীর্ঘ যাত্রাটির কথা, যে যাত্রার সীমা এবং পরিধি একটি বারান্দার দ্বারা নির্দিষ্ট বা চিহ্নিত হতে পারে। নিখিলেশকে যে দৃশ্যে বিমলা রাত্তিরবেলা বসে খাওয়াচ্ছে তা যেন একেবারে 'চারুলতা' ছবিতে ভূপতি-চারুর মধ্যে ঠিক ঐ-রকম একটি দৃশ্যের উল্টোপিঠ।

কিন্তু চারু-ভূপতির স্পর্শময় সংলাপের জাত ততটাই ভিন্ন যতখানি তফাত নিখিলেশ এবং ভূপতির খাওয়ার মধ্যে। খাওয়ার দৃশ্যের এই অবিকল প্রতিধ্বনির মধ্যেও আমি লক্ষ করি শ্লেষের তির্যক উন্মোচন। আর একটি দৃশ্যে যেখানে বিমলা খাটের কোণে বসে ছুঁচের কাজ করছে, আমি সেখানে 'চারুলতা'র সেই অসামান্য প্রাথমিক দৃশ্যটি না ভেবে পারি না যেখানে চারু খাটের কোণে বসে ভূপতি নামের গোড়ার অক্ষরটি ছুঁচের ডগায় তুলছে। চারুর আঙুলের শ্লথ গতি এবং বিশ্রান্ত ভঙ্গির সঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ডে 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' গানটির ছান্দিক চাটুল্য। 'ঘরে-বাইরে'তে সেলাই দৃশ্যটি আপাতভাবে অবিকল কপি, কিন্তু সত্যজিৎ ইচ্ছে করেই ব্যাকগ্রাউন্ডে কিংবা বিমলার ভঙ্গি কিংবা ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণে কোনও রোম্যান্টিকতার আশ্রয় নেন নি। নেন নি তার কারণ, আরও একবার দৃশ্যের আয়রনিকে প্রতিভাত করা। এই ছুঁচের কাজ বিমলা কার জন্যে করছে তা স্পষ্ট নয়, চারুলতায় যেমন তা স্পষ্ট। সম্ভবত সে একটি টেবিলের ঢাকনা তৈরি করছে যার মধ্যে আমরা কোনভাবেই কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ইঙ্গিত দেখতে পাই না। এই দৃশ্যের গুরুত্বটা অন্য জায়গায়—খাটের ওপরে, সেলাইয়ের পাশে আমরা দেখতে পাই বিমলাকে দেওয়া সন্দীপের বইটি। এবং এর পরেই বিমলার কাছে সন্দীপের ডাক আসে। সারা ছবিতে বিমলা এমন কিছুই করে না যে-কাজের মধ্যে নিখিলেশ-বিমলার হার্দ্য সম্পর্ক প্রতিভাত হতে পারে। শুধু এক জায়গায় তারা ইংরেজী গান (Won't you buy me pretty flowers?) এক সঙ্গে গায় এবং নিখিলেশ ছবির একদম প্রথম দিকে একটি ইংরেজী কবিতা বিমলাকে পড়ে শোনায়, যার অর্থ বিমলা বোঝে না। কিন্তু সারা ছবিতে বিমলার দিক থেকে এমন কিছুই করা হয় নি বা ঘটেনি, যেখান থেকে আমরা নিখিলেশের প্রতি তার আকর্ষণের একটা ইঙ্গিত পেতে পারি। এমনকি সে নিখিলেশের শেষ চুম্বনটি গ্রহণ করে মাত্র, তাকে উত্তরে কিছু উষ্ণতাও ফিরিয়ে দেয় না। বিমলা যে-দৃশ্যে নিখিলেশের বুকে মাথা দিয়ে বলে, সে সন্দীপের সঙ্গে ঘটনাটি ভুলতে চায়, সেখানে তার মনে এবং অভিব্যক্তিতে আর যাই থাক নিখিলেশের প্রতি কোনরকম প্যাশন নেই। এই দৃশ্যের পাশাপাশি আমরা যদি 'চারুলতা'র সেই দৃশ্যটি রাখি, যেখানে চারু অমলের বুকে মাথা রেখে কাঁদে, তাহলেই বোঝা যাবে নিখিলেশ-বিমলার মধ্যে অনুরূপ দৃশ্যটি শৈত্যে কত নির্মম।

।। ১১ ।।

আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবনী লেখার রেওয়াজ নেই। সাহস নেই বললে সত্যের আরও কাছাকাছি আসা হয়। যে-কোনও মানুষ সম্পর্কে লিখতে হলে আমরা সাল-তারিখ দিয়ে জীবনের একেবারে ওপরের খোলসটা চিহ্নিত করি মাত্র। অন্তর্মুখী বিশ্লেষণে আমাদের বড় ভয়, বড় দ্বিধা। সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'র অনির্বচনীয় আকর্ষণের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আমাদের পক্ষে ততদিন সম্ভব হবে না যতদিন না সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে আমরা মাধবীকে বিশ্লেষণ করতে পারব ; যেমনভাবে বিশ্লেষিত হয়েছেন বার্গমানের ছবিতে লিভ উলমান, রিলকের কবিতায় লু, দা ভিঞ্চির ছবিতে তাঁর সৎমা। চ্যাপলিনের পুত্র যে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে পিতার জীবনী

লেখেন তাও কি সম্ভব এদেশে? সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই, বিশেষ করে বাংলা ভাষায়, নির্দিষ্ট ফরমুলার বাইরে পা ফেলাটা প্রায় স্যাক্রিলেজের পর্যায়ে চলে গেছে। এমনকি তাঁর ওপর বর্ষিত প্রশংসার মধ্যেও কোনও বিশ্লেষণী চমক থাকে না, থাকে না নব উদ্ঘাটনের তাগিদ। সেখানেও যেন নির্দিষ্ট ফরমুলার শাসন সাঁড়াশির মত চেপে ধরে প্রশস্তির কন্ঠস্বর, মনে হয় পুরো ব্যাপারটা প্রাণহীন মন্ত্র উচ্চারণ। এই 'রিচুয়ালের' অন্তঃসারশূন্যতায় যদি কেউ সবচেয়ে বেশি কষ্ট পান তাহলে তিনি যে সত্যজিৎ রায় নিজেই, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তা যদি না হত তাহলে শেক্সপীয়র সম্পর্কে ব্রাউনিং যে কথা বলেছেন, আমরাও সত্যজিৎ সম্পর্কে সে-কথা বলতে পারতাম : দ্য লেসার সত্যজিৎ হি।

সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে 'মা' : এ বিষয়টি নিয়ে বলাই বাহুল্য আজ পর্যন্ত কোনও উন্মোচনী আলোচনা হয় নি। হয়নি তার মূল কারণ সত্যজিৎ রায়ের কোনও বৈজ্ঞানিক জীবনী লেখা হয় নি যেখানে তাঁর নিজের মার সঙ্গে সম্পর্কের সব নিবিড় পরতগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। সত্যজিতের ছবিতে 'মা' এই বিষয়টির সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছে এত তাৎপর্যময় এবং বিস্তৃত এর বিচরণক্ষেত্র যে এর সবটুকুকে উন্মোচন করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। এর জন্যে যে বিশ্লেষণ, গবেষণা এবং সন্ধানী পরিশ্রমের প্রয়োজন তার কিছুটা ইঙ্গিতও যদি এই প্রবন্ধে আভাসিত হয় তাহলেই প্রথম পদক্ষেপটি সার্থক। সত্যজিৎ রায় তাঁর বাবাকে হারিয়েছিলেন এত কম বয়সে যে বাবার কোনও স্মৃতি তাঁর মনে আছে বলে মনে হয় না। স্বভাবতই মার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মধ্যে বাবার অভাব পূরণের বীজটি ক্রমশই যে অংকুরিত হয়ে উঠেছিল তাতে আমার সন্দেহ নেই। সত্যজিৎ রায়ের মা সুপ্রভা দেবীর একটি মাত্র ছবি আমি দেখেছি। শুভ্র-বসনা তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন বারো বছরের ছেলে সত্যজিৎ রায়ের পাশে। সত্যজিৎ চেয়ারে বসে। মুখটি ক্যামেরার দিক থেকে একটু ঘোরানো। সুপ্রভা দেবীর মুখে কোমলতা, দৃঢ়তা ও বিষণ্ণতার আশ্চর্য সমন্বয়। আমার মনে হয় না আর কোনও বাঙালী মেয়ের মুখে আমি ঠিক এমনটি দেখেছি। আমি একথা বলতেও পিছিয়ে যাব না যে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিতে সত্যজিৎ বৈধব্যের যে শ্লেষময় ব্যাখ্যা করেছেন তার পেছনেও কাজ করছে তাঁর নিজের বিধবা মার প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা। অবচেতন মনে মায়ের প্রতি নিরঙ্কুশ টান ছিল বলেই 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র বিধবা মেয়েটিকে তিনি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন নি, বৈধব্যের পবিত্রতার যে-চূড়ান্ত নিরিখ তাঁর মার মধ্যে সত্যজিৎ পেয়েছেন তার কঠোর প্রেক্ষিতে আর একটি বিধবা মেয়েকে বিশ্বাস করতে তাঁর যেন কষ্ট হয়েছে। আবার বিমলাকে বিধবা করার পেছনেও সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছন্ন চেতনায় কাজ করেছে নিজের মার প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। বৈধব্যের পবিত্রতার মধ্যে যে সব অন্যায় ও পাপের নিরসন হতে পারে, ঘটতে পারে প্রার্থিত ক্যাথারসিস বা শান্তায়ন, এই বিশ্বাসের প্রেরণা কিন্তু বৈধব্যের সেই ভাবমূর্তি যা সত্যজিৎ নিজের মায়ের মধ্যে ছেলেবেলা থেকে দেখেছিলেন। 'অপরাজিত' ছবির অপুর সঙ্গে তার বিধবা মায়ের সম্পর্কের মধ্যে সত্যজিতের সংগে তাঁর নিজের মায়ের সম্পর্কের সূক্ষ্ম প্রতিধ্বনি প্রায় ততদূরই শুনতে পাওয়া সম্ভব যতদূর আমরা লরেন্স-এর সংগে তাঁর মায়ের সম্পর্ক প্রতিধ্বনিত হতে শুনি 'সানস্ অ্যান্ড লাভারস্' উপন্যাসে, কিংবা যতদূর চ্যাপলিনের সঙ্গে তাঁর মায়ের গভীর হার্দ্য সম্পর্ক ছায়া ফেলে তাঁর ছবির নারী চরিত্র-গুলির মধ্যে। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে প্রেমিকাদের মধ্যেও কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে মাতৃহৃদয়ের করুণা, স্নেহ, অভিমান এবং প্রশ্রয়। দা ভিঞ্চির 'মেরী' এমনকি 'মোনালিসা' ছবিতেও যেমন পিছন থেকে ছায়া ফেলে দাঁড়ায় মা, ঠিক তেমনি ভাবে। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি থেকে যেমন আমরা মুছে দিতে পারি না তাঁর বৌঠানের মুখ ও চোখের উদ্ভাস, তেমনি সত্যজিতের নারী চরিত্রগুলিকে আমরা মাতৃত্বের প্রচ্ছন্ন নিয়ন্ত্রণ থেকে উপড়ে নিতে পারি না। 'চারুলতা'র নায়িকা অমলকে যেভাবে ভালবাসে তারমধ্যে প্রেমের সঙ্গে মাতৃত্বের জড়িয়ে যাওয়াকে অস্বীকার করবে কে? প্রেমিকা বা স্ত্রীর মধ্যে মার স্নেহ-ভালবাসার আস্বাদ পাওয়া হয়ত নতুন কিছু নয়,

কিন্তু সত্যজিৎ রায় যে অনায়াস, সাবলীল ভঙ্গিতে রোমান্টিক প্রেমের সূক্ষ্ম রণনের মধ্যে মাতৃত্বের উদ্ভাস নিয়ে আসেন তা বিস্ময়কর। 'সীমাবদ্ধ'র শ্যামলেন্দু, 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র সিদ্ধার্থ এবং 'জন-অরণ্য'র সোমনাথ—প্রত্যেকেই যেন পালাতে চায় বাস্তবের কঠোর চাপ থেকে, এবং যে অমোঘ অথচ প্রচ্ছন্ন টান তাদের এই পালাবার ভঙ্গিটিকে করে তোলে অন্তর্মুখী তাকে শেষপর্যন্ত আমরা বলতে পারি মাতৃ, আশ্রয়ের, এমনকি মাতৃগহ্বরের টান। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র শেষ দৃশ্যে একদিকে মৃত্যুর ধ্বনি, অন্যদিকে পাখির ডাক—এই বৈপরীত্যের মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যক্তিগত আশ্রয়ের চিহ্ন রয়ে গেছে। সিদ্ধার্থ তার প্রেমিকের কাছ থেকেও পালিয়ে আসে এই অস্পষ্ট আশ্রয়ের মধ্যে। ঠিক যেভাবে 'সানস অ্যান্ড লাভারস' উপন্যাসের শেষে নায়ক পালিয়ে যায় নারীর মোহময় আকর্ষণ থেকে আত্মস্মৃতির রহস্যময়তায়। 'সীমাবদ্ধ' ছবির শ্যামলেন্দুর অন্তর্মুখিনতা, তার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা ও অসহায়তা, তার অন্যায়বোধ—সবকিছুর চাপ তাকে ক্রমশ তৃষ্ণার্ত করে তোলে মাতৃ-প্রশ্রয়ের জন্যে। এবং আশ্চর্যভাবে শ্যামলেন্দু তা পায় তার শালীর মধ্যে। 'জন অরণ্য' ছবিতে সোমনাথ যে তার প্রেমিকাকে অত সহজে ঝেড়ে ফেলতে পারে তার কারণ তার সঙ্গে এই প্রেমিকার সম্পর্কে কোনও 'নাড়ির টান' গড়ে ওঠে না। মা ও ছেলের নাড়ির টান যে কত সূক্ষ্ম অনুরণনে বিস্তৃত ও রহস্যময় হয়ে উঠতে পারে তার চূড়ান্ত উদাহরণ আমরা পাচ্ছি সর্বজয়া এবং অপুর সম্পর্কের ক্রমিক বিবর্তনে। সত্যজিতের ছবির প্রেমিকরা যেমন প্রেমিকা-দের মধ্যে সন্ধানী হয় মাতৃস্নেহের, তেমনি অপু এবং তার মা সর্বজয়ার সম্পর্কেও ধ্বনিত হয়ে ওঠে প্রেমের প্রচ্ছন্ন উচ্চারণ, মান, অভিমান, স্পর্শময়তা। মার প্রতি সন্তানের টান এবং মার কাছে সন্তানের ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে—এই বিস্তৃত এবং গভীর বিষয়ের ক্ষেত্রটিকে সত্যজিৎ একের পর এক ছবিতে যে-ভাবে উন্মোচন করেছেন তাতে একই সঙ্গে লীন হয়ে আছে প্রেমের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার তাগিদ ও মাতৃগহ্বরের এবং প্রাক্‌জন্ম স্মৃতির প্রচ্ছন্ন টানে সন্তানের অন্তর্মুখিনতা। আমি একথা বলতেও দ্বিধা করব না যে 'অপরাজিত'র অপু এবং তার বিধবা মা সর্বজয়ার সম্পর্কের সূত্র ধরে সত্যজিৎ এমন এক গহন রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করেন যেখানে প্রেম এবং বাৎসল্যের সীমারেখা প্রায় মুছে যায়।

।। ১২ ।।

মার সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক একাধিক জটিল পরতে বিস্তৃত। এবং সবটুকুকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলা শক্ত। মা-ছেলের সম্পর্কে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের এত বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে যে, তার সবটুকুকে ধরা কিংবা ফুটিয়ে তোলা, বিশেষ করে চলচ্চিত্রে, একেবারেই সহজ নয়। শিশুর সঙ্গে মার সম্পর্ক সূচিত হয় শিশুর ঘ্রাণ এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। মার গা ছুঁয়ে, মার গায়ের গন্ধ পেয়ে সে বুঝতে পারে মা তার কাছে আছে। এর অনেক পরে শিশু চোখ দিয়ে দেখে মাকে আলাদা করে চিনতে পারে। মার দুধ শুধু শিশুর খিদেই মেটায় না, মাতৃস্তন্য শিশুর মনের তৃপ্তির জন্যেও প্রয়োজনীয়। শিশু বড় হয়ে ওঠার পাশাপাশি মার সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রও আরও বিস্তৃত এবং জটিল হয়ে উঠতে থাকে। সম্পর্কের মধ্যে ক্রমশ দেখা দেয় মানসিক আদান-প্রদানের, ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি ও মান-অভিমানের, শাসন ও বাৎসল্যের একটি বিস্তারিত ক্ষেত্র। বিশেষ করে পুত্র-সন্তানের সঙ্গে মার সম্পর্কের এবং কন্যা-সন্তানের সঙ্গে বাবার সম্পর্কের সম্ভাব্য ব্যঞ্জনাগুলি এতই জটিল এবং এতগুলি পরতে প্রসারিত যে তা নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' বা 'ইলেকট্রা কমপ্লেক্স'-এর চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত না পৌঁছেও ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাবা-মার সম্পর্ক এতগুলি জটিল শিকড়ের সূত্র ধরে গড়ে উঠতে পারে যে তার সবটুকুকে চিনে নেওয়া, চিহ্নিত করা আদৌ সহজ নয়। এই সম্পর্কের অনেকটাই থেকে যায় আমাদের মনের

প্রচ্ছন্ন গহনে। অথচ, আমাদের বহির্জীবনের ওপর এই সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অপরিসীম। ছোট করে বলতে গেলে আমরা চালিত হই এই গহন প্রচ্ছন্ন সম্পর্কের বিস্তারিত প্রভাবের দ্বারা।

অপুর সঙ্গে সর্বজয়ার সম্পর্কের বিস্তৃত ব্যঞ্জনাময় ক্ষেত্রটিকে একেবারে সূচনার মুহূর্ত থেকে সত্যজিৎ রায় আমাদের সামনে উন্মোচিত করেন। যে-মুহূর্তে থেকে চোখ দিয়ে নয়, ঘ্রাণ, স্পর্শ এবং জিহ্বা দিয়ে শিশু মাকে চিনে নেয়, শুষে নেয় এবং কাছে পায়, সেই মুহূর্ত থেকে আমরা অপু এবং সর্বজয়াকে পাই 'পথের পাঁচালী' ছবিতে। অপু জন্মাবার আগে সর্বজয়াকে আমরা দুর্গার মা হিসেবে দেখেছি 'পথের পাঁচালী'র প্রথম সিকোয়েন্সে যেখানে দুর্গাকে ফল চুরির জন্যে শাসন করছেন তিনি ইন্দির এবং সেজ বৌয়ের ওপর অভিমান এবং রাগ থেকে। মেয়ের প্রতি প্রচ্ছন্ন টান, মেয়ের ওপর ইন্দিরের প্রভাব যে ভাল হচ্ছে না—সে বিষয়ে বিরক্তি, অথচ কিছু না করতে পারার জন্য নিজের ওপর রাগ এবং ফল চুরির ব্যাপারটা নিয়ে সেজবৌ যেভাবে খোঁটা দিল তা থেকে অপমান এবং অভিমান—এই সবকিছুকে এত সহজে ধরেছেন সত্যজিৎ যে মনেই হয় না তিনি মা-মেয়ের মধ্যে সংক্ষিপ্ত একটি দৃশ্যের সূত্র ধরে এতগুলি পরত ছুঁয়ে গেলেন।

'পথের পাঁচালী'র প্রথম সিকোয়েন্সে দুর্গার সঙ্গে সর্বজয়ার বাৎসল্য ও শাসনের সম্পর্কের যন্ত্রণা থেকে সত্যজিৎ সরাসরি চলে যান সর্বজয়ার প্রসব-যন্ত্রণায়, অপুর জন্মলগ্নে। সন্তানের জন্মের সংগে মার যে যন্ত্রণা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে তাই যেন 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত'তে অপু এবং সর্বজয়ার মধ্যে মান-অভিমান, মন-কেমন, আর ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণার মধ্যে বিস্তৃত হয়। অর্থাৎ আঁতুড় ঘরে সর্বজয়ার কষ্ট পাওয়ার দৃশ্যটি প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। সর্বজয়া যে-দৃশ্যে কাঁথা সরিয়ে অপুকে দেখায়, সেখানে শুধু ইন্দিরই যে অপুকে প্রথম দেখছে তা নয়, প্রেক্ষাগৃহের সবাই মা আর ছেলেকে একসঙ্গে এই প্রথম দেখে। সর্বজয়ার মধ্যে ছেলেকে নিয়ে কোনও আদিখ্যেতা নেই, কোনও ভাবাবেগ নেই। সত্যজিৎ যেভাবে এই দৃশ্যে মাতৃত্বের 'সুরম্য' কাঠিন্যকে ফুটিয়ে তোলেন তাতে আমার অন্তত মনে পড়ে যায় ছবিতে দেখা তাঁর নিজের মায়ের মুখ, আশ্চর্য স্নেহময়, আশ্চর্য কঠিন। অপুর জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে অপুর সান্নিধ্য থেকে দূরে মৃত্যুদৃশ্য পর্যন্ত সর্বজয়া যেন সমস্ত দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশা আর অভিমান জয় করে মাতৃত্বের প্রতীকের মত। অপুকে নিয়ে সর্বজয়ার প্রথম স্বপ্ন সে লেখাপড়া শিখবে। হরিহরকে সর্বজয়া বলে, 'খোকাকে লেখাপড়া শেখাবে, পৈতে দেবে, পুজো-আচ্চার কাজ শেখাবে।' সন্তানকে নিয়ে মা-বাবার স্বপ্নের মধ্যে কেমন করে সুপ্ত থাকে ট্র্যাজিক আয়রনি, ঘাপটি মেরে থাকে যন্ত্রণা আর ধ্বংসের বীজ তাই ক্রমশ বিস্তারিত হয় 'পথের পাঁচালী'তে সর্বজয়ার এই প্রাথমিক স্বপ্ন থেকে 'অপরাজিত'তে তার মৃত্যু পর্যন্ত। এই লেখাপড়ার সূত্র ধরেই অপু সর্বজয়ার কাছ থেকে দূরে চলে যায়। এবং সন্তানের কাছ থেকে এই দূরত্বকে, এই অবহেলাকে সর্বজয়া গভীর অভিমানের সঙ্গে মেনে নেন। সর্বজয়ার এই অভিমানী মেনে নেওয়া, যন্ত্রণা পাওয়ার মধ্যে আত্মপীড়নের যে-ঝোঁকটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা যেন বাৎসল্যের সীমা অতিক্রম করে প্রেমের মাত্রা ছুঁয়ে যায়। 'অপরাজিত'র মা অভিমানী আত্ম-নির্যাতনে প্রায় প্রেমিকা। সর্বজয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী অপুর লেখাপড়া, তার বাইরের জগৎ। মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে প্রসবঘরের আলোয় অপুর যে-মুক্তি তার চারধারে কৈশোর পর্যন্ত গণ্ডি কেটে পাহারা দিচ্ছে সর্বজয়ার স্নেহ, ভালবাসা, রক্তের টানে গড়ে ওঠা মাতৃত্বের ব্যূহ। লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে নতুন আদর্শে, মূল্যবোধে, ধ্যানধারণায় অপু নতুন করে জন্মায়, এবং স্বভাবতই বেরিয়ে যেতে চায় এই বন্দী অবস্থা থেকে। অথচ, অপুর ভিতরে একই সঙ্গে কাজ করে মার কাছে ফিরে যাবার প্রচ্ছন্ন টান। যে-দৃশ্যে সে কলকাতার ট্রেন না ধরে মার কাছে ফিরে আসে সেই দৃশ্যটি মিতভাষী অথচ গভীর ইঙ্গিতে দূরাভিসারী। অপুকে অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে পেয়ে সর্বজয়া শুধু বলে, 'অপু'! এর কিছুক্ষণ পরে অপু গায়ের জামা খুলে দাওয়াতে শুয়ে পড়ে। সর্বজয়া অপুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন, 'খিদে পেয়েছে? কিছু খাবি এখন?' 'অপরাজিত'র এই দৃশ্য আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় 'পথের পাঁচালী'র সেই দৃশ্যটির

কথা যেখানে সর্বজয়া অপুকে খাওয়াচ্ছেন কিংবা যেখানে সর্বজয়া দুর্গাকে চিনি আনতে দেন অপুর জন্যে, অত অভাবের মধ্যেও পায়েস রাঁধবেন বলে। এইসব ছোটছোট দৃশ্যগুলি মা ও ছেলের সম্পর্কের সূত্র ধরে আমাদের মনে মীড়ের মত কাজ করে।

সর্বজয়া ও অপুর সম্পর্ককে কোথাও অযথা ভাবাবেগের চড়াসুরে বাঁধেন নি সত্যজিৎ। এই সম্পর্কের সূক্ষ্ম রণন, বিস্তৃত ব্যঞ্জনাকে যেভাবে যে ভঙ্গিতে তিনি তুলে ধরেন তার ওপর কাজ করছে সযত্ন নিয়ন্ত্রণ। যা বলা হল স্পষ্টভাবে, কিংবা যা ফুটিয়ে তোলা হল আভাসে, তার চেয়ে গভীর অর্থ গর্ভময় আড়ালে ঢেকে রাখা হল, যাতে এই সম্পর্কের সম্ভাব্য বিস্তৃতির রহস্য উন্মোচনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে না পড়ে। অপুর জন্মলগ্ন থেকে সত্যজিতের ছবিতে এই সম্পর্কের সূত্রপাত। 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত' ছবি দুটি একসঙ্গে দেখলে আমরা বুঝতে পারি অপু এবং সর্বজয়ার মধ্যে সরাসরি দৃশ্যের সংখ্যা কত কম, অথচ এই সীমিত পরিসরেও সত্যজিৎ কত স্পর্শময় করে তুলেছেন মা-ছেলের সম্পর্ককে! 'পথের পাঁচালী'তে সর্বজয়ার স্নেহময় এবং অভিমানী শাসন 'অপরাজিত'তে রূপান্তরিত হচ্ছে নিঃসঙ্গ 'মন-কেমনে'। এই রূপান্তরের পথে সত্যজিতের ছবিতে কোথাও নেই ভাবাবেগের উদ্বেলতা, কিংবা মাতৃত্ব ও বাৎসল্যের একটি রোম্যান্টিক ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার চেষ্টা। সর্বজয়ার মনের অবস্থাটা যেভাবে সত্যজিৎ ফুটিয়ে তোলেন তার চেয়ে আপাতভাবে সহজ, সাবলীল আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু যেখানে তিনি শুধু মাত্র ইঙ্গিতবাহী, সেখানে সবচেয়ে গভীর। এমনকি বলা যায়, সেখানে তিনি অতলস্পর্শের টানে ইচ্ছে করে ডুব-সাঁতারু। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। 'অপরাজিত'র শেষের দিকে অসুস্থ সর্বজয়া দাওয়ায় বসে। পাশে পড়ে আছে অপুর চিঠি। চিঠিতে লেখা, 'শ্রীচরণেষু মা, তোমার চিঠি পাইয়াছি। কলেজে গণেশ পুজার ছুটি থাকে না। তাছাড়া আগামী মাসে আমার পরীক্ষা। এই সময় কলিকাতায় না থাকিলে পড়াশুনার ক্ষতি হয়।'

বলাই বাহুল্য এ-চিঠি সর্বজয়ার চিঠির উত্তরে লেখা। সর্বজয়া তার চিঠিতে জানতে চেয়েছিলেন অপু তাকে নিয়মিত চিঠি লেখে না কেন। আর যদি গণেশ পুজোর ছুটি থাকে তাহলে অপু যেন একবার সর্বজয়ার কাছে এসে ঘুরে যায়। দু-মাস সর্বজয়া অপুকে দেখেননি। বড় দেখতে ইচ্ছে করে। সর্বজয়া ধরেই নিয়েছিলেন মার এ-চিঠি পেলে অপু আসবেই। নাড়ির টানকে অপু অস্বীকার করবে কি করে? আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে অপুর জন্মলগ্নে সর্বজয়ার সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ, তাঁর কপালের ঘাম। অপু আসবেই এ কথা যে সর্বজয়া ধরে নিচ্ছেন, সে বিষয়ে কিন্তু সত্যজিৎ ইচ্ছে করেই স্পষ্ট করে কিছু বলেন না, কারণ সেইটুকু ভাবাবেগকেও তিনি প্রশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক। সত্যজিতের ক্যামেরা শুধু এক বিষণ্ণ মন-কেমনের ভঙ্গিতে আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরে অসুস্থ সর্বজয়ার সামনে রোদ্দুরে টাটকা তৈরি আচার আর ডালের বড়ি। এসব সর্বজয়া তাঁর অসুস্থতা নিয়েও তৈরি করেছেন অপুর জন্যে, যে অপু মার চিঠি পেলে চলে আসবেই আসবে। যে-মমতা নিয়ে সর্বজয়া, একদিন অসহনীয় দারিদ্র্যের মধ্যেও বালক অপুর জন্যে পায়েস রেঁধেছিলেন শুধুমাত্র সেই মমতা, সেই বাৎসল্যই যে প্রতিফলিত হচ্ছে আচার আর ডালের বড়ির মধ্যে তাই নয়, রোদ্দুরে দেওয়া এইসব খাবারের মধ্যে স্পষ্ট ইঙ্গিতে ধরা দেয় অপুর কাছে সর্বজয়ার শেষ দাবি। অপুর চিঠি সন্তানের ওপর মার দখলকে যেন এক ঘায়ে চুরমার করে দিল। এর কিছুক্ষণ পরে যখন তেলিগিন্নী সর্বজয়াকে বলছে, 'হীরের টুকরো ছেলে আপনার, এবারে একটা বিয়ে দিন,' সর্বজয়া কোন উত্তর দিচ্ছেন না। এই দৃশ্যটি বিপুলভাবে ইঙ্গিতবাহী। অসুস্থ সর্বজয়ার মধ্যে সন্তানের প্রতি পজেসিভনেস বা অধিকার চেতনা এখন প্রবলভাবে কাজ করছে। ছেলের বিয়ে দিয়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে অপুকে ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাবে সর্বজয়ার নীরবতা বিস্ফোরণের মত। এর কিছুক্ষণ পরে নিরুপমা যখন সর্বজয়াকে বলেন, মার অসুস্থতার কথা জানিয়ে অপুকে আর একখানা চিঠি দিলে অপু আসবেই, সর্বজয়া বলেন, 'না-না-না, সে যদি আসে তবে নিজেই আসবে। পড়াশুনা আছে,

সামনে পরীক্ষা না আসলেই ভাল। তুই চিঠি দিবি না কিন্তু। দিবি নি, বল, কথা দে।' পুত্রের প্রতি যে তীব্র অভিমান এবং সন্তানের ওপর যে গভীর অধিকার চেতনা থেকে সর্বজয়া কথাগুলি বলেন তার মধ্যে অস্বীকৃত প্রেমের একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত যেন রয়ে গেছে, এ কথা বলতেও দ্বিধা করব না আমি। এরপরেই আমরা সর্বজয়াকে দেখছি তার মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে। একটি গাছের ছায়ায় বসে আছেন অসুস্থ সর্বজয়া। অপেক্ষা করছেন অপুর জন্যে। ক্রমশ অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। মাদুরটা নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে যান তিনি। দাওয়ার পাশে বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়ান, যেন শুনতে পান অপু ডাকছে—মা! এই ভুল শোনাটুকু উঠে আসে সর্বজয়ার আচ্ছন্ন অবচেতনা থেকে যার সবটুকু মৃত্যুর মুহূর্তে দখল করে আছে অপু। অন্ধকার আরও ঘন হয়। শুধু টুকরো টুকরো জোনাকির আলো ছড়িয়ে থাকে অন্ধকারে। অবিস্মরণীয় এই দৃশ্য। অন্ধকারে জোনাকির আলো যেমন মায়াময় এবং অলীক, ঠিক তেমনি অলীক এবং মায়াময় সন্তানের ওপর মার অধিকার চেতনা। গর্ভের অন্ধকার এবং জলের মধ্যে মা এবং ছেলের সম্পর্ক যেভাবে সূচিত হয় তার সূত্র ধরে ছেলের প্রতি মার অধিকার-চেতনা সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই অধিকার-চেতনা থেকেই গড়ে ওঠা দাবি আলেয়ার পিছনে ছুটে যাওয়ার যন্ত্রণাকেই মাতৃত্বের অপরিহার্য অঙ্গ করে তোলে শেষ পর্যন্ত। 'অপরাজিত'র শেষ দৃশ্যে অপু গ্রাম থেকে চলে যায়, ভবতারণকে সে বলে যায় মার শ্রাদ্ধ সে কলকাতায় করবে, কালীঘাটে। মার শ্রাদ্ধ সে শেষ পর্যন্ত কালীঘাটে করে কিনা আমরা জানি না। শ্রাদ্ধ করার সংগে সংগে মার সংগে তার সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে, এই ভয় থেকে অপু হয়ত কোনদিনই মার শ্রাদ্ধ করে নি। মার সংগে নাড়ির বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবার পরেও অপু এইবার বুঝতে পারে রক্তের সম্পর্ক অন্তর্লীন হয়ে ছিল তার চেতনায়। পুকুরধারে মাথা গুঁজে অপুর কান্নার মধ্যে তার এই আকস্মিক উপলব্ধির ইঙ্গিত রয়েছে অব্যর্থ-ভাবে। সে ভিতরে-ভিতরে হয়ত ফিরে যেতে চায় তার বাল্যকালে, মার ভালবাসার আর স্নেহের ব্যূহর মধ্যে। আবার একই সঙ্গে সে কান্নাভেজা চোখে দেখে পুকুরের জলের মধ্যে কালপুরুষের ছায়া। অপুর স্মৃতি যে এই মুহূর্তে বাল্যকালমুখী সেটা বোঝা যায় অপুর কণ্ঠে 'কালপুরুষ' শব্দটির উচ্চারণ থেকে। ছেলেবেলায় মাস্টারমশাইয়ের কাছে অপু রাতের নক্ষত্রমেলা থেকে কাল-পুরুষকে আলাদা করে চিনতে শিখেছিল। আবার পুকুরের মধ্যে কালপুরুষের ছায়াকে আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে বাল্যকাল আর মার স্মৃতিমুখী চেতনাকে ভেঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার তাগিদ। যে-ছেলে কালপুরুষের ছায়া দেখেছে, সে আর ঘরে থাকে না, সংসারের বন্ধনের মধ্যে ধরা দেয় না, এই প্রাচীন বিশ্বাসের প্রেক্ষিতেই যেন অপুর মুখে 'কালপুরুষ' শব্দটি ধ্বনিত হয়ে ওঠে অমোঘ এক ভবিষ্যৎ বার্তা নিয়ে। 'অপুর সংসার'-এর ট্র্যাজেডির ইঙ্গিত যেন এই শব্দটির মধ্যে বীজের মত সুপ্ত রয়েছে। অপু গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে যায় এবং মায়ের মৃত্যুর পর তার এই চলে যাওয়ার ভঙ্গিতে ধরা পড়ে ছিন্নমূল মানুষের অভিমানী চ্যালেঞ্জের ভঙ্গি। দূরে আকাশে শোনা যায় মেঘের গর্জন। আমার মনে পড়ে 'সান্‌স অ্যান্ড লাভারস্‌'-এর শেষে আকাশের দৃশ্য, যেখানে অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে ছেলেটি শুনতে পায় তার মার ডাক। 'অপরাজিত'র শেষে আকাশে মেঘ, অন্ধকার আর জলের স্পর্শময় সমন্বয়ে কোথায় যেন রয়ে গেছে মাতৃগহ্বরের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত।

।।১৩।।

লেডি ম্যাকবেথ যদি সন্তানের জননী হতেন তা হলে......এই বিষয়টি নিয়েও শেক্সপীয়র-গবেষকদের মধ্যে তর্ক উঠেছে, লেখা হয়েছে সারগর্ভ প্রবন্ধ। শ্রীমতী ম্যাকবেথ যেখানে বলছেন, আনসেক্স মি হিয়ার, সেখানে তিনি তাঁর স্তনের ওপর হাত রাখবেন কি না, সে বিষয়েও আলোচনা চলতে পারে মহাপ্রলয় পর্যন্ত। 'আনসেক্স মি হিয়ার' বলে যদি লেডি ম্যাকবেথ তাঁর স্তনের ওপর হাত

রাখেন, তাহলে তাঁর মধ্যে মাতৃত্বের শেষ চিহ্নও যেন লোপাট হয়ে যায় সেই প্রার্থনা যে তীব্র হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই। বোঝা যাচ্ছে, ফ্রয়েড-এর অনেক আগে একটি মহিলার নিষ্ঠুরতা, মানসিক বিকৃতি এবং চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সঙ্গে মেয়েটির অবচেতনায় যৌন-তাড়নাকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন শেক্সপীয়র।

'ঘরে-বাইরে'র বিমলা কিংবা 'নষ্টনীড়ে'র চারুলতা যদি সন্তানের জননী......না, এই বিষয়টি নিয়ে এদেশে, আমি যতদূর জানি, এখনও কেউ লেখালেখি করেন নি। হয়ত সম্ভবও নয়। এই ধরনের ভাবনাচিন্তাকে পারভারশন কিংবা স্যাক্রিলেজ বলতে আমাদের মুখে বাধবে না এতটুকু। কিন্তু একথা বলতে এতটুকু দ্বিধা করব না যে চারুলতার এবং বিমলার 'বিপথচারিতা'র পিছনে এই দুই নারীর দমিত মাতৃত্বের অবদান কিছু কম নেই। চারুলতার যদি একটি সন্তান থাকত এবং তার ওপর চারুর ভালবাসা, বাৎসল্য উপচে পড়তে পারত তাহলে অমলের সঙ্গে তার সম্পর্কের ভারসাম্য অত সহজে অন্তত নষ্ট হত না। সন্তানকে ঘিরে চারুর এমন একটি জগৎ গড়ে উঠতে পারত, তার প্রাত্যহিক ব্যস্ততা এমন নিরন্ধ্র রূপ নিতে পারত যে চারুর জীবনে অমলের হয়ত কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকত না। এমন কি চারুর সাহিত্যচর্চাকেও আমি তার দমিত মাতৃত্বের শান্তায়ন বা সাবলিমেশন বলতে চাই। অন্যদিকে প্রশ্ন উঠতে পারে নিখিলেশের ঔরসে (অন্তত সত্যজিতের নিখিলেশের ঔরসে) বিমলার কোনও সন্তান আদৌ সম্ভব কিনা। 'ঘরে-বাইরে' চলচ্চিত্রে নিখিলেশ-বিমলার সম্পর্কে যে ইঙ্গিতটি অনস্বীকার্যভাবে এসেছে তাতে বিমলার সন্তান না থাকাই স্বাভাবিক। নিখিলেশ তার বন্ধু সন্দীপের ছবি আলাদা ফ্রেমে বাঁধিয়ে বিমলার ড্রেসিং টেবিলে রেখে দেয় এবং সচেতনভাবে বিমলাকে শেষ পর্যন্ত সন্দীপের হাতে তুলে দেয়, সন্দীপ যে 'লম্পট' একথা জেনেও। নিখিলেশের শৈত্যের পাশে সন্দীপের উষ্ণতা এত বেশি রগরগে যে এই দুটি চরিত্রের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিভূমি যে শরীরীভাবে সাড়া দেবার ক্ষমতা তাতে কোনও সন্দেহ থাকে না। নিখিলেশ বিমলার মাতৃত্বের সমস্ত সম্ভাবনা জুড়িয়ে দিয়ে তাকে সন্দীপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে দেখে যে কষ্টটা পাচ্ছে তাই কিন্তু তার দর্শকামুকতাকে তৃপ্তি দেয়, এবং তাকে জিইয়ে রাখে, যতক্ষণ না ছবির শেষে আত্মবিসর্জনের নাটকীয়তা তার পরাজিত 'ইগো'-কে প্রতিষ্ঠিত করছে। বিমলার সন্তান থাকলে নিখিলেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের ছাঁচটাই হত অন্যরকম। সেক্ষেত্রে সন্দীপের সঙ্গে নিখিলেশের মূল পার্থক্যের ভিত্তিভূমি যৌনশৈত্যের দ্বারা চিহ্নিত হত না। আমি এমন কথা বলছি না যে বিমলার মাতৃত্ব তার জীবনে সন্দীপের অনুপ্রবেশকে অসম্ভব বা অবাস্তব করে তুলত। কিন্তু সেখানে বিমলার প্রেমকে ছাপিয়ে উঠতে হত তার মাতৃত্বের দাবি। প্রেমকে প্রতিদ্বন্দ্বী হতে হত বাৎসল্যের। এই দ্বন্দ্বের পথ হত দীর্ঘ এবং জটিল। ছবিতে দমিত বাসনার দ্বারা তাড়িত বিমলা যত সহজে মেনে নিচ্ছে সন্দীপের বশ্যতা, তত সহজে আর সম্ভব হত না বিমলার 'নতি'। সন্দীপ-বিমলার চুম্বন দৃশ্যের আকস্মিকতাকে অস্বাভাবিক মনে হত যদি না আমরা আন্দাজ করতে পারতাম বিমলার চুম্বন-উপবাস দীর্ঘ দিনের, দীর্ঘদিন তার ড্রেসিং টেবিলে অন্য পুরুষের ফ্রেমে বাঁধানো উপস্থিতি তার সুপ্ত তাড়নাকে অস্পষ্ট ইন্ধন যুগিয়েছে। বিমলার দশ বছর বিয়ে হয়েছে এবং এই দশ বছরে তার ঠোঁটে সন্তানের চুমুও লাগে নি—এই ঘটনার ভয়াবহতা আমরা আভাসে বুঝতে পারি যদি ভাবি এই নির্মম উপবাস ও নিঃসঙ্গতার প্রেক্ষিতে রয়েছে নিখিলেশের শরীরী শৈত্য। সত্যজিৎ যে রবীন্দ্রনাথের মূল গল্প থেকে সরে এসে তাঁর ছবিতে ঘটনার প্রেক্ষিত হিসেবে বেছে নিয়েছেন শীতকালকে তার মূলে আছে এক ঠান্ডা যৌন-দহনকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা (আমার ভাবতে কষ্ট হচ্ছে যে শুধুমাত্র শালের একটি প্রদর্শনী সাজিয়ে তোলার জন্যেই তিনি শীত ঋতুকে বেছে নিয়েছেন)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উপন্যাসে সন্দীপ-বিমলার সম্পর্ক দানা বেঁধে উঠছে ঋতু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, দীর্ঘ সময় ধরে। সত্যজিৎ কিন্তু শীতকাল থেকে নড়েন না। তাঁর ছবিতে সময়ের প্রসার এতই কম যে মনে হয় সন্দীপের অনুপ্রবেশ এবং সন্দীপের চুম্বনের কাছে বিমলার বশ্যতা—এই দুই ঘটনার মধ্যে মাত্র কয়েক দিনের ফারাক। আমি

একথা বিশ্বাস করতে চাই না যে সত্যজিৎ রায় সময়ের প্রসারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। এই টেলিস্কোপিং তাঁর ইচ্ছাকৃত। সন্দীপ এল এবং জয় করল—এটা দেখানোই তাঁর অভিপ্রায়। নচেৎ বলতে হয় 'ঘরে-বাইরে'র চিত্রনাট্যে বাস্তববোধ পরাজিত। এই টেলিস্কোপিং-এর উদ্দেশ্য বিমলার সুপ্ত 'তৃষ্ণা'র তীব্রতাকে ফুটিয়ে তোলা। উপবাসী বিমলা সন্দীপকে প্রায় শীতবস্ত্রের মত মুহূর্তে জড়িয়ে ধরে নিখিলেশের সঙ্গে তার দশ বছরের বিয়ের হিমঘর থেকে বাঁচবার জন্যে। সন্দীপ-বিমলার সম্পর্কের সঞ্চরণভূমি যদি মাত্র তিন দিনও হয়ে থাকে তাতেও অস্বাভাবিকতা দেখব না এই ভেবে যে সুপ্ত তাড়নার দংশন বিমলা আর সহ্য করতে পারছিল না। সত্যজিতের টেলিস্কোপিং একমাত্র এই ব্যাখ্যার মধ্যেই অর্থময়তা খুঁজে পেতে পারে। একথা বলতেও পিছিয়ে যাব না যে দশ বছর ধরে নিখিলেশের সঙ্গে তার সম্পর্ককে মেনে নিতে সে লেডি ম্যাকবেথের মত মনে-মনে বলতে বাধ্য হয়েছে 'আনসেক্স মি হিয়ার'। সন্দীপের সংগে তাই দেখা হতেই বিমলার দমিত কামনা যেন মুহূর্তে তার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে।

'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী' ছবিতে পুরুষের যৌনশৈত্যের ইংগিতবাহী বিশ্লেষণে সত্যজিৎ সুদূরপ্রসারী। একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই শৈত্যের যন্ত্রণা এবং ট্র্যাজিক পরিণতিকে আবিষ্কার করেছেন তিনি 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী'র দুই চরিত্র মীর আর মীরজার মধ্যে কিন্তু, তাদের শৈত্য সত্ত্বেও, দর্শকামুকতা কাজ করছে না। একজন তার স্ত্রী (ফরিদা জালাল) অন্য পুরুষের সঙ্গে লিপ্ত শুনে সন্দীহান হয়ে উঠে বাড়ি চলে এসে স্ত্রীকে যখন অন্য পুরুষের সঙ্গে 'আবিষ্কার' করে, তখন সে ব্যাপারটার তাৎপর্য বুঝতে পারে না। তার এই নির্বোধ সারল্যের পিছনে যে বার্তাটি সত্যজিৎ ঘন করে তোলেন তা হল এই স্বামীটি (সঈদ জাফরি) তার অপারগতার সামনা-সামনি দাঁড়াতে চাইছে না, সে নির্বোধ সারল্যের আড়াল দিয়ে অন্য পুরুষ থেকে তার স্ত্রীর যৌন তৃপ্তিকে মেনে নিচ্ছে। এবং নিখিলেশ যেভাবে পরাজিত ইগো-র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় বেছে নেয় আত্মবিসর্জন, ঠিক তেমনি, 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী'র এই স্বামীটিও ছবির শেষে ইগোর তাড়নাতেই বন্ধুকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। বন্দুকটি এই দৃশ্যে, প্রায় একটি 'ঠাণ্ডা' মানুষের হাতে 'ফ্যালিক সিম্বল'-এর মত। এ ছবির অন্য পুরুষ চরিত্রটির (সঞ্জীব কুমার) সঙ্গে তার স্ত্রীর (শাবানা আজমি) সম্পর্কে অনন্য ভাবে অন্য এক যন্ত্রণার আভাস এনেছেন সত্যজিৎ। স্বামীটি তার সঙ্গম-অপারগতা সম্পর্কে সচেতন এবং পরাজিত ইগোর প্যাশন বা যন্ত্রণা থেকেই সে যেন রাতদিন দাবা খেলছে। দাবা যুদ্ধের উষ্ণতাই তার যৌন-শৈত্যের আয়রনিক প্রেক্ষিত। একটি অসামান্য দৃশ্যে তার স্ত্রী তাকে বিছানায় ডাকছে। সাড়া দেবার অক্ষমতায় স্বামীটির অস্বস্তি, লজ্জা এবং যন্ত্রণা গভীরপ্রসারী ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যজিৎ। স্তিমিত আলোর এক দৃশ্যে তৃষ্ণার্ত স্ত্রীর (শাবানা) উগ্র আলিঙ্গনে যেভাবে স্বামীটি (সঞ্জীব) ঘেমে ওঠে এবং তুঙ্গ মুহূর্তের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপ বিকিরণে ব্যর্থ হয় তা ইঙ্গিতবহনে অব্যর্থ। 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী'র দুটি পুরুষেরই পরাজিত অহংবোধের বিচরণভূমি দাবার যুদ্ধক্ষেত্র। এই দুই পুরুষ পরস্পরের সান্নিধ্যের মোহ কিংবা আবেশ কাটিয়ে উঠতে এতদূর অক্ষম যে তাদের সম্পর্কের মধ্যে সমকামের ইঙ্গিত রয়েছে একথা বললেও বেশি বলা হবে না। 'ঘরে-বাইরে' এবং 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী'র সাদৃশ্য আমার চোখে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় যখন এই ছবি দুটিকে একদিকে পুরুষের যৌন-অপারগতা এবং অন্য-দিকে নারীর দমিত যৌন-তাড়নার ইংগিতবাহী বিশ্লেষণ হিসেবে দেখি। দুটি ছবিতেই রাজনীতি আসছে নারী-পুরুষের জটিল সম্পর্কের প্রেক্ষিতে। আর উভয় ছবিরই ঋতুকাল শীত, যৌন-শৈত্যের প্রতীক হিসেবে প্রায় অপরিহার্যভাবে উপস্থিত।

।। ১৪ ।।

স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি 'পিকু'তে সত্যজিৎ রায় পিকুর মাকে (অপর্ণা সেন) দাঁড় করিয়েছেন চারুলতা

কিংবা বিমলার চেয়ে অনেক বড় এক চ্যালেঞ্জের সামনে। চারু এবং বিমলার মত, অন্তত আপাতভাবে, পিকুর মা নিঃসঙ্গতার শিকার নয়। তার বিবাহিত জীবনের ওপরকার চেহারাটা অন্তত বিমলা, চারু, কিংবা 'কাপুরুষ মহাপুরুষ'-এর করুণা এবং 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি'র দুই নারীর (শাবানা ও ফরিদা) দাম্পত্যজীবনের তুলনায় স্বাভাবিক। চারু বিমলা, করুণা এবং শতরঞ্জ-এর দুই নারীর মত 'পিকু' ছবির নারী চরিত্রটি সন্তানহীন নয়। চারু, বিমলা, করুণা এবং এবং শতরঞ্জ-এর দুই নারীর যে কোনও সন্তান নেই, সেটাকে নেহাত কাকতালীয় বলে ভাবাটা ঠিক হবে না। বরং এই পঞ্চকন্যার সন্তানহীনতা তাদের দাম্পত্যজীবনের ভিতরকার চেহারাটাকে অনেকদূর পর্যন্ত আমাদের চোখের সামনে খুলে দিচ্ছে, এতটা ভেবে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যে-কথাটা আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না তা হল, এদের প্রত্যেকের দাম্পত্যজীবনে দেহের দাবিকে অস্বাভাবিকভাবে জুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই যেন হিমঘরে নির্বাসিত। স্বামীদের কাছ থেকে প্রত্যেকের ঠান্ডা দূরত্ব কিভাবে এদের বরফের মত দহন করছে কিংবা অবশ করে দিচ্ছে, কিংবা চালিত করছে পরকিয়া প্রেমের দিকে, এই বিষয়টিকে সত্যজিৎ নানা ভঙ্গিতে, বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কার করেছেন একাধিক ছবিতে। অত্যুক্তির ঝুঁকি ছাড়া এ-কথাও বলা যায় যে, উপবাসী কামনার দ্বারা তাড়িত নারী সত্যজিতের ছবির এক মুখ্য বিষয়। 'অরণ্যের দিন-রাত্রি'র বিধবাটি (কাবেরী বসু), কিংবা 'জন-অরণ্যে'র কণা, কিংবা আরতি ভট্টাচার্য অভিনীত কল গার্ল, 'অশনি সংকেত'-এর ছুটকি (সন্ধ্যা রায়)—এরাও চরিত্রে, মেজাজে, মূল্যবোধে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠায় মেরুর পার্থক্য সত্ত্বেও উপবাসী কামনার দ্বারা তাড়িত। নারীর মধ্যে দমিত যৌনতার প্রকাশ কত বিচিত্র রহস্যময় পথে যুগিয়ে চলে অমোঘ ট্র্যাজেডির ইন্ধন, সত্যজিৎ একাধিক ছবিতে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। নারীর মধ্যে উপবাসী বাসনার পাশাপাশি তাঁর একাধিক ছবিতে সমান্তরালভাবে রয়েছে পুরুষের উদাসীনতা, শৈত্য, নির্লিপ্ততা সম্ভোগ-অনীহা।

শুরুতেই বলেছি, 'পিকু'র কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রটিকে অনেক বড় এক চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন সত্যজিৎ। স্বামীকে লুকিয়ে হিতেশের সঙ্গে এই মেয়েটির দৈহিক সম্পর্কের জন্যে তার স্বামীর উদাসীনতা, শৈত্য কিংবা দাম্পত্যজীবনের অস্বাভাবিকতাকে চট করে দায়ী করা যায় না। স্বামীটি অত্যাচারী, লম্পট, কিংবা অন্য কোনও মেয়েকে ভালবাসে, এমন কোনও স্থূল ইঙ্গিতে বিবাহিত নারীর পরকিয়া প্রেমের সমর্থন যুগিয়ে তার স্খলনের ব্যাখ্যাকে সহজ করে দেবার মানুষও সত্যজিৎ নন। ভুললে চলবে না যে 'পিকু' তৈরি হয়েছে সত্যজিতের নিজেরই ছোটগল্প 'পিকুর ডায়রি' থেকে।

'পিকু' ছবিটির কেন্দ্রীয় বিষয়ের বিশ্লেষণ থেকে এখানে আমি কিছুক্ষণের জন্যে সরে যেতে চাই 'পিকুর ডায়রি' ছোটগল্পটির অন্দরমহলে। মূল কাহিনীটির সঙ্গে ছবিটির সৌহার্দ্য প্রায় আগা-গোড়া অক্ষুণ্ণ সিনেম্যাটিক রূপান্তরের শাসন এবং আজ্ঞা মেনে নিয়েও। সৌহার্দ্যের সম্পর্কটি সবচেয়ে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যায় মূল কাহিনীর অবসাদহীন প্রবাহ-ছন্দ কিভাবে ছবির মধ্যে ধরা দিয়েছে তার বিশ্লেষণে। 'পিকুর ডায়রি' এক অনন্য ছোটগল্প। আমার মনে হয় না, 'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু' ছাড়া, আর কোনও ছোটগল্পে তিনি রূপকরণের বৈচিত্র্যে এতদূর বিস্তারিত, অভিনব ভাবনায় এতখানি অকৃপণ। এই দুটি গল্পের লেখক সত্যজিৎকে একেবারে ভিন্ন মেজাজে, ভিন্ন মাপের মানুষ বলে মনে হয়। এ-কথা বলতে কুণ্ঠা করব না যে, তাঁর ইদানীং কালের অনেক লেখাকেই এই দুটি ছোটগল্পের পাশে পাংশু লাগে। উদাহরণের জন্যে 'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু' গল্প থেকে দুটি প্রবল মুহূর্ত তুলে ধরছি। এক জায়গায়, আর্য-শেখরের বিশ্বাস হচ্ছে না যে সৌম্যশেখরের মত কল্পনাবিমুখ বৈষয়িক-চিন্তাসর্বস্ব স্থূল ব্যক্তি তাঁর জন্মদাতা। ভাবতে-ভাবতে সহসা একটি সম্ভাবনা এসে আর্যশেখরের মনে দুরমুশের মত আঘাত করল : তিনি যদি জারজ সন্তান হয়ে থাকেন? যদি সৌম্যশেখরের ঔরসে তাঁর জন্ম না হয়ে

থাকে? কথাটা মনে হতেই আর্যশেখর বুঝলেন এ-প্রশ্নের উত্তর একমাত্র তাঁর বাবাই দিতে পারেন এবং সে-উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই। সত্যান্বেষণের খাতিরে পুত্র পিতাকে প্রশ্ন করবে এটা আর্যশেখরের খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হল। মুখের ওপর সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, তিনি সৌম্যশেখরের জারজ সন্তান কি না।

গল্পের আর এক জায়গায়, সৌম্যশেখর পুত্র আর্যশেখরকে বলছেন, বংশবৃদ্ধির কথাটা ত ভাবতে হবে। নাকি তুমি বিয়ে করবে না বলে ঠিক করেছ?

আর্যশেখর উত্তর দিচ্ছেন, তিনি বিয়ে করবেন না। সৌম্যশেখরের পাল্টা প্রশ্ন : কেন সেটা জানতে পারি কি? আর্যশেখরের উত্তর : প্রথমত, আমার প্রজনন ক্ষমতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। পুরুষের শৈত্য, যৌন-অপারগতার বিষয়টি অনেক আগে থেকেই যে সত্যজিতের ভাবনার মধ্যে ছিল, তা এখান থেকেই বোঝা যায়। এবং কত অকপট সাহসে সেই ভাবনার প্রকাশে তিনি সক্ষম ছিলেন একদা!

এই সংলাপ চকিত-আলোকে অন্য এক সত্যজিৎকে আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত করে, যিনি নিজেকে যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই, কিংবা এক স্তিমিত গম্ভীর এবং দূরপ্রসারী ভাবমূর্তির দাবি মেটাতে ক্রমশ ঢেকে দিয়েছেন। 'আর্যশেখরের জন্ম এবং মৃত্যু' এবং 'পিকুর ডায়রি'—এই দুটি বিদ্যুৎ-বাহী ছোটগল্পের সাহসী মানসবিশ্লেষণ তাঁর আর কোনও গল্পে, এবং তাঁর সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রে তেমন পাই না বলে কষ্ট হয়। ভাবতে বিস্ময় লাগে যে, তিনি এই দুটি গল্পের পর থেকেই তাঁর গল্প এবং উপন্যাসে নারী বর্জন করেছেন প্রায় পুরোপুরিভাবেই। ভায়োলেন্স, হত্যা, অপরাধ, সবই হতে পারে তাঁর কাহিনীর উপাদান, কিন্তু সেক্স-এর লেশমাত্র অনুপ্রবেশ তিনি ঘটতে দেন নি কোথাও।

অন্যধারে, সত্যজিতের ছবির অন্যতম বিষয় নারী-পুরুষের সম্পর্ক। তিনি তথাকথিত প্রেমের ছবি করেন না বলেই তাঁর ছবিতে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের উন্ঘাটন এত বিচিত্র, এত সূক্ষ্ম। কিন্তু তবু বলতেই হয়, যৌন সম্পর্কের উন্মোচন যেন ক্রমশ তাঁর ছবিতে পেলব, স্তিমিত, এবং গভীর কোনও ইনহিবিশানের চাপে ফ্যাকাশে। এই পেলবতা 'ঘরে-বাইরে' ছবিতে আমাকে সবচেয়ে কষ্ট দিয়েছে। 'পিকু'র পরে 'ঘরে বাইরে'কে আমার অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স বলে মনে হয়। 'ঘরে-বাইরে' এক অর্থে 'পিকু'র উল্টোপিঠ। দুটি ছবিরই বিষয়বস্তু বিবাহিত নারীর পরকিয়া প্রেম। কিন্তু 'পিকু'র অতিসীমিত পরিধির মধ্যেও দুটি পুরুষ এবং একটি নারীর ত্রিকোণ সম্পর্কের দ্যোতনাকে অনেক বেশি গভীর-সঞ্চারী করেছেন সত্যজিৎ। বিমলার ট্র্যাজেডির চেয়ে পিকুর মার ট্র্যাজেডি অনেক বেশি তীব্র, অনেক বেশি সমস্যাজর্জর। হিতেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে পাপবোধ ছড়িয়ে দিচ্ছে তার ছেলের উপস্থিতি। নিঃসন্তান বিমলাকে এই সমস্যার সামনে পড়তে হয় না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে যিনি নিজের লেখা গল্প থেকে 'পিকু'র মত একটি দেহজ-প্রেমের ছবি করতে পারেন তাঁকে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ করতে হল! 'পিকু' ছবির অন্তিম অ্যামবিভ্যালেন্স 'ঘরে-বাইরে' ছবির অন্তিম অতিকথনের গালে চড় কষিয়ে দেয় বললেও বেশি বলা হয় না। 'ঘরে-বাইরে'র শেষে সত্যজিৎ বিমলাকে তার 'স্খলনের' জন্যে বৈধব্যের শুদ্ধিতে নির্বাসিত করেন। 'পিকু'র শেষে কোনও নৈতিক মূল্যায়নের দায়িত্ব নেন নি সত্যজিৎ। পিকুর মার সঙ্গে হিতেশের নিছক দেহজ সম্পর্কের ওপর কোনও প্লেটনিক চাদরও বিছিয়ে দেন নি তিনি। পিকুর মা যখন হিতেশকে বলছে, আজ পিকু বাড়ি থাকায় তাদের মিলনে অসুবিধে হতে পারে, হিতেশ তখন সরাসরি উত্তর দিচ্ছে, আজ তাহলে না ডাকলেই পারতে। বোঝা যায় পিকুর মার সঙ্গে দৈহিক মিলনের তাড়নাই হিতেশের কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার। এটা জেনেও কিন্তু পিকুকে বাগানে পাঠিয়ে পিকুর মা হিতেশকে নিয়ে বিছানায় যাচ্ছে এবং মিলনের তুঙ্গ

মুহূর্তে পিকুর 'মা' ডাক শুনতে পাচ্ছে বাগান থেকে। সেই মুহূর্তে তাঁর অন্যায়-বোধের ইঙ্গিতটুকু শুধু তুলে ধরেন সত্যজিৎ, কিন্তু পিকুর মাকে কোনও নৈতিক তিরস্কারের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন না। বিমলার সঙ্গে নিখিলেশের সম্পর্কের শৈত্য সারা ছবিতে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যজিৎ সেইভাবে পিকুর মার সঙ্গে তার স্বামীর সম্পর্কে শৈত্যের কোনও আভাস ফুটিয়ে তোলেন নি তিনি। বরং নিখিলেশ পরপুরুষের বুকপকেটে নিজের স্ত্রীর চুলের কাঁটা দেখেও নিরুত্তাপ থাকতে পারে অসহনীয়ভাবে, আর পিকুর বাবা তার মাথার বালিশে অন্য পুরুষের চুল আবিষ্কার করে স্ত্রীকে খোঁটা দিতে ছাড়ে না। পিকুর বাবার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক সত্ত্বেও পিকুর মা যে দাম্পত্য জীবনে যৌনতৃপ্তি পাচ্ছে না এবং এই উপবাসের তাড়না থেকেই হিতেশকে প্রায়শই বিছানায় ডাকতে বাধ্য হচ্ছে—এই নির্মম ঘটনাটি থেকেই জন্ম নিচ্ছে কাহিনীর অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা। স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনের আজ্ঞা বহন করেও এবং বাৎসল্যের দাবি মেনে নিয়েও নারীর মধ্যে যে যৌন-অতৃপ্তির তাড়না কাজ করতে পারে এই সহজ কথাটা কী অকপট সাহসে প্রকাশ করতে পেরেছেন সত্যজিৎ একটি স্বল্প পরিসর ছবির শাসনের চাপ সহ্য করেও সেকথাটা ভাবলে উপলব্ধি করি 'পিকু' ছবিটির অন্তর্লীন প্রাবল্যকে।

।। ১৫ ।।

সত্যজিৎ রায়ের ভাবনায় শৈশব—এই বিষয়টির ক্ষেত্র এত বিস্তৃত এবং জটিলতা এমনই প্রবঞ্চক যে সেখানে পা ফেলতে দেবদূতও অনিশ্চিত বোধ করবে। সত্যজিতের চলচ্চিত্রে, লেখায় এবং তাঁর আঁকা ইলাসস্ট্রেশনে বারবার ধরা পড়েছে শৈশবের বিচিত্র মুড, ভিন্ন-ভিন্ন মাত্রা ; এমনভাবে, যে বোঝা যায় পেছনে রয়েছে মৌলিক মনন, বিশ্লেষণ এবং সংবেদনার অবদান। ছোটদের জন্যে তিনি তৈরি করেছেন শব্দের এবং ছবির ধাঁধা, বানিয়েছেন শব্দজব্দ, মজার সব ওয়ার্ড গেম, আর ছোটদের একটি অনন্য পত্রিকার তিনি অন্যতম সম্পাদক। এক কথায় বলতে গেলে, তিনি তাঁর সময় ও ভাবনার এক বিপুল অংশ খরচ করেন ছোটদের জন্যে, ছোটদের কথা ভেবে। কেন করেন, এই আপাত সহজ এবং সরাসরি প্রশ্নের উত্তর পাওয়াটা কিন্তু সহজ হবে না। নিঃসন্দেহে সত্যজিতের শৈশব-ভাবনা এবং শৈশবের প্রতি বিশ্লেষণী মুগ্ধতার শিকড় চলে গেছে পারিবারিক সূত্রে পাওয়া মানস গঠনের মধ্যে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর তিনি নাতি, সুকুমার রায়ের তিনি পুত্র—এই পরিচয়ের অমোঘতা অস্বীকার করবে কে? সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার মধ্যেই তাঁর পারিবারিক উত্তরাধিকারের সোচ্চার স্বীকৃতি রয়েছে। কেউ কেউ বলবেন সুকুমার রায়ের 'সেনস অফ দ্য অ্যাবসার্ড' বা অদ্ভুত রস সত্যজিতের মধ্যে নেই। তাঁর লেখার মধ্যে, কিংবা তাঁর তৈরি ছোটদের ছবির মধ্যে অদ্ভুত রস তেমন পাই না বটে, কিন্তু সুকুমার রায়ের ছড়া যেভাবে, যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে তিনি অনুবাদ করেছেন ইংরেজীতে, তাতে বোঝা যায় মনে 'অ্যাবসার্ড'-এর বোধ না থাকলে, অদ্ভুতকে সম্ভাব্য করে তোলার মজাটা না গ্রহণ করতে পারলে, এই অনুবাদ, যাকে আমি বলব 'ট্রান্সক্রিয়েশন', তা সম্ভব হত না। সুকুমার রায়ের বেশ কিছু লেখার সঙ্গে ('খাইখাই', 'বহুরূপী') আমরা যখন সত্যজিৎকৃত ইলাসস্ট্রেশনগুলো দেখতে পাই তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না পারিবারিক উত্তরাধিকার কিভাবে প্রচ্ছন্ন স্মৃতির মত তাঁর মন ও ক্ষমতাকে চালিয়ে নিয়ে গেছে। এইসব ইলাসট্রেশন বা অলঙ্করণের মধ্যে অদ্ভুত রসের যে সঞ্চরণ আমরা পাই তার চরিত্র কিন্তু সাবলীলভাবে নির্ধারিত হয়েছে শিশুকল্পনার সামগ্রিক সম্ভাবনার উপলব্ধির দ্বারা। শিশু-কল্পনার অত্যাশ্চর্য বিস্তার, এই কল্পনার পরিধির মধ্যে কিভাবে অদ্ভুতের আলোয় আবিষ্কৃত হয় চেনা পৃথিবী, ঘরোয়া পরিবেশ এবং অভিজ্ঞতা এবং কিভাবে গৃহীত হয় অসম্ভবের সমস্ত উদ্ভাস, তা সত্যজিৎ শুধু বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করেন না, বোঝেন, বুঝে মজা

পান তাঁর মন দিয়ে, তাঁর সংবেদনা দিয়ে। সত্যজিতের অদ্ভুত-বোধের চমক লাগানো বুদ্ধিদীপ্ত বিস্তার আমরা পাই প্রোফেসর শঙ্কুর বেশ কিছু গল্পের মধ্যে, প্রোফেসর হিজবিজবিজ-এর রূপায়ণের মধ্যে। অদ্ভুতের উপলব্ধি থেকে যে-মজাটা সত্যজিৎ পান এবং সেই মজা তিনি যেভাবে ছোটদের সঙ্গে ভাগ করে নেন (আমি 'পৌঁছে দেন' কথাটা ইচ্ছে করেই লিখলাম না কারণ তার মধ্যে একটা দূরত্বের ইঙ্গিত থাকে), তার উদাহরণ সত্যজিতের চলচ্চিত্র থেকে পাওয়াও কিছু কঠিন নয়। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এ আকাশ থেকে মিষ্টির বৃষ্টি কিংবা গুপী বাঘার গানের মোহনীয় সম্মোহন কিংবা তাদের জুতো এবং ঢোলের অপার্থিব ক্ষমতা—এইসব কিছু উঠে আসছে 'অদ্ভুত'-এর চেতনা থেকে। আবার 'হীরক রাজার দেশ'-এ রাজার অত্যাচার-ঘরের যন্ত্রপাতি এবং ম্যাজিশিয়ানের হাবভাব এবং কাজকর্মে অদ্ভুত রসের সঙ্গে ভয়ানক এবং বীভৎস রসের সমন্বয় এতদূর মসৃণ ও সাবলীল যে ত্রয়ী মিলনে সৃষ্টি হয়েছে এমন পরিবেশ যা ছোটদের কল্পনাকে পর্যাপ্ত খাদ্য যোগানোয় অদ্বিতীয়।

সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে যে কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাঁকে বোঝার পক্ষে একান্ত জরুরী, সেই কথাটাই তাঁর বিষয়ে আলোচনা, তার উপর লেখা গ্রন্থে কেন জানি না অস্ফুট রয়ে গেছে এখনও। কথাটা হল, 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনায় তাঁর নিশ্ছিদ্র এবং বিস্তৃতভাবে সৃষ্টিশীল অংশগ্রহণ। প্রবল ব্যস্ততা সত্ত্বেও সন্দেশ-এর জন্যে তাঁর ক্লান্তিহীন পরিশ্রম এবং ভাবনা সম্ভব হত না যদি না ছোটদের জগতের প্রতি তিনি অনুভব করতেন রক্তের টান। 'সন্দেশ' সম্পাদনার এবং অলঙ্করণের পিছনে এমন এক প্রতিভার নিয়ন্ত্রণ এবং অংশগ্রহণ আমরা অনুভব করি যা এই পত্রিকাটিকে দিয়েছে চারিত্র্য। সত্যজিৎ রায় বুক দিয়ে 'সন্দেশ'-কে আগলে রেখেছেন, এই হল আসল কথা। আমি সেই সব সৌভাগ্যবানদের একজন যাদের শৈশবের সঙ্গে 'সন্দেশ'-এর আত্মীয়তা গভীর। 'সন্দেশ'-এর ধাঁধা এবং 'সন্দেশ'-এর ছবি আমাকে সবচেয়ে বেশি টানত। রঙ নেই, চেহারার বাহার নেই তবু 'সন্দেশ' হাতে পেলে খুশি হতাম একথাও সত্যিই সত্যি। 'সন্দেশ'-এর অন্যতম আকর্ষণ সত্যজিতের লেখা। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। 'সন্দেশ'-এর মজাটা অনেকটাই আসছে সত্যজিতের আঁকা ছবি থেকে। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি, যদিও সবটা বোঝানো সম্ভব নয়, অন্তত আমার পক্ষে। সত্যজিতের ইলাসস্ট্রেশনে এমন একটা রেখার গতি আছে, এমন ভাবে রৈখিক পরিবর্জন এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এইসব ইলাসট্রেশনের সারল্য, তাৎক্ষণিকতা এবং ছন্দ যে ছোটরা, নিরক্ষর ছোটরাও সেইসব ছবি চেখে-চেখে মজা পেতে কষ্ট বোধ করে না। সত্যজিতের ইলাসট্রেশন কথা বলে, একেবারে ছোটদের কাছেও ছোটদের মত করে পৌঁছে দেয় মোদ্দা বার্তাটা—এই হল ছোটদের গল্পের ইলাসট্রেশনে তাঁর তুমুল সাফল্যের চাবিকাঠি। তিনি খুব অল্প রেখায় এবং কলমের দ্রুত, বলিষ্ঠ টানে গল্পের একটি মুহূর্তকে এবং এক বা একাধিক চরিত্রের মনের ভাব, ফূর্তি, দুঃখ, ফন্দিবাজী কিংবা টেনশন ফুটিয়ে তুলতে পারেন। ছোটদের খুব তাড়াতাড়ি এইসব ছবি স্পর্শ করে, তার কারণ তিনি বোঝেন ছোটদের মন কিভাবে, কোন পথে কাজ করে, তাদের চোখ কতটা একসঙ্গে গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের মন এবং কল্পনা সেই গৃহীত উপাদানের কতখানি নিংড়ে নিতে পারে নিজস্ব ছাঁচে নতুন ভাবে তৈরি করে নেবার জন্যে। সত্যজিতের ইলাসট্রেশনের রৈখিক দ্রুতি, এবং পরিমিতি আরও একটা কাজ করে শিশুদের কল্পনাকে বিচিত্র সম্ভাবনার প্রশ্রয় দেয়। তিনি ছবিতে যা বলেন তার পাশাপাশি অনেকটাই বলেন না যাতে ছোটরা নিজেদের কল্পনা মত অনুপুঙ্খগুলিকে ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে নিতে পারে। এই কারণে সত্যজিতের আঁকা ইলাসট্রেশন ছোটদের চোখে কখনও ফুরিয়ে যায় না, তাদের কল্পনার খাদ্যে সত্যজিৎ টান ধরাতে চান না কখনও। সত্যজিতের ইলাসট্রেশনের নির্ভার শৈলীর সঙ্গে ছোটদের জন্যে তাঁর তৈরি চলচ্চিত্রের সম্পাদনা-ভঙ্গির আশ্চর্য মিল লক্ষণীয়। 'জয়বাবা ফেলুনাথ' কিংবা 'সোনার কেল্লা'র এডিটিং স্টাইল এই দুটি ছবিতে যে ধরনের স্পিড বা গতি দিয়েছে তার সঙ্গে সত্যজিতের ইলাসট্রেশনের তীব্র বলিষ্ঠ

রৈখিক গঠনের সাযুজ্য অনস্বীকার্য। ছোটদের জগতে 'ঝুলন্ত' সময় বলে কিছু নেই। তাদের নিরন্তর ব্যস্ততাই এটা প্রমাণ করছে। শিশুদের গতিপ্রেম এতই তীব্র যে, তাদের একটি কাজ আর একটির গায়ে ডিজলভ্-এর মত, মধ্যিখানে কোন যতি চিহ্ন নেই। সত্যজিতের শিশু-চলচ্চিত্রে এবং তাঁর আঁকা ইলাসট্রেশনে তাই ঝুলন্ত সময়ের চিহ্ন মাত্র নেই। গতিই হল এদের অন্তরের বার্তা।

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে শৈশব ভাবনাকে বুঝতে হলে তাঁর আঁকা ইলাসট্রেশন এবং তাঁর লেখা গল্পে আমাদের ফিরে যেতেই হবে। আমার তো মনে হয় তাঁর গল্প থেকেই শুরু করা ভাল। কেন তাঁর প্রথম ছবি একটি বালক এবং একটি বালিকাকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল, সে কথার আংশিক উত্তরও পাওয়া যাবে তাঁর শিশু সাহিত্যের বিশ্লেষণে। সত্যজিতের গল্পে ছোটরা এসেছে দুভাবে। কখনও তারা গল্পের চরিত্র, ঘটনায় তাদের অবদান এবং অংশগ্রহণ তাৎপর্যময়। আবার কিছু গল্পে সমস্ত ঘটনাটিকে দেখা হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে, বিশ্লেষণ করা হচ্ছে শিশুর দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ সে-ই গল্পটা বলছে। শিশু এসেছে চরিত্র হিসেবে, 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি,' 'ক্লাস ফ্রেন্ড' 'চিলে কোঠা,' 'অতিথি' 'ফ্রিৎস' (শৈশব স্মৃতি), 'ভক্ত,' 'সমাদ্দারের চাবি,' 'জয়বাবা, ফেলুনাথ,' 'সোনার কেল্লা,' 'ফটিকচাঁদ,' 'নেপোলিয়নের চিঠি,' প্রভৃতি গল্পে। এ-ছাড়া যে সব গল্পে ছোটদের চোখে একেবারে সরাসরি ধরা দিচ্ছে বড়দের পৃথিবী কিংবা ছোটদের কল্পনায় বিশেলষিত হচ্ছে ঘটনা বা অভিজ্ঞতা তার মধ্যে অন্যতম : 'পিকুর ডায়রি' 'সদানন্দের খুদে জগৎ,' 'পিন্টুর দাদু' এবং 'শিবু আর রাক্ষসের কথা।' সত্যজিৎ রায়ের শিশু চলচ্চিত্রের সামগ্রিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, সম্ভব নয় বুঝে ওঠা তাঁর চলচ্চিত্রে শৈশবের অজস্র ব্যঞ্জনকে এইসব গল্পের বিস্তারিত প্রেক্ষিত ছাড়া। আর নিজের ছেলেবেলা নিয়ে লেখা 'আমার ছেলেবেলা' এক আশ্চর্য আলোর মত যা উজ্জ্বল করে তোলে সত্যজিতের শৈশব-ভাবনার এমন কিছু ক্ষেত্র যা এই আংশিক আত্মজীবনীটির সাহায্য ছাড়া আমাদের উপলব্ধির আড়ালে থেকে যেত।

।। ১৬ ।।

ছোটদের জন্যে তৈরি সত্যজিৎ রায়ের ছবি এবং ছোটদের জন্যে লেখা সত্যজিৎ-সাহিত্যের সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হল যে সেখানে বড়দের ভাল লাগার, মজা পাওয়ার এবং ভাবনার উপাদান কিছু কম থাকে না। অদ্ভুত কিংবা অলৌকিককেও সত্যজিৎ তাঁর গল্পে, কোলরিজের মত, বিশবাস্য করে তুলতে পারেন। 'উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ'-এর যে দাবি সত্যজিৎ তাঁর ছোটদের লেখায় করেন তার যাথার্থ্য এবং অব্যর্থতা বড়দের কাছেও হারিয়ে যায় না। ফ্রিৎস, শিবু আর রাক্ষসের কথা, অংক স্যার, গোলাপীবাবু আর টিপু, খগম প্রভৃতি গল্পে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে অবিশ্বাসকে রোধ করার এই দাবির কাছে নতি স্বীকার করি। অর্থাৎ, প্রাত্যহিক পরিচিত পৃথিবীর লজিক সরে দাঁড়িয়ে সত্যজিতের কল্পনাপ্রসূত অসম্ভবের জন্যে সহজেই জায়গা করে দেয়। এইখানেই ছোটদের লেখক হিসেবে তাঁর বিপুল সাফল্যের উৎস।

একটু নজর করলে বোঝা যায় সত্যজিৎ তাঁর শিশু-সাহিত্যে ছোটদের পিঠ চাপড়ে ছেলেভোলানো কথা বলেন না। তাঁর ছোটদের জন্যে লেখায় কিংবা ছোটদের জন্যে চলচ্চিত্রে যেমন কোথাও এতটুকু মাস্টারি নেই, তেমনি নেই 'ছোট্টসোনা বন্ধুরা' মার্কা ন্যাকামি। তিনি ছোটদের জন্য তথাকথিত 'আদর' কিংবা 'ভালবাসা' থেকে লেখেন না, কিংবা তৈরি করেন না চলচ্চিত্র। 'চিলেকোঠা,' 'অতিথি,' 'ধাপ্পা', 'অপদার্থ', 'সদানন্দের খুদে জগত', 'ব্রাউন সাহেবের বাড়ি', 'নেপোলিয়নের চিঠি', লোড-

শেডিং, 'দুই ম্যাজিশিয়ান', 'সেপ্টোপাসের খিদে', 'নীল আতঙ্ক', 'কৈলাস চৌধুরির পাথর' প্রভৃতি গল্প উঠে এসেছে এমন একটি মানুষের বিশুদ্ধ প্রতিভা থেকে যিনি মারভেল, ব্লেক কিংবা পো-এর মত শৈশবের বিস্ময়, বিশ্বাস এবং আনন্দকে হারিয়ে ফেলেন নি, যিনি তাঁর অধিকাংশ লেখাই লেখেন নিজের আনন্দের জন্যে, নিজের মনের চাহিদা মেটাতে। শৈশবের বিচিত্র উদ্ভাসকে সত্যজিৎ এখনও আবিষ্কার করতে পারেন, শৈশব-অভিজ্ঞতা এবং শৈশব-স্মৃতির বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে তাঁর মন এখনও সতেজ সাবলীলতায় শুষে নিতে পারে আনন্দের উপাদান। এবং এই আবিষ্কার ও আনন্দের অংশীদার হওয়ার আমন্ত্রণ সত্যজিৎ উদারভাবে পৌঁছে দিতে পারেন তাঁর সব বয়সের পড়ুয়াদের কাছেই। এইখানেই লেখক হিসেবে সত্যজিতের মহত্ত্ব। ষাটের দশকের একেবারে গোড়ার দিকে আমরা সবে কলেজে ঢুকেছি। হাবভাবে গনগনিয়ে উঠছে উদ্ধত জ্যাঠামো। কাম্যু, সার্ত্র, প্রুস্ত যত না বুঝি তার চেয়ে আওড়াই বেশি। সেই সময় 'সন্দেশ'-এ পড়লাম সত্যজিতের লেখা 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'। স্তম্ভিত আমরা বলতে বাধ্য হলুম, তুঙ্গস্পর্শী প্রতিভা ছাড়া সম্ভব নয় এমন গল্প লেখা। তবু মনে মনে এই ভেবেও কষ্ট হল যে এই বিস্ফোরণ আকস্মিক, কারণ, পরিচিত বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে আছে সত্যজিতের সাহিত্য-প্রতিভার এই উন্মোচনী উচ্চারণ। ঠিক এক বছরের মধ্যেই 'সন্দেশ'-এই পড়লাম 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' এবং 'সদানন্দের খুদে জগৎ।' তখন প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গাঙ্গুলি, শিবরাম চক্রবর্তীর যুগ। এই তিনটি গল্পের অভিঘাতেই সত্যজিৎ বাংলা কিশোর-সাহিত্যে নিজের জন্যে একটা জায়গা করে নিলেন। তিনি যা নিয়ে এলেন তা বুদ্ধি, বৈদগ্ধ্য এবং সংবেদনার এক আশ্চর্য সমন্বয়। বাংলা সাহিত্যে বিস্ময়ের সঙ্গে অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর রসের এমন সাবলীল মিশ্রণ খুব বেশি দেখেছি বলে মনে হয় না যেমন দেখতে পাই সত্যজিতের 'সদানন্দের খুদে জগৎ,' 'ফ্রিৎস,' 'প্রফেসর হিজিবিজবিজ,' 'মিঃ শাসমলের শেষ রাত্রি,' 'শিবু আর রাক্ষসের কথা,' 'টেরোডাকটিলের ডিম' প্রভৃতি গল্পে। প্রফেসর শঙ্কুর মত মানবতাবাদী বৈজ্ঞানিকের বিচিত্র আবিষ্কার ও নানা কাণ্ডকারখানার মাধ্যমে সত্যজিৎ প্রায় সমস্ত আধুনিক পৃথিবীটাকেই এমনভাবে এনে ফেলেছেন আমাদের অভিজ্ঞতা ও নাগালের মধ্যে যে এর তুলনীয় আন্তর্জাতিকতা ভারতীয় কিশোর সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায় না। ফেলুদার মত ডিটেকটিভও কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আর আছে বলে মনে হয় না। ব্যোমকেশ, কিরীটী, জয়ন্ত এরা কেউই বৈদগ্ধ্যের বিস্তারে, সংবেদনার গভীরতায়, কল্পনার মৌলিকতায় ফেলু মিত্তিরের প্রতিযোগী হতে পারে না। ফেলুদার পাণ্ডিত্যে কোথাও নেই দেখানেপনা। কিন্তু স্থাপত্য থেকে সঙ্গীত, টাইপোগ্রাফি থেকে চিত্রকলা, শিল্পের এই বিস্তৃত ক্ষেত্রের সঙ্গে ফেলুর পরিচিতি এত গভীর এবং তার গ্রহণ করা ও মনে রাখার ক্ষমতা এমনই বিস্ময়কর যে সে মুহূর্তে ষোড়শ শতাব্দীর ফ্রান্সে প্রথম তৈরি গ্যারামন্ড টাইপের ইংরেজী, জার্মান, সুইস, আমেরিকান, ভারতীয়, এমন কি কলকাত্তাই সংস্করণকেও আলাদা-আলাদা করে চিনতে পারে। তার চোখে ভারতীয় ও বিদেশী গ্যারামন্ডের সূক্ষ্মতা ও লালিত্যের তফাতটা এতই সহজে ধরা পড়ে যে ব্যাপারটার তাৎপর্য আমরা যেন সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারি না। শার্লক হোমস কিংবা আরকিউল পয়রোর মত ফেলু মিত্তিরেরও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অসামান্য এবং তার স্মৃতিশক্তি অনন্য, এই কথাটুকু প্রমাণ করতে এই গ্যারামন্ড-বিশ্লেষণে ফেলুর প্রতিভার কথা আমাদের জানিয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়া কিন্তু সত্যজিতের উদ্দেশ্য নয়। ফেলু যদি আর এক ধাপ এগিয়ে গ্যারামন্ডের সঙ্গে রবার্ট গ্র্যাঞ্জনকৃত টাইপের তফাত নিয়েও দু-এক কথা অতি সহজে বলত, তাহলেও তার মধ্যে আমাদের বিস্ময় জাগাবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস থাকত না। ফেলু যে এটা পারে এই জন্যেই সে ফেলু, এই বৈদগ্ধ্য ফেলুর চরিত্র ও অস্তিত্বের অংশ। যে কথাটা বলতে ইচ্ছে করছে তা হল, যে-ফেলু মিত্তির মেলোকর্ডের মত একটি একেবারে অভিনব বাদ্যযন্ত্রের রহস্য উন্মোচন করতে পারে, যে-ফেলু মিত্তির টিনটোরেটোর অঙ্কনশৈলীর সঙ্গে এতটাই পরিচিত যে এই শিল্পীর স্বতন্ত্র উদ্ভাসকে চিনতে পারে, কিংবা ইলোরার কৈলাস মন্দিরের স্থাপত্য নিয়ে যে-ফেলু মিত্তির মৌলিক কথা বলতে পারে অতি সহজে, তাকে যেন কখনও কখনও স্বয়ং সত্যজিৎ বলে আমাদের ভুল করতে ইচ্ছে

করে। আমার মনে হয় না সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর কারও পক্ষে ফেলু মিত্তিরের মত গোয়েন্দার রূপায়ণ সম্ভব হত। একটা কথা এখানে বলার খুব লোভ হচ্ছে। 'পিকু'র টাইটেল মিউজিক-এর একেবারে শুরুতে পিকুর বাঁধানো ফটোর ওপর যে টুং টাং শব্দ আমরা শুনতে পাই তা যেন সেতার আর পিয়ানোর সমন্বয় থেকে তৈরি। 'ঘরে-বাইরে'র শুরুতেও যেখানে বিমলা বলছে আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি, সেখানেও এই বিশেষ শব্দই সংলাপের প্রেক্ষিত রচনায় অব্যর্থ হয়ে ওঠে। যেন এই বিশেষ শব্দটিরই নির্ভুল বর্ণনা সত্যজিতের 'সমাদ্দারের চাবি' গল্পে আমাদের চমকে দেয়: 'এবার ফেলুদা গেল মেলোকর্ড যন্ত্রটার কাছে। সাদা-কালো পর্দায় চাপ দিতেই আবার সেই পিয়ানো আর সেতার মেশানো টুং-টাং শব্দ'। বোঝা যায়, এই পিয়ানো আর সেতার মেশানো 'টুং-টাং'-এর অভাববোধ সত্যজিৎকে দীর্ঘদিন কষ্ট দিয়েছে এবং সেতার-পিয়ানোর মিশ্রণ থেকে গড়ে ওঠা একটা নতুন আওয়াজের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেছেন এতদূর গভীরভাবে যে এই আওয়াজটিকে ঘিরেই একটি গল্পই বলে ফেলেছেন। এইভাবেই যেন পরিচালক সত্যজিতের একটি প্রয়োজন থেকে লেখক সত্যজিৎ শুষে নিতে পারেন তাঁর লেখার উপাদান।

।। ১৭ ।।

বাংলা কিশোর সাহিত্যে সত্যজিৎ রায় সন্দেহাতীত সম্রাট। তাঁর লেখার বাণিজ্যিক সাফল্যের প্রধান কারণ গল্পবলার ভঙ্গি এবং ভাষা। বাণিজ্যিক সাফল্যের কথা বলে আমি সাহিত্যিক মূল্যকে ছোট করছি না। যে-ভাষা এবং যে-ভঙ্গি তাঁর গল্পকে জনপ্রিয় করেছে, সেই ভাষা ও ভঙ্গির মধ্যেই আশ্চর্যভাবে নিহিত রয়েছে সাহিত্যিক গুণ। অর্থাৎ, সত্যজিতের লেখার চরিত্র উঠে এসেছে সাহিত্য ও জনপ্রিয়তার সমন্বয় থেকে।

সত্যজিৎ যে-ভাষায় গল্প লেখেন তা একেবারে কলকাতার ভাষা। এমনকি উত্তর কলকাতার বনেদি ভাষা বললেও ভুল হবে না। তিনি অফিসকে 'আপিস' বলেন, বৃহস্পতিবারকে 'বিষ্যুৎবার,' অবশ্যকে 'অবিশ্যি'। এই ভাষার সঙ্গে মিশে থাকে একেবারে আধুনিক, বিদগ্ধ এবং উজ্জ্বল একটি মন থেকে উঠে আসা ভাবনা, চিত্রকল্প, বাক্‌প্রতিমা। এই সমন্বয় এত সাবলীল যে এর পেছনে কোনরকম সচেতন প্রচেষ্টা আছে বলে মনে হয় না। এইভাবেই গড়ে ওঠে সত্যজিৎ-সাহিত্যে টেকস্‌চার বা জমি। সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের টেকস্‌চারাল গুণও উঠে আসে ঠিক এইভাবে। সহজ, সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত গল্প বলার ভঙ্গি। অথচ, একটি সৃষ্টিশীল মৌলিক মনের অবদানে কত ঋদ্ধ হয়ে ওঠে চলচ্চিত্রের বুনন! সত্যজিতের লেখা, বিশেষ করে তাঁর ছোটগল্পের দিকে যখন তাকাই তখন বিস্মিত হই এই ভেবে যে তাঁকে কেন চলচ্চিত্রের জন্যে অন্যের কাছে গল্প ধার করতে হয়। যখন তাঁর ছোট-গল্প বিষয় বৈচিত্র্যে এতটাই চমকপ্রদ। বিষয় বৈচিত্র্যের সঙ্গে রস ও শৈলী-বৈচিত্র্যের সমন্বয় সত্যজিতের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ অবশ্যই।

একটা কথা খুব জোরের সঙ্গে বলতেই হবে। সত্যজিতের বেশির ভাগ গল্পের উৎস গভীর কোনও উপলব্ধি যা আমাদের চিরন্তন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, সেটা যত অস্পষ্ট বা তির্যক ভাবেই হোক না কেন। শুধুমাত্র হাসাবার জন্যে শুধুমাত্র অ্যাডভেঞ্চারের চমক দেবার জন্যে তিনি প্রায় কোনও গল্পই লেখেন না, যেমন লিখেছেন বাংলা কিশোর সাহিত্যিকদের অধিকাংশই। সত্যজিতের গল্পে কোথাও কিন্তু কোন নৈতিক উপদেশের স্থূল প্রচেষ্টা নেই। এই জন্যেই 'অসমঞ্জবাবুর কুকুর'-এর মত গল্প তার অন্তিম বার্তার ফাঁড়া কাটিয়ে ('......সাহের

ভাবছেন টাকা দিলে দুনিয়ার সব কিছু কেনা যায়, তাই শুনে কুকুর হাসছে।......') সাহিত্য হয়ে ওঠে। সত্যজিতের অধিকাংশ গল্পে থাকে উন্মোচনের একাধিক পরত। একটির পর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার ধাক্কায় যেন বাতাসের মধ্যে একটি একটি করে দরজা খুলে যায়। একাধিক পরতের এই উন্মোচনের মাধ্যমে কাহিনীতে আসে এক ধরনের বুনন-জটিলতা, যা, কিশোর-সাহিত্যে আদৌ দেখা যায় না। একাধিক পরতে তাঁর গল্পের ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয় বলেই সত্যজিৎ-সাহিত্যে অ্যামবিভ্যালেন্স, আয়রনি, এবং আকস্মিক উদ্ভাসের চমক আমাদের গভীরভাবে নাড়া দেয়। সত্যজিৎ সহজ ভাষায় লেখেন বটে, তাঁর আপাতসরল কাহিনীর মধ্যে কোনরকম দেখানো-পনা থাকে না বটে, কিন্তু 'পিন্টুর দাদু', 'অপদার্থ', 'সাধনবাবুর সন্দেহ', 'ধাপ্পা', 'প্রোফেসর শঙ্কু ও খোকা', 'তারিণী খুড়ো ও লখ্‌নৌ-র ডুয়েল'—এইসব গল্পের দ্ব্যর্থবোধ, আয়রনি এবং একাধিক ব্যঞ্জনার বিস্তৃতি অনস্বীকার্য। 'অসমঞ্জবাবুর কুকুর'-এ অসমঞ্জর নিঃসঙ্গতা, কুকুরের সঙ্গে তার সম্পর্ক, কুকুরটির হাসির একাধিক ব্যঞ্জনা এবং গল্পের শেষে অসমঞ্জর অপ্রত্যাশিত উপলব্ধি এই সব কিছুর সঙ্গে অন্তর্লীন হয়ে আছে করুণ রস, ব্যঙ্গ, আয়রনি এবং গভীর এক বোধে উত্তীর্ণ হওয়া উদ্ভাসের মত পরস্পর বিরোধী 'থিম'। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে অনেকদূর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের হরিপদ কেরানী এবং সত্যজিতের অসমঞ্জ প্রায় একই লোক। হরিপদর বৈচিত্র্যহীন জীবনে মনের খোরাক যোগায় দেয়ালে জলের দাগ, টিকটিকি, প্রতিবেশীর বাড়িতে হঠাৎ বেজে ওঠা বাজনার সুর। অসমঞ্জবাবুর একাকিত্বকে সহনীয় করে তোলে হিন্দি সিনেমা, ফিল্টার উইল্‌স্‌ এবং বাজনার সুরের মতই ম্যাজিকাল কুকুরের হাসি। বাজনার সুর হরিপদ কেরানীর মধ্যে জাগিয়ে তোলে ঢাকাই শাড়ি পরা একটি মেয়ের জন্যে রোম্যাণ্টিক স্বপ্ন। কুকুরের হাসির অপ্রত্যাশিত ব্যঞ্জনা অসমঞ্জকে পোঁছে দেয় এমন এক বিশ্ববোধে, যেখান থেকে অসমঞ্জ সাম্রাজ্যবাদের কুৎসিত চেহারাটা বুঝতে পারে। রবীন্দ্রনাথের হরিপদ কেরানী উত্তীর্ণ হয় কেবল মাত্র রোম্যাণ্টিক বোধে। আর সত্যজিতের অসমঞ্জ পোঁছে যায় একই সঙ্গে এমন এক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক চেতনায় যার দ্বারা যুদ্ধোত্তর তৃতীয় বিশ্ব নিঃসন্দেহে প্রাণিত। অথচ এই গল্প শেষ পর্যন্ত সোচ্চারভাবে স্লোগানধর্মী হয়ে ওঠার ফাঁড়া কাটিয়ে যায়। এই পরিমিতি-বোধ অসামান্য। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, যিনি অসমঞ্জবাবুর মত কেরানী চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি, একমাত্র তিনিই পারেন 'পরশপাথর'-এর মত ছবি করতে। এ ছবিতেও পরশ-পাথরটি প্রৌঢ় কেরানীকে অসমঞ্জর কুকুরের মতই শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে দেয় টাকার সামাজিক ক্ষমতা যতই বিস্তৃত হোক না কেন, আনন্দ দেবার ক্ষমতায় টাকা কত সীমিত।

'প্রোফেসর শঙ্কু ও খোকা'র মত একেবারে ভিন্ন রসের একটি গল্প থেকে জীবনচেতনার, মূল্য-বোধের আরও এক নিদর্শন পাওয়া যায়। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের একটি সাধারণ শিশু মাথায় আঘাত পেয়ে রূপান্তরিত হয় এক আশ্চর্য প্রতিভায়। তার মধ্যে ঘটে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ম্যাজিকাল উপলব্ধির বিস্ময়কর সমন্বয়। আমাদের মনে পড়ে যায় সত্যজিতের লেখা আরও এক আশ্চর্য গল্প এবং এক অসমাপ্ত চিত্রনাট্যের কথা। গল্পটির নাম 'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু'। চিত্রনাট্যটির নাম 'শাখা-প্রশাখা'। 'খোকা'র মত 'আর্যশেখর'ও ইণ্টেলেকচুয়াল ক্ষমতায় শৈশব থেকেই প্রায় অলৌকিক। তবে অন্তর্লীন স্যাটায়ারের সুর, দুটি গল্পে ভিন্ন ভাবে বেজে ওঠে। খোকা মাথায় আঘাত পেয়ে হয়ে ওঠে ইনফ্যাণ্ট প্রডিজি। আর আর্যশেখর বাবার চড় খেয়ে তার প্রতিভার অনেকটাই হারিয়ে ফেলে। 'শাখা-প্রশাখা'র প্রবোধ জিনিয়াস নয় বটে, কিন্তু এক সময় খুবই মেধাবী ছাত্র ছিল। মেনিনজাইটিসে তার মেধা নষ্ট হয়ে যায়। এই তিনটি ঘটনা পাশাপাশি রাখলে দেখা যায়, তিনটি ক্ষেত্রেই সত্যজিৎ প্রতিভার মৃত্যু ঘটিয়েছেন। তীব্র শ্লেষ এবং অতল দুঃখবোধ থেকেই যেন তিনি এই ক্ষমতাবানদের ধ্বংস করে দেন। বুঝিয়ে দেন, প্রতিভাকে গ্রহণ করার ক্ষমতায় আমাদের সমাজ কত সীমিত, এই সমাজে প্রতিভা বয়ে বেড়াবার যন্ত্রণা কত ভয়ংকর। আমি একথা বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না যে খোকা, আর্যশেখর এবং প্রবোধকে

সত্যজিৎ 'নষ্ট' করে দেন নিজের গভীর অভিমানপ্রসূত সিনিসিজ্‌ম্‌ থেকেই। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন খোকা এবং আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন পাখি 'বৃহচ্চঞ্চু'—উভয়েই বেঁচে থাকার অধিকার পায় তাদের 'প্রতিভা'র তীব্রতা হারিয়ে ফেলেই। 'খোকা' জেনেশুনে তার অলৌকিক সত্তার মৃত্যু ঘটায় শঙ্কুর তৈরি টিরানিয়াম ফসফেট ও অ্যানাইহিলিনের 'মিক্সচার' খেয়ে। বৃহচ্চঞ্চুর ক্ষেত্রে এই প্রতিভা-ধ্বংসী মিক্সচারের কাজ করল চক্রপর্ণের রস। আশ্চর্য দুটি শব্দ 'অ্যানাইহিলিন' ও 'চক্রপর্ণ'; আমাদের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির চক্রে প্রতিভার অ্যানাইহিলেশন বা লুপ্তি যেন অনিবার্য। সত্যজিৎ রায় গল্পের কাঠামো বা স্ট্রাকচার নিয়ে কত সাবলীলভাবে এক্সপেরিমেন্ট করেন তার অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর ছোটগল্পেগুলিতে। আমি শুধুমাত্র একটি নিদর্শন বেছে নিচ্ছি। অসামান্য গল্পটির নাম 'তারিণী খুড়ো ও কনওয়ে কাস্‌লের প্রেতাত্মা'।

সত্যজিতের চলচ্চিত্রের মত এ গল্পের স্ট্রাকচারও মূলত সাঙ্গীতিক। একটি সোনাটার মত এ গল্পটিও একাধিক 'মুভমেণ্ট'-এর আধার।

১

অভিশপ্ত বাড়ি

২

নোট জালিয়াতির খবর

৩

নোট ছাপার শব্দ

৪

ভূত নিয়ে বাজি

৫

স্বদেশী সন্ত্রাসবাদীদের গোপন ডেরা

৬

সাজানো ঘটনায় ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ

৭

ইংরেজ গৃহকর্তার সঙ্গে ভারতীয় ভৃত্যের সম্পর্ক

৮

সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে ভৃত্যের খুন হওয়া

৯

ভৃত্যের অপ্রত্যাশিত অশরীরী উপস্থিতি

ওপরের ছক থেকে দেখা যাচ্ছে গল্পের মূল তিনটি মুভমেণ্টের মধ্যে মোট নটি সুর রয়েছে। প্রথম পর্বে চারটি সুর, দ্বিতীয় পর্বে দুটি সুর, এবং তৃতীয় পর্বে তিনটি সুর।

সত্যজিতের চলচ্চিত্রের মত গল্পটির ইনার ম্যাজিকটা উঠে আসছে তিনটি মুভমেণ্টের এই নটি সুরের বুনন-পট থেকে।

ওপরের ছকে যা বলার চেষ্টা করেছি তা হল, প্রথম মুভমেণ্টের চারটি সুর (১, ২, ৩, ৪) দ্বিতীয় মুভমেণ্টের ৬ নম্বর সুরে পাচ্ছে ঐকতানের পরিণতি। তারই পাশাপাশি দ্বিতীয় মুভমেণ্ট বেজে উঠছে, প্রায় অলক্ষ্যভাবে, ৫ নম্বরের উপসুরটি।

সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হল, প্রথম পর্বেব চারটি সুর এবং দ্বিতীয় পর্বের ছ নম্বর সুরটি নিয়ে একেবারে একটি আলাদা সম্পূর্ণ গল্প নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ স্টোরি উইদিন এ স্টোরি।

দ্বিতীয় পর্বের ৫ নম্বর সুরটি থেকে আরও একটি নতুন গল্প শুরু হচ্ছে। এই গল্পটি তৃতীয় মুভমেন্টের তিনটি সুরে বিস্তারিত হয়ে, ৯ নম্বরে পাচ্ছে চূড়ান্ত পরিণতি। লক্ষণীয় যে, প্রথম পর্বের চারটি 'সেমি-প্রিন্সিপাল থিম', দ্বিতীয় পর্বের 'প্রিন্সিপাল থিম' (৬)-এর যে ভাবে পরিণতি পাচ্ছে, ঠিক সেইভাবেই দ্বিতীয় মুভমেন্টের একটি মাত্র 'সেমি-প্রিন্সিপাল থিম' (৫) ভেঙে যাচ্ছে অন্তিম পর্বের তিনটি সুরের মধ্যে, যার মধ্যে ৯ নম্বরটি ফিনালে।

সত্যজিতের ম্যাজিকটা কোথায় জানেন? গল্পের প্রথম মুভমেন্টের চারটি সুরের সিন্‌থেসিস থেকে জন্ম নিচ্ছে দ্বিতীয় মুভমেন্টের একটি মাত্র সুর (৬)। আর দ্বিতীয় মুভমেন্টের উপসুরের (৫) অ্যানালিসিস থেকে বেরিয়ে আসছে অন্তিম পর্বের তিনটি আলাদা সুর।

সাঙ্গীতিক স্ট্রাকচারের এই প্রেতকাহিনীর অন্তিম মূর্ছনা মিশে যায় বিস্ময়কর ইতিহাস চেতনায়। গল্পের শেষে সাহেব-প্রভুর লাথি খেয়ে মরে যাওয়া পাংখাবরদারের ভূত প্রায় আশি বছর ধরে রাতদিন পাখা টেনে যায়—পাছে সাহেবের আরেকটি লাথিতে মুছে যায় তার ভৌতিক অস্তিত্বও। এই ভয় এবং হীনম্মন্যতা যেন সমগ্র ভারতের, যেন সাহেবের লাথির কোনও শেষ নেই, যেন আমরা বার বার মরেও আবার মরে যেতে পারি, যেন আমাদের প্রেত-অস্তিত্বের শেষ সম্বলটুকুও লুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

পাংখাবরদারের প্রেতাত্মা যেন সমগ্র আধুনিক ভারতের প্রেতচ্ছায়া।

।। ১৮ ।।

সত্যজিৎ রায়ের গল্প আমাদের পড়তে ভাল লাগে কেন, কেন একবার পড়ার পরেও বারবার তাঁর গল্পের কাছে ফিরে আসি আমরা, এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা কিন্তু সহজ নয়। সত্যজিৎ-চলচ্চিত্র এবং সত্যজিৎ-সাহিত্যের এমন কতকগুলি গুণ আছে যা পরিচালক এবং লেখক হিসেবে তাঁকে জনপ্রিয় করেছে। তাঁর প্রধান গুণ হল ভাষার স্বাভাবিক সহজতা। অর্থাৎ সাহিত্য ও সিনেমার ভাষায় সত্যজিৎ আশ্চর্য নির্ভার ভঙ্গিতে গল্প বলতে পারেন। তিনি মূলত গল্প-বলিয়ে, কী সিনেমায়, কী সাহিত্যে। বাংলা সিনেমায় ভাষা নিয়ে তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকলেও কখনও গল্প বলা থেকে সরে যান নি। অথাৎ তাঁর চলচ্চিত্রের কাঠামোবিশ্লেষণ সম্ভব নয় কাহিনীর স্ট্রাকচারকে বাদ দিয়ে।

সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের ভাষা নিয়ে যে-ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, ভঙ্গি ও শৈলীর ব্যাকরণ নিয়ে 'পথের পাঁচালী', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন,' কিংবা 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'র মত ছবিতে মাথা ঘামিয়েছেন, গল্প লেখার বেলায় ততটা করেন নি। 'পিকুর ডায়রি' নামের ছোটগল্পটি একমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে একটি শিশুর মত করে তিনি বাংলা গদ্যকে লিখেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'পিকু' ছবিতে কিন্তু চলচ্চিত্রের ভাষা ও ভঙ্গিতে তিনি তেমন কোনও অভিনবত্ব আনার চেষ্টা করেন নি। 'পিকুর ডায়রি' গল্পে সম্পূর্ণভাবে পিকুর চোখ দিয়েই বড়দের জগৎকে দেখা হচ্ছে। 'পিকু' চলচ্চিত্রে পরিচালক নিজেই একটি গল্প বলছেন যার কেন্দ্রবিন্দু পিকু। অর্থাৎ ছবিটা তিনি এমনভাবে করেছেন যাতে সিনেমার ভাষা ও শৈলী নিয়ে পরীক্ষার কোনও প্রয়োজনই না থাকে। ইচ্ছে করলে পিকুর দৃষ্টিকোণ থেকে ছবিটা করার চেষ্টা করা যেতে পারত। ভিশুয়ালস থেকে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল সবকিছুকে করে তোলার চেষ্টা করা যেত একান্তভাবে পিকুর। অর্থাৎ পিকু যে-ভাষায়, যে-ভঙ্গিতে ডায়রি লিখেছে, সেই খাপছাড়া, ব্যাকরণহীন, আনমনা ভঙ্গিতে সে যেন নিজেই ছবিটা করতে পারত। আমরা ভেবে নিতাম পিকুর হাতে এবার কলম কিংবা

পেনসিলের বদলে সত্যজিৎ তুলে দিয়েছেন একটি মুভি ক্যামেরা। তা যদি হত, তাহলে কিন্তু 'পিকু' ছবিটি 'পিকুর ডায়রি'র চেয়েও ভাষায়, ভঙ্গিতে পরীক্ষামূলক হত এবং অবশ্যই হয়ে উঠত পুরোপুরি দুর্বোধ্য। সত্যজিৎ রায়ের মেজাজ এই দুর্বোধ্যতারই বিরোধী। তাঁর ভাবনা চিন্তার মধ্যে এমন একটা স্ফটিক-স্বচ্ছতা আছে এবং তাঁর মন পরিমিতিবোধের দ্বারা এতদূর শাসিত যে সিনেমার ভাষা নিয়ে এমন কোনও পরীক্ষায় তিনি সাড়া দিতে পারেন না যা নিঃসন্দেহে দুর্বোধ্যতাকে, অস্পষ্টতাকে প্রশ্রয় দেবে। তাঁর চলচ্চিত্রে, তাঁর সাহিত্যে তাই ভাষার ঠোক্করহীন সহজতাকে আমি প্রধান গুণ বলব। সত্যজিৎ-সাহিত্যে আর যে গুণ আমাদের আকর্ষণ করে সবচেয়ে বেশি তা হল সিনেম্যাটিক ডিটেলের কাজ, দৃশ্যকল্পের ছড়াছড়ি। তাঁর লেখা গল্প আমরা শুধু পড়ি না, দেখিও। প্রত্যেকটি চরিত্র, প্রত্যেকটি ঘটনা, এমনকি পরিবেশ পর্যন্ত শরীরী হয়ে ওঠে। তারা কী ভাবে কথা বলছে, কেমন তাদের উচ্চারণ এবং ভঙ্গি—এবং এইসব সংলাপের সঙ্গী অস্পষ্ট আলোয় দেখা কিছু বাঙময় ডিটেল—এইসব কিছু থেকে উঠে আসে তাঁর গল্পের সিনেম্যাটিক মেজাজ। আমরা যখন গল্পগুলো পড়ি তখন যে সিনেম্যাটিক অনুপুঙ্খগুলোকে আমরা সবসময় খেয়াল করি, তা নয়। কিন্তু সত্যজিৎ যেভাবে গল্পের মধ্যে বুনে দেন এই অনুপুঙ্খের জমি সেখানেই তাঁর ম্যাজিক। গল্প পড়তে-পড়তে আমাদের মন ও চোখ, এমন কি আমাদের ঘ্রাণও কাজ করে। সত্যজিতের লেখায় সিনেম্যাটিক গুণ নিয়ে অফুরন্ত আলোচনা হতে পারে। তিনি নিজে বাংলা সাহিত্যে সিনেম্যাটিক ডিটেলের অভাবের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন তা তাঁর সাজে। শুধুমাত্র 'শিবু আর রাক্ষসের কথা'র মত একটি অসামান্য গল্প থেকেই আন্দাজ করা যায় তিনি একই সঙ্গে আমাদের মন ও চোখের কাছে কতটা দাবি করতে পারেন।

এক জায়গায়, শিবু রাক্ষসদের কথা ভাবতে গিয়ে মনে মনে বলছে, তাদের মুলোর মত দাঁত, কুলোর মত কান—এরপরেই সত্যজিৎ লিখছেন, শিবু চমকে উঠল, কেন না তার মনে পড়ে গেল জনার্দনবাবুর পিঠটা ত ঠিক সিধে নয়। কেমন কুঁজো-কুঁজো কুলো-কুলো ভাব। আমি এটাকে বলব অব্যর্থভাবে সিনেম্যাটিক কাট্। অর্থাৎ যে-মুহূর্তে শিবু চমকে উঠেছে সেই মুহূর্তে তার ভয় ও ভাবনার সূত্র ধরে আমরা চলে যাচ্ছি জনার্দনবাবুর পিঠের এমন একটি মিডক্লোজ-এ যেখান থেকে তার কুঁজো-কুঁজো ভাবটা রাক্ষুসে ইঙ্গিত নিয়ে ধরা পড়ে।

আর একটি দৃশ্যে জনার্দনবাবু ব্ল্যাকবোর্ডে একটা অঙ্ক লিখেই কেমন জানি অন্যমনস্ক হয়ে তাঁর চশমাটা খুলে সেটা চাদরের খুঁট দিয়ে মুছতে লাগলেন। আর ঠিক সেই সময় তাঁর সঙ্গে শিবুর চোখাচোখি হয়ে গেল। শিবু যা দেখলে তাতে তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। জনার্দন-বাবুর চোখের সাদাটা সাদা নয় সেটা লাল। টকটকে লাল।

সত্যজিৎ এখানে গুনে গুনে কথা খরচ করেছেন। এবং কথার সীমিত ফ্রেমে তিনি এমন কয়েকটা আলাদা আলাদা ভিশুয়াল ফুটিয়ে তুলেছেন যা একেবারে সিনেমার। আমরা শিবুর অ্যাঙ্গেল থেকে প্রথমে জনার্দনবাবুকে দেখছি পিছন ফিরে বোর্ডে অঙ্ক লিখতে। তারপর শিবুর দিকে ফিরে তিনি চশমাটা খুলে মুখ নিচু করে চশমার কাচ চাদরের খুঁট দিয়ে মুছছেন। তারপর সেই নাটকীয় ভিশুয়াল যেখানে শিবুর সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হচ্ছে। জনার্দনবাবুর চোখের ক্লোজআপ—রঙ লাল। এই দৃশ্যের নাটকীয়তা সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠেছে সিনেম্যাটিক ভিশুয়ালের মাধ্যমে। বলা যেতে পারে সাহিত্য এখানে সিনেমাকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে।

জনার্দনবাবুর চোখের টকটকে রাগী লাল থেকে ঠিক প্রায় পরের লাইনে সত্যজিৎ রায় কাট্ করে চলে যাচ্ছেন মিত্তিরদের বাগানের স্নিগ্ধ সবুজ দৃশ্যে। শিবুর সহজ-সরল জীবন, তার ছোট ছোট মজাগুলোকে দুটি কি তিনটি ভিশুয়ালের মাধ্যমে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যজিৎ যে 'পথের পাঁচালী'র ডিরেক্টরকে আমাদের চিনে নিতে ভুল হয় না। আমরা শিবুর জায়গায় অপুকে দেখতে পাই। সাড়ে আট লাইনে টুকরো-টুকরো ছবির মাধ্যমে এইভাবে সত্যজিৎ ছোট্ট একটি

গ্রাম্য ছেলের খেলা আর মজাকে ফুটিয়ে তোলেন : এক, মিত্তিরদের বাগানের সবুজ, জনার্দনবাবুর রাগী লাল চোখের পরেই। দুই, বাগানের মধ্যে ছাতিমগাছের গুঁড়ির ক্লোজআপ। তিন, গুঁড়ির আশপাশে অনেকগুলো লজ্জাবতী লতার ওপর দিয়ে ক্যামেরা বয়ে যায়। চার, একটি ছোট্ট ছেলের আঙুল টোকা মেরে মেরে লজ্জাবতীগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। পাঁচ, লজ্জাবতী থেকে কাট্ করে চলে যাওয়া হচ্ছে একটি দীঘির পাড়ে। বাগান-দৃশ্যের পরে এই দৃশ্যটিতে যেন আরও স্নিগ্ধতা, আরও সারল্য। জনার্দনবাবুর রাক্ষুসে অভিব্যক্তিগুলির সিনেম্যাটিক ফয়েল হিসেবে যেন ব্যবহার করা হয়েছে বাগান আর দীঘি। এরপর শিবুকে দেখছি খোলামকুচি দিয়ে দীঘির জলে ব্যাঙবাজি করছে। এরপরেই বাগান আর দীঘির লাবণ্য থেকে সত্যজিৎ দুম করে সরে যাচ্ছেন থরে থরে সাজানো ইঁটের পাঁজার ওপর, যেখানে শিবুকে আমরা দেখছি জিমন্যাস্টিক করতে। আমার মনে হয় না এই লাইনগুলো সত্যজিৎ কলম দিয়ে লিখেছেন, ক্যামেরার প্রভাব এখানে এতটাই সর্বগ্রাসী। যে দৃশ্যে জনার্দনবাবু বই-ছাতা ফেলে দিয়ে খপ্ করে একটা ছাগলের বাচ্চাকে জাপটে ধরে কোলে তুলে নিচ্ছেন আর শিবু শুনতে পাচ্ছে একই সঙ্গে ছাগল-ছানার চিৎকার এবং জনার্দনবাবুর হাসি, সেই দৃশ্যটি ভিশুয়াল ও শব্দের ব্যবহারে অব্যর্থভাবে সিনেম্যাটিক। একটা মারাত্মক ডিটেল সত্যজিৎ খুব হেলাফেলার ভঙ্গিতে একটি ছোট্ট ভিশুয়াল-এ তুলে ধরেছেন : সে (শিবু) লক্ষ্য করল যে, ছাগলগুলোকে দেখতে দেখতে জনার্দনবাবু দুবার তাঁর ডান হাতটা উপুড় করে ঠোঁটের নিচে বুলোলেন। জনার্দনবাবু যে রাক্ষস এবং তিনি যে ছাগল বাচ্চাটাকে জ্যান্ত চিবিয়ে খাবেন, এ-বিষয়ে জনার্দনবাবুর জিভে জল দেখে শিবুর মনে আর কোনও সংশয় থাকে না। সত্যজিতের 'অদৃশ্য' ক্যামেরা কিন্তু শিবুর দৃষ্টিকোণ থেকে এতটুকু নড়ে না। ফলে, সত্যিই জনার্দনবাবু ছাগলটাকে খাচ্ছেন কিনা সেটা ইঁটের-পাঁজার আড়ালে থেকে যায়। এখানেই এই দৃশ্যের সিনেম্যাটিক ম্যাজিক। এরপর শিবুকে আমরা ভয়ে পালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে দেখছি। সত্যজিৎ মুহূর্তে তাঁর 'অদৃশ্য' ক্যামেরাকে সরিয়ে আনছেন জনার্দনবাবুর অ্যাঙ্গেলে। জনার্দনবাবু শিবুর পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, কিন্তু ইঁটের পাঁজার আড়ালে তাকে দেখতে পাচ্ছেন না, সুতরাং প্রশ্ন করছেন, কে ওখানে? এই প্রশ্ন করার সময় আমরা, অর্থাৎ, দর্শকরা (আমরা এখানে পাঠক নই, অবশ্যই দর্শক) জনার্দনবাবুকে এমনভাবে ছাগলটিকে ধরে থাকতে দেখি যে তিনি সত্যিই ওটাকে যে খেয়ে ফেলবেন না সে বিষয়ে আমরাও শিবুর মত নিশ্চিত হতে পারি না। কথা দিয়ে এইভাবে সিনেমা দেখানো সহজ নয়।

সত্যজিৎ গল্পের পর গল্পে কিন্তু এই কান্ডটা ঘটিয়ে যাচ্ছেন। আর একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই ঐ একই গল্প থেকে।

সত্যজিৎ লিখছেন : 'শিবু দেখল তার হাঁটু ছড়ে গিয়ে সামান্য একটু রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে, আর জনার্দনবাবু এক দৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রয়েছেন, আর তাঁর চশমার কাচ দুটো জ্বলজ্বল করছে।' সেইদিনই রাত্তিরে আবার শিবু ঘুমিয়ে পড়বার আগে জানলা দিয়ে দেখতে পায় চাঁদের আলোয় জনার্দনবাবুর চিক্‌চিকে চশমা তার বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। আমি বাংলা সাহিত্যে এমন অসামান্য সিনেম্যাটিক ভিশুয়াল বেশি দেখিনি। চশমার কাচের ওপর চকচকে আলো যে সিনেমার পর্দায় কী বাঙময় ভিশুয়ালে পরিণত হতে পারে তার একটি উদাহরণ আমরা দেখেছিলাম 'উইটনেস ফর প্রসেকিউশন' ছবিতে চার্লস লটন-এর চশমার রিফ্লেকশনে। আর একটি উদাহরণ সম্প্রতি দেখলাম 'ঘরে-বাইরে' ছবির সেই দৃশ্যে যেখানে মাস্টারমশাইয়ের ব্যক্তিত্ব চশমার জ্যোতি হয়ে সন্দীপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'শিবু আর রাক্ষসের কথা' গল্পটি থেকে সত্যজিতের লেখার আর একটা মজার দিক আমি তুলে ধরতে চাই যেখানে তিনি অনায়াস ভঙ্গিতে ছোটদের মনের হদিস পেয়ে যান মুহূর্তে। সুকুমার

রায়ের পরে আমি আর কোনও বাঙালী লেখকের দেখা পাই নি যিনি 'অ্যাবসার্ড'-এর বোধে সত্যজিতের প্রতিযোগী হতে পারেন।

প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে সত্যজিৎ কিন্তু তাঁর চলচ্চিত্রে (গুপী গাইন একমাত্র ব্যতিক্রম) তাঁর 'অদ্ভুতবোধ'কে এত বিস্তৃতভাবে কাজে লাগান নি। 'শিবু আর রাক্ষসের কথা'য় ফটিক যে-ভাবে হুঁকোর মধ্যে ডাবের জল ভরে তাতে মনে হয় এ-ঘটনা যেন আমরা রাতদিন দেখছি। অ্যাবসার্ডকে অ্যাবসার্ড বলে চিনতেই দেন না সত্যজিৎ। এইভাবেই তিনি সুকুমারের উত্তরসূরি। আবার যেখানে শিবুর মনে পড়ে ফটিকদা বলেছে বাদুড় মাথা নিচু করে ঝুললেও তার মাথায় রক্ত ওঠে না কেন সেটা শিবুকে সে বুঝিয়ে দেবে, সেখানে সত্যজিতের সেন্স অফ দ্য অ্যাবসার্ড নিঃসন্দেহে চূড়ান্তভাবে সোচ্চার। ঐ একই গল্পে ম্যাককার্ডি সাহেবের ছিপ দিয়ে মাছ ধরার প্রসঙ্গ আসে এত সহজ এবং নিরুত্তাপভাবে যে মনে হয় সুকুমার রায়ই ঐ দৃশ্যকল্পটি সত্যজিতের কলমে বসিয়ে দিয়েছেন। আর এক জায়গায় ফটিক বলছে, আমার হুলোটার আবার নস্যির বাতিক হয়েছে। অদ্ভুতরস থেকে উঠে আসা এই টুকরো-টুকরো মজা বাংলা সাহিত্যে প্রায় তুলনাহীন। অদ্ভুতরসে সত্যজিৎ কতদূর অনায়াস তা আমরা মুহূর্তে বুঝতে পারি যখন ফটিক বলে : 'ওঁর (জনার্দনবাবু) কুষ্ঠীটা জানতে হবে। আমি এখনও সিওর নই। কুষ্ঠী দেখলে সব বেরিয়ে যাবে। বাক্স-প্যাটরা ঘাঁটলে কুষ্ঠীটা বেরোবে নিশ্চয়ই।' কুষ্ঠী থেকে জনার্দনবাবু রাক্ষস কিনা এটা বের করে ফেলার আইডিয়া 'অ্যাবসার্ড'-এর মজাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যেখান থেকে সত্যজিতের অদ্ভুতরসবোধের অতুলনীয় পরিচয় পাচ্ছি আমরা। পরের ব্যাপারটা আরও মজার। ফটিক কুষ্ঠী থেকে বের করে ফেলেছে, জনার্দনবাবু শুধু রাক্ষসই নন, তিনি 'পরিন্ডি' রাক্ষস। আমাদের দুঃখ সত্যজিৎ তাঁর 'সেন্স অফ দ্য অ্যাবসার্ড'কে আরও বিস্তৃতভাবে চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেন নি। পর্দায় ভিশুয়ালস-এর মাধ্যমে অদ্ভুতরসের সঞ্চারের তাগিদ সত্যজিৎ যদি কোনদিন উপলব্ধি করেন, আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধের কাছে তাঁর দাবি সেদিন আরও জোরদার হবে।

।। ১৯ ।।

'শিবু আর রাক্ষসের কথা'র মত একটি অসামান্য ছোটগল্পের শৈলী এবং ভঙ্গি নিয়ে আলোচনার পরেও এমন একটি জরুরী প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যাকে এড়িয়ে যাওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। সম্ভব নয়, কেননা, প্রশ্নটিই গল্পটির মেরুদণ্ড। এবং প্রশ্নের প্রত্যেকটি সম্ভাব্য উত্তর গল্পটিকে আয়নার মধ্যে আয়নার মত ফুরিয়ে যেতে দেয় না। 'শিবু আর রাক্ষসের কথা' যে একাধিক সম্ভাবনায় ক্রমান্বিত হতে থাকে, কাহিনীর অন্তিম অ্যামবিভ্যালেন্স যে আমাদের কল্পনাকে আরও বিস্তৃতভাবে প্রশ্রয় দেয়, সেখানেও কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের গল্প বলার ভঙ্গি এবং কায়দারই পরিচিতি রয়েছে নিঃসন্দেহে। এটা কিন্তু সিনেম্যাটিক টেকনিক নয়। নিছক সাহিত্যশৈলী, যার জোরে 'শিবু আর রাক্ষসের কথা'র চমৎকারিত্ব।

যে প্রশ্নটি গল্পের ব্যঞ্জনাকে প্রিজম-এর মত বিচ্ছুরিত করে তা হল, জনার্দনবাবু কি সত্যিই রাক্ষস, না কি কল্পনাপ্রবণ ছোট্ট শিবু 'পাগল' ফটিকদার আজগুবি সব ইঙ্গিত আর ইশারা থেকে জনার্দনবাবুকে রাক্ষস বলে ধরে নিচ্ছে বলেই তার মধ্যে একে একে রাক্ষসের ভয়ংকর লক্ষণগুলি সে আবিষ্কার করছে ?

এ-প্রশ্নটি একা আসে না। সঙ্গে আরও কয়েকটিকে টেনে নিয়ে আসে। যেমন, শিবু কি নিজেই এক ধরনের প্যারানইয়ায় ভুগছে না? তার রাক্ষস-আতঙ্ক কি সদানন্দের পিঁপড়ে-আনন্দের

(সদানন্দের খুদে জগৎ') মতই মানসিক অসুস্থতারই লক্ষণ নয়? আর ফটিক, তাকে কি সত্যিই অত সহজে পাগল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়? ফটিকের পাগলামি আর প্রোফেসার হিজিবিজবিজের প্রতিভা—এ দুয়ের মধ্যে কোথাও কি কোনও যোগসূত্র নেই? 'শিবু আর রাক্ষসের কথা' গল্পটিকে আমার যে ভাবে বুঝতে ভাল লাগে তা অনেকটা এই রকম। ষাটের দশকের প্রথম দিকে লেখা এই গল্প যখন পড়ি তখন আমি কলেজের ছাত্র। বাইশ-তেইশ বছর পরে প্রায় একইভাবে গল্পটি আমাকে নাড়া দেয়, ভাবায়। এবং এখনও গল্পটি আমার কাছে শেষ হয়েও শেষ হয় না।

বিশ-বাইশ বছর আগে গল্পটি যখন প্রথম পড়ি, আমার বিশ্বাস করতে ভাল লেগেছিল যে জনার্দনবাবু সত্যিই রাক্ষস! জনার্দনবাবুর কুঁজো পিঠ, টকটকে লাল চোখ, নাকি সুরে কথা, ছাগশিশু দর্শনে জনার্দনের ঠোঁটের পাশে জল—এই সব লক্ষণ থেকে ছোট্ট শিবু যা ভেবে নিচ্ছে, তা উঠে আসছে এমন এক তীব্র, নির্ভেজাল কল্পনার জমি থেকে যা আমরা বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে ফেলি, আর যাঁরা হারান না সেই সব রবীন্দ্রনাথ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্লেক কিংবা ইয়েটস-এর লেখায় আর ছবিতে প্রচ্ছন্নভাবে গুমরে ওঠে শিশুমনের আতঙ্ক, বিশ্বাস, স্বপ্ন। পৃথিবীতে পরীদের ডানার শব্দ শোনা যায় কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে ল্যান্ডর বলেছিলেন, "টার্ন বাট এ স্টোন অ্যান্ড স্টার্টস এ উইং"। শুধু প্রয়োজন, শোনার মত কান, দেখার মত চোখ, বোঝার কত মন। কবি, পাগল আর শিশুরাই হয় এই তৃতীয় শ্রবণ যন্ত্র, নেত্র আর মনের অধিকারী। শিবু এবং 'পাগল' ফটিক যেন এই তৃতীয় চোখ দিয়েই আবিষ্কার করে যে জনার্দনবাবু রাক্ষস। আর সদানন্দ তার তৃতীয় কান দিয়েই যেন শুনতে পায় পিঁপড়েদের গান। দুটি গল্পের একটিতে শিশু মনের প্যারানইয়া, অন্যটিতে শিশু মনের মিস্টিসিজম্। ছোটদের মিস্টিক অভিজ্ঞতা কোন পথে কত দূরপ্রসারী হতে পারে, এই বিষয়টি নিয়ে নিজের গল্প থেকে একটি ছবিও করেছেন সত্যজিৎ। নাম 'সোনার কেল্লা'। ছবিটি প্রসঙ্গে আলোচনায় পরে আসছি। শিশু মনের আতঙ্ক—এই ভয়ঙ্কর বিষয়টি নিয়ে সত্যজিৎ কিন্তু এখনও কোনও ছবি করেন নি। যদিও তাঁর ছোটগল্পে বিষয়টির বীজ ছড়িয়ে আছে নানা ভাবে।

* * *

ছোটদের জন্যে প্রেমের গল্প আমাদের দেশে খুব বেশি লেখা হয় নি। প্রেমের গল্পের যাঁরা তুখড় লিখিয়ে তাঁরাও কিন্তু শিশু-সাহিত্যে চট করে প্রেম ঢোকাতে দ্বিধা করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, ১৯৮৪-র মে মাসে সত্যজিৎ রায় এমন একটি ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী লেখেন যা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেতে পারে। গল্পটির নাম 'তারিণী খুড়ো ও লখনৌর ডুয়েল'।
এমন গল্প কেউ লিখব বলে লিখতে পারে না। এমন গল্প নিজেরাই নিজেদের লেখে। এবং শুধুমাত্র স্টাইল, ভঙ্গি এবং বিষয়ের জোরে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যায় যেখানে সাহিত্যিক বিচার ছাড়া অন্যান্য মাপকাঠি বিকল হয়ে পড়ে। এ গল্প যদি সত্যজিৎ বড়দের পত্রিকার জন্যে লিখতেন তাহলে নির্ঘাত ভাবে ত্রিকোণ প্রেমের চরিত্র উদ্ঘাটন হত আরও মর্মান্তিক ডিটেলে। সত্যজিৎ কিশোর-কিশোরী পাঠকদের কথা ভেবেই একটি মারাত্মক আগ্নেয়গিরিকে এমনভাবেই ঢেকে রেখে দিয়েছেন যে ঐ আবৃতকরণই গল্প কিংবা শিল্প হয়ে উঠেছে। আপাতভাবে তারিণী খুড়োর এই গল্পটিও ভূতের গল্প। কিন্তু আমি এটিকে প্রেমের গল্প হিসেবেই দেখব। কারণ সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই সত্যজিৎ-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাবে আরও বিস্তারিত ভাবে।

সত্যজিতের দৃষ্টিতে নারী—এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। সেই

আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে 'তারিণী খুড়ো ও লখনৌর ডুয়েল'-এ অ্যানাবেলা হাডসনের কথা না বললে। নিঃসন্দেহে অ্যানাবেলা সত্যজিতের নিষ্ঠুরতম নারী। এবং প্রেমের খেলায় সবচেয়ে তুখড়, সবচেয়ে অ-নৈতিক। আশ্চর্যের কথা, এই মেয়েটির জন্যে সত্যজিৎকে আর কারোর কাছে ঋণী হতে হয় নি, যেমন হতে হয়েছে বিমলা, চারুলতা কিংবা করুণার জন্যে।

অ্যানাবেলার প্রসঙ্গে আসার আগে তার প্রেমকাহিনী নিয়ে গল্পটির নির্যাস এখানে দিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তারিণী খুড়ো তখন লখনৌতে। একদিন নিলামে একটি সুন্দর বাক্সের মধ্যে পোরা একজোড়া পিস্তল কিনলেন খুড়ো। সেদিনই রাত্রে খুড়োর বাড়িতে এক সাহেবের উদয়। সাহেব পিস্তলটা দেখতে চাইল কারণ ওটা নাকি তার এক চেনাশোনা লোকের। সাহেবের কাছ থেকে খুড়ো জানতে পারে এই পিস্তল দিয়ে এক ডুয়েল লড়া হয়েছিল দেড়শ বছর আগে এই লখনৌ শহরেই। ডুয়েলটা হয়েছিল এক ইংরেজ আর্টিস্ট এবং ইংরেজ জেনারেলের মধ্যে। অ্যানাবেলাকে বিয়ে করার জন্য এই ডুয়েল। যেহেতু গল্পটি ভূতের গল্প, গল্পের শেষে পরপর তিনটে সারপ্রাইজকে আমি এই নির্যাসের মধ্যে এনে গল্পটাকে মাঠে মারছি না।

গল্পে রয়েছে তিনটি পুরুষ চরিত্র। এবং এরা সবাই অ্যানাবেলার প্রণয়প্রার্থী। তৃতীয় পুরুষটির কথা সত্যজিৎ আমাদের প্রথম থেকে কিছু বলছেন না। এই তিনটি পুরুষকে নিয়ে অ্যানাবেলা যে খেলাটা খেলছে সেকথা একটু ভালভাবে ভেবে দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে এর চেয়ে সিনিক্যাল গল্প সত্যজিৎ আর কখনও লেখেন নি। প্রেম এবং যৌন কামনা একটি মেয়েকে কত ভয়ংকর করে তুলতে পারে অ্যানাবেলা তার চরম উদাহরণ। 'কাপুরুষ'-এর করুণা, 'ঘরে-বাইরে'র বিমলা, 'চারুলতা'র চারু, কারুর মধ্যেই সুপ্ত বাসনা এমন ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়নি যেমন আমরা অ্যানাবেলার মধ্যে দেখতে পাই। হয়ত তার স্যাক্সন রক্তের উষ্ণতার কথা ভেবেই সত্যজিৎ তাকে এইভাবে গড়েছেন। তবু সত্যজিতের চোখে রোম্যান্টিক প্রেমের কথা লিখতে গেলে অ্যানাবেলার কথা ভুলে গেলে চলবে না। একটি মেয়ে কত সহজে তিনটি পুরুষকে নিয়ে খেলা করতে পারে, কত নির্দ্বিধায় প্রেম এবং বাসনার চাহিদা মেটাতে সে হতে পারে খুনী, সত্যজিৎ এই বীভৎস সত্যকে তুলে ধরেছেন ছোটদের জন্যে লেখা একটি গল্পে। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর মহত্ত্ব এই গল্পের গভীরপ্রসারী ইঙ্গিতময়তায়। কিশোর-পাঠ্য এই প্রেমের গল্পে এমন কিছুই নেই যাতে অতিমাত্রায় শুচিবায়ুগ্রস্ত অভিভাবকের মনেও খটকা লাগতে পারে। অথচ, নিঃসন্দেহে এই গল্পের সত্যজিৎ প্রেমের উচ্চারণে এবং নারীর চরিত্রায়ণে দুর্বার ভাবে সাহসী, মৌলিক এবং সিনিক্যাল। 'জনঅরণ্য' ছবিতে সোমনাথের বন্ধুর বোনের যে ছবি সত্যজিৎ এঁকেছেন তার সিনিসিজমই একমাত্র অ্যানাবেলা-চরিত্রায়ণের মেজাজের প্রতিযোগী হতে পারে। 'তারিণী খুড়ো ও লখনৌর ডুয়েল' পড়ে আমার বারবার মনে হয়েছে শরীর-তাড়িত প্রেমের নিষ্ঠুর তুখড় খেলায় অ্যানাবেলা ব্রাউনিং-এর কবিতার প্রেমিকাদের নির্ভুল আত্মীয়া।

।।২০।।

ছোটদের মনও যে আকাশের মত বিস্তৃত, সমুদ্রের মত গভীর এবং অপার রহস্যময়, এই গহন উপলব্ধি থেকে উঠে এসেছে সত্যজিৎ রায়ের বেশ কিছু গল্প। ছোটদের মন নিয়ে সত্যজিতের ভাবনা যে শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জমি থেকে পুষ্টি পেয়েছে তা নয়। তাঁর মনোবিকলনের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে মিস্টিক চেতনা। ফ্রয়েড বা ইউং যেখানে পা ফেলতে ভয় পান, গহন মনের সেই অনিশ্চিত, অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রও তিনি তাঁর ছোটগল্পে আচমকা উদ্ভাসিত করে তোলেন। মিস্টিক চেতনার অপ্রত্যাশিত মিরাকেল ছাড়া এ-জিনিস সম্ভব হত না।

সত্যজিৎ রায় কবি নন। কবিদের ছকে বাঁধা চেনা চেহারার ছাপ তাঁর ব্যক্তিত্বে বিপুলভাবে অনুপস্থিত। তাঁর লেখায়, চলচ্চিত্রে, সংলাপে এবং ব্যক্তিত্বে অনায়াস স্বচ্ছতা, ঋজু লজিক্যালিটি এমনভাবে কবি ও কবিতার পক্ষে প্রয়োজনীয় রহস্যময় অ্যাম্বিগুইটির বিরোধিতা করে যে, সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে মিস্টিক চেতনার উদ্ভাস খুঁজতে অনেকেই হয়ত দ্বিধাবোধ করবেন। কিন্তু সত্যজিতের লেখা, আঁকা এবং চলচ্চিত্র তাদের বিশেষ মেজাজ, শরীর ও চরিত্র নিয়ে 'হয়ে উঠতে' পারত না মিস্টিক ব্যঞ্জনার প্রসারিত তরঙ্গ ছাড়া।

সত্যজিৎ রায় কবি—এই সংক্ষিপ্ত বার্তাটি হাজার পথে, বিচিত্র দ্যোতনায় আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়। হয়ত সবচেয়ে নির্ভুল, অনস্বীকার্যভাবে তাঁর রচিত আবহসঙ্গীতের মাধ্যমে। আরও সূক্ষ্মভাবে তাঁর চলচ্চিত্রের কাব্যগুণ ধরা পড়ে শব্দের ব্যবহারে, এক একটি দৃশ্যের কম্পোজিশনে, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার ভঙ্গিতে, এবং প্রতিটি চলচ্চিত্রের মেজাজে, শরীরের গঠনে। তিনি যে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর চলচ্চিত্রে কাব্যগুণ নিয়ে আসার প্রয়াসী, এমন কথা আমার মনে হয় না। বরং, তাঁর প্রকাশভঙ্গির সাবলীল স্বচ্ছতা এবং ভাবনার ঋজু ভঙ্গি পোয়েটিক অ্যাম্বিভ্যালেন্সের সরাসরি বিরোধিতাই করে। অনিশ্চিত ব্যঞ্জনা-বিরোধী এই মনের দাবি মেটাতেই তিনি 'ঘরে-বাইরে'তে শেষ পর্যন্ত বিমলাকে বিধবা সাজিয়েছেন। নিখিলেশের শেষ পরিণতিকে ঘিরে রাবীন্দ্রিক অ্যাম্বিগুইটিকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। 'ঘরে-বাইরে'র সত্যজিৎকে তাই 'সদানন্দের খুদে জগৎ'-এর লেখক বলে চিনতে আমার কষ্ট হয়। আমি সত্যি সত্যিই যন্ত্রণা পাই। কোনও কবির পক্ষেই সম্ভব নয় 'সদানন্দের খুদে জগৎ'-এর মত একটি গল্প লেখা। এবং কোনও অ-কবি, কোনও নিদারুণভাবে অ-কবির পক্ষে সম্ভব 'ঘরে-বাইরে'র অন্তিম দৃশ্যের নিঃসাড়, নিস্পন্দ গদ্যময়তা। স্ববিরোধিতার এই আশ্চর্য নির্যাসের মধ্যেই হয়ত ভবিষ্যতের কোনও গবেষক সত্যজিতের এক অনাবিষ্কৃত পরিচয় খুঁজে পাবেন।

ছোটদের মন কীভাবে ভয় পায়, কীভাবে যন্ত্রণা পায়, কোন্ পথে গড়ে ওঠে খুদে মনের প্যারানইয়া—এই বিষয়টি নিয়ে 'শিবু আর রাক্ষসের কথা' নামে সত্যজিতের অসামান্য গল্পটির বিষয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। এরই পাশাপাশি রাখা যায় 'সদানন্দের খুদে জগৎ' নামের গল্পটিকে। দুটিই গভীরভাবে মনোবিশ্লেষণী গল্প। এবং এই বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মিস্টিক চেতনার আশ্চর্য সমন্বয়। দ্বিতীয়ত, একটি গল্পের বিষয় ছোট্ট মনের ভয়। অন্যটির বিষয় ছোট্ট মনের আনন্দ। যেন একই মনের এপিঠ-ওপিঠ। ছোট্ট মনের আতঙ্কের মধ্যেও যেমন লজিক-বিরোধী সর্বগ্রাসিতা, তেমনি ছোট্ট মনের আনন্দের মধ্যেও সর্বব্যাপী তীব্রতা। বড়দের মন ভয়ের এই সর্বগ্রাসিতার, এবং আনন্দের এই সর্বব্যাপিতার নাগাল পায় না। তৃতীয়ত, শিবু এবং সদানন্দ দুজনেই একা, নিঃসীমভাবে নিঃসঙ্গ। একজন ভয়ের জগতে। অন্য-জন আনন্দের জগতে। এই একাকিত্ব, এই নির্বাসনের কারুণ্য কত স্পর্শময়ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যজিৎ! চতুর্থত, শিবু এবং সদানন্দের যথাক্রমে আতঙ্ক ও আনন্দকে ঘিরে ছড়িয়ে আছে উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ, যাকে নিঃসন্দেহে বলা চলে প্যাস্টোরাল। ঠিক যেমন দেখেছি আমরা 'পথের পাঁচালী'তে অপু আর দুর্গার জগৎকে ঘিরে। শিশুমনের মিস্টিক বিশ্লেষণের জন্যে যে একান্ত প্রয়োজনীয় এই প্যাস্টেরাল পরিবেশ—এ-কথা সত্যজিৎ গভীরভাবে উপলব্ধি না করলে প্রকৃতির সঙ্গে শিবু, সদানন্দ এবং অপু-দুর্গার গভীর-প্রসারী সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারতেন না। একান্ত-ভাবে শহুরে ছেলে পিকু। কিন্তু তার অস্পষ্ট যন্ত্রণা এবং অসীম নিঃসঙ্গতার সঙ্গেও 'পিকু' ছবিটির শেষ দৃশ্যে সত্যজিৎ যেভাবে প্রকৃতিকে বুনে দেন তা শুধু একজন কবির পক্ষেই সম্ভব। শিবু, সদানন্দ, অপু, দুর্গা এবং পিকু—এইসব ছোট ছোট মনের গুমরে ওঠা ব্যথা, এবং নিঃসঙ্গতা যেভাবে কাজ করে চলেছে তারই যেন ক্যাথারসিস রচিত হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে। প্রকৃতির আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ছাড়া এরা হয়ত মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলত। অন্তত আমার এইভাবেই ভাবতে ভাল লাগে। সদানন্দের মত একটি শিশুচরিত্র বিশ্বসাহিত্যে খুব বেশি পাওয়া

যাবে বলে আমার মনে হয় না। জন ওয়েন-এর অবিস্মরণীয় ছোটগল্পে মাস্টার রিচার্ডস দশ বছর বয়েসে আত্মহত্যা করে একটি প্রাপ্তবয়স্ক বিদগ্ধ মনের ভার বহন করতে না পেরে। ওয়েন-এর রিচার্ডস এবং সত্যজিৎ-সৃষ্ট আর্যশেখরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের কোনও গবেষক হয়ত একটি প্রবন্ধ খাড়া করতে পারবেন। কিন্তু আনন্দের জগতে সদানন্দের নির্বাসন আমার মনে হয় বিশ্বসাহিত্যে তুলনাহীন। একমাত্র ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'প্রেলিউড' এবং 'এসকারশন' কবিতায় এবং রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতায় ছোটদের মনের এই তীব্র আনন্দের বার্তা আমরা পেতে পারি। কিন্তু যে প্রশ্ন ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা রবীন্দ্রনাথ, কেউই সরাসরি তোলেন না, সত্যজিৎ এক অনিশ্চিত অ্যাম্বিগুইটির পাতাল ছায়ায় সেই প্রশ্নের বীজটি রোপণ করে দেন। প্রশ্নটি হল, পিঁপড়েদের নিয়ে সদানন্দের নিঃসীম আনন্দ, তার অনুভূতির অনন্য তীব্রতা কি মানসিক অসুস্থতা থেকেই উঠে আসছে? ওয়ার্ডসওয়ার্থের মধ্যে অবশ্যই এ ইঙ্গিত আছে যে, শিশুমনের আনন্দ যে-কোনও মুহূর্তেই রূপান্তরিত হতে পারে আতঙ্কে। রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে এবং তাঁর আঁকা ছবিতে আনন্দ ও আতঙ্ক, একস্ট্যাসি এবং প্যারানইয়া পাশাপাশি চলে। কিন্তু 'একস্ট্যাসি' যে 'প্যারানইয়ার'-ই উল্টোপিঠ, এ কথা কেউ বলেছেন বলে মনে হয় না। সত্যজিৎ খুব স্পষ্টভাবে শিবু এবং সদানন্দের মধ্যে সাহসী এবং মৌলিক বার্তাটি আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। শিবুর মনের রাক্ষস-আতঙ্ক এবং সদানন্দের পিঁপড়ে-আনন্দ, দুটোই কিন্তু উঠে আসছে মনের তীব্রতা এবং কল্পনার প্রসার থেকে, যার একটিও স্বাভাবিক সুস্থ মনের নাগালের মধ্যে পড়ে না।

সদানন্দের দাদু পাগল ছিলেন, এ কথা সত্যজিৎ গল্পের শুরুতেই জানিয়ে দেন। এবং সদানন্দও গল্পের গোড়া থেকেই প্রায় অসুস্থ। ইচ্ছে করেই সদানন্দের অসুখটাকে খুব স্পষ্ট করে তোলেন নি সত্যজিৎ। বিস্তৃত ব্যঞ্জনায় বড় স্পর্শময় এই অ্যাম্বিগুইটি। সদানন্দের অসুখ যত বাড়ে, পিঁপড়েদের নিয়ে তার আনন্দ পাবার ক্ষমতাও তত বাড়ে। এমনকি বলা যেতে পারে, ডাক্তার-বাবুদের চোখে, বড়দের বিচারে সদানন্দ আনন্দের অসুখে ভুগছে। এই অসুখের জন্যেই যেন সে শুনতে পায় পিঁপড়েদের গান, পিঁপড়েদের কথা। সুকুমার রায়ের মত বড়রাও কচিৎ কখনও শুনতে পান 'ফুল ফোটার শব্দ'। এবং মনোরোগের অপবাদ এবং নির্বাসন এড়াতে এই মিস্টিক উপলব্ধিকে আবোল-তাবোলের মুখোশ পরিয়ে দেন তাঁরা। কে বললে শুধু প্লেটোই কবিদের নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন? প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তেই আমাদের আধুনিক, ক্লিনিকাল জীবনবোধ মিস্টিক উপলব্ধিস্নাত অসংখ্য আনন্দকে নির্বাসনে পাঠাচ্ছে। প্রাপ্তবয়স্ক, প্র্যাগম্যাটিক এবং বোদ্ধা এই পৃথিবীর বিরুদ্ধে সত্যজিতের তীব্র শ্লেষ তার তিক্ততা হারিয়ে মর্মস্পর্শী বেদনা হয়ে উঠেছে সদানন্দের গল্পে। এই বিষণ্ণ বেদনার প্রেক্ষাপট ছাড়া 'সদানন্দের খুদে জগৎ' গল্পটির হৃদয়-পরিচয় পাওয়া যায় না। এবং এই পরিচয় যখন উদ্ভাসের মত বেরিয়ে আসে, গল্পটিকে সত্যজিতের 'ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি' বলতেও আমাদের দ্বিধা থাকে না। গল্পের শেষ দৃশ্যে সদানন্দ হাসপাতালে। আমরা ভেবে নিতে পারি সে মনোরোগী। তার পিঁপড়ে-আনন্দের চিকিৎসা চলছে এই হাসপাতালে। বাড়ির জন্যে মন কেমন করে তার। আমরা জানি সে কোন দিনই বাড়ি ফিরবে না। কবিরা, শিল্পীরা, আনন্দ-পাগল ভাবুকের দল, কোনদিনই বাড়ি ফেরে না। মন-কেমনের যন্ত্রণাই তাদের ঐশ্বর্য, তাদের আনন্দ, তাদের প্রেরণা।

অলৌকিকের মিস্টিক-চেতনা, সুপার-ন্যাচারাল বা অতিপ্রাকৃতিকের প্রতি রোম্যান্টিক টান সত্যজিতের গল্পে যতটা বিস্তারিতভাবে এসেছে, চলচ্চিত্রে ঠিক ততটা নয়। 'হীরক রাজার দেশ'-এ অলৌকিকের ম্যাজিকাল গুণকে ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যজিৎ। অলৌকিকের শরীরী আশ্চর্যতার দিকে তাঁর ঝোঁকটা এখানে অনেক বেশি। অলৌকিক এখানে ভিশুয়াল মজার বাহক। 'সোনার কেল্লা' উপন্যাসে একটি জাতিস্মর শিশুর মানস-রহস্য তিনি যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে সুপার-ন্যাচারালের প্রতি সত্যজিতের স্বাভাবিক ঝোঁক খুব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। 'সোনার কেল্লা'

ছবিতে গল্পের সূক্ষ্ম রণনগুলি কিছুটা স্তিমিত। সিনেমায় মানস-রহস্যের অলৌকিকতা ছাপিয়ে উঠেছে অ্যাকশনপ্যাক্‌ড্‌ থ্রিলারের উৎকণ্ঠা।

'সোনার কেল্লা'র মুকুল, 'শিবু আর রাক্ষসের কথা'র শিবু, 'সদানন্দের খুদে জগৎ'-এর সদানন্দ, এরা প্রত্যেকেই রোম্যান্টিক 'ইলিউশন' এবং তৃষ্ণায় ভুগছে। শিবু মনে মনে রাক্ষস দেখতে চাইছে বলেই সে জনার্দনবাবুর মধ্যে রাক্ষসের সব লক্ষণ দেখতে পায়। মুকুল পালাতে চায় তার পরিচিত পৃথিবী থেকে অস্পষ্ট স্মৃতির তাড়নায়, যে স্মৃতির উৎস-সন্ধানী কবিরাই বলে উঠতে পারেন, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। সদানন্দকে পিঁপড়েরাই নিয়ে যায় এই অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। শিবুর রাক্ষস, মুকুলের ময়ূর, সদানন্দের পিঁপড়ে এবং পিকুর রঙ-তুলি-ফুল—এই সব কিছু সত্যজিৎ-সৃষ্ট চার খুদের সঙ্গে কোনও অস্পষ্ট দূরাশ্রয়ী অলৌকিক পৃথিবীর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার বাহক মাত্র। মনে পড়ে যায় ইয়েটস-এর সেই কবিতাটির কথা যেখানে কেটলিতে চা-ফোটার শব্দের মধ্যেও একটি খুদে মন শুনতে পায় অন্য পৃথিবীর ডাক!

সদানন্দের পিঁপড়ে-আনন্দে অবিশ্বাসী ডাক্তারবাবু পিঁপড়ের কামড়ে নাজেহাল হয়ে শাস্তি পান। 'খগম' নামের অসামান্য গল্পে অলৌকিকের প্রতি অবিশ্বাসের জন্যে ধূর্জটিবাবুকে যে ভয়াবহ শাস্তি দিচ্ছেন সত্যজিৎ, তা লরেন্সও লজিক-লাঞ্ছিত সভ্যতার প্রতি অভিমান থেকে ভাবতে পারতেন কিনা সন্দেহ। 'খগম' গল্পে অলৌকিকের বাহক বা প্রতীক হয়ে এসেছে একটি কেউটে সাপ। এবং সাপের সূত্র ধরেই লরেন্সের কথা আমার মনে এল। সাপের শরীরী আকর্ষণকে প্রায় অলৌকিকের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন লরেন্স। পাতাল ছায়ায় নিহিত সাপ তাঁর কবিতায় অপার আদিম রহস্যের মত। অন্ধকার গর্তে সাপের মতই ঘুমিয়ে থাকে আমাদের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতা। আবার সাপের সৌন্দর্য, আকর্ষণও লরেন্সের চোখে অনস্বীকার্য। ধূর্জটিবাবুর শিক্ষা, লজিকাল অবিশ্বাসী মন ইমলিবাবার পোষা কেউটের কথা মানতে চায় না। জলের কলে সাপ দেখার পর লরেন্সও বলে ওঠেন: The voice of my education said to me/He must be killed. শেষ পর্যন্ত ধূর্জটিবাবুর মত লরেন্স সাপটিকে মারছেনও। এবং তার পরেই সমস্ত মন তাঁর নিজের প্রতি ঘৃণায় ভরে উঠেছে: I thought how paltry, how vulgar, what a mean act!/I despised myself and the voices of my accursed human education.

ধূর্জটি সাপ হত্যার পর নিজেই ধীরে ধীরে সাপে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই রূপান্তরের বর্ণনা ভয়ানক রসের এক বিস্ময়কর নিদর্শন হিসেবে আমাদের সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই বর্ণনার এক অংশে সত্যজিৎ লিখছেন, "কিন্তু তাঁর (ধূর্জটির) হাতটা ধরা মাত্র আমার শরীরে এমন একটা প্রতিক্রিয়া হল যে আমি চমকে তিন হাত পিছিয়ে গেলাম। ধূর্জটিবাবুর শরীর বরফের মত ঠান্ডা।" এরই পাশাপাশি আমার মনে পড়ে কীটস-এর 'ল্যামিয়া' কবিতায় ল্যামিয়া যেভাবে চোখের সামনে সাপ হয়ে যায় তার বর্ণনা: 'Lycius then pressed her hand, with devout touch/As pale it lay upon the rosy couch:/'Twas icy, and the cold ran through his veins.' কিন্তু কীটস-এর বর্ণনায় সত্যজিতের ভয়ংকরতা নেই কোথাও। বর্ণনার ভয়াবহতা এবং বাস্তবতায় সত্যজিৎ বরং কাফকার অনেক কাছাকাছি। মেটামরফসিস গল্পে গ্রেগর বিশাল পোকায় রূপান্তরিত হবার পর রূপান্তরিত ধূর্জটিবাবুর মতই খাটের তলায় আশ্রয় নেয়, আরামবোধ করে। কাফকা লিখছেন, 'Not without a slight feeling of shame, he (Gregor) scuttled under the sofa.' এরই পাশাপাশি সত্যজিতের বর্ণনা: 'তারপর ভদ্রলোকের (ধূর্জটি) হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। তিনি প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসলেন। তারপর শরীরটাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে কনুইয়ের উপর ভর করে নিজেকে হেঁচড়ে টেনে খাটের তলায় অন্ধকারে চলে গেলেন।'

সত্যজিৎ নিজেই বলেছেন, এরুডিশন ইজ সামথিং আই সিঙ্গুলারলি ল্যাক। কিন্তু আসলে সত্যজিৎ সেই বিরল বিদগ্ধ মানুষদের একজন যাঁরা আস্তিনের তলায় তাঁদের শিক্ষাকে গুটিয়ে রাখতে জানেন। তাঁর লেখায় বিস্ময়কর মৌলিক বিচ্ছুরণের পাশাপাশি ধরা পড়ে বিশ্বসাহিত্য থেকে সাবলীল প্রতিধ্বনি।

।। ২১ ।।

ছোটদের জন্যে লেখা গল্পে মনোবিশ্লেষণের আশ্চর্য রকমফেরে সত্যজিৎ রায় তুলনাহীন। সত্যজিতের বেশ কয়েকটি গল্প শুধুমাত্র মানুষের মন নিয়ে লেখা। কখনও স্মৃতিভ্রষ্ট মন (ফটিকচাঁদ), কখনও স্মৃতিতাড়িত মন (সোনার কেল্লা), কখনও আতঙ্কে বিপন্ন মন (শিবু ও রাক্ষসের কথা), কখনও কল্পনাপ্রবণ সুপার-সেনসিটিভ মন (সদানন্দের খুদে জগৎ), কখনও শিশুমনের বিপন্ন বিস্ময় (পিকুর ডায়েরি), কখনও প্রতিভাবানের যন্ত্রণাকাতর নিঃসঙ্গ মন (আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু), কখনও অবিশ্বাসী, তার্কিক মনের সীমাবদ্ধতা (অঙ্ক স্যার, গোলাপীবাবু আর টিপুখগম), কখনও আহত-ইগো থেকে অভিমানী মন (অপদার্থ, স্পটলাইট, মানপত্র, ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট), কখনও সন্দেহকাতর নিউরোটিক মন (সাধনবাবুর সন্দেহ)। ছোটদের জন্যে আপাত-মজার গল্প 'সাধনবাবুর সন্দেহ'। কিন্তু গল্পটা দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার পড়ার পর আস্তে-আস্তে ভেতরের কলকব্জাগুলো চোখে পড়ে। বুঝতে পারি মানুষের মনের গভীর রহস্য কত সহজে তুলে ধরতে পারেন সত্যজিৎ। সাবলীলতা, সহজতা এবং বিস্তারিত হিউমার ছাড়া সাধনবাবুর সন্দেহের মত মজার গল্প লেখা অসম্ভব। আবার মনোবিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতা ছাড়াও এ গল্পের তৃতীয় মাত্রাটি নিয়ে আসা যায় না। সাধনবাবু মানুষটি সুস্থ মনের অধিকারী নন। সত্যজিৎ রায় স্পষ্ট করে বলেন না সাধনবাবুর এই মানসিক রোগের প্রকৃতিটা ঠিক কেমন। অথচ সমস্ত গল্পটাকে তিনি গড়ে তুলেছেন সাধনবাবুর সন্দেহ-বাতিকের ওপর। গল্পের একেবারে শুরুতেই কিন্তু সাধনবাবুর মানসিক অসুস্থতার ইঙ্গিতটা তিনি এতই আলতো-ভাবে ধরিয়ে দেন যে সেটাকে নিউরোসিস বা প্যারানোইয়া বলে আমরা চিনতেই পারি না। এই ইঙ্গিতের টেকনিকটা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

ব্যাপারটা এইভাবে ঘটছে : সাধনবাবু একদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে শোবার ঘরে ঢুকে দেখছেন মেঝেতে একটা লম্বা ডাল পড়ে আছে। সাধনবাবু পিটপিটে স্বভাবের মানুষ। তিনি তক্ষুনি তাঁর কাজের লোকটিকে ডাকছেন। পচা এসে জিজ্ঞেস করছে, 'ডাকছিলেন বাবু?' উত্তরে সাধনবাবু বলছেন, 'কেন, তোর সন্দেহ হচ্ছে?'

অসামান্য এই টেকনিক। 'সন্দেহ' শব্দটি এখানে আমরা প্রায় লক্ষ্যই করি না। সত্যজিৎ আমাদের লক্ষ করতে দেন না। 'সন্দেহ' শব্দটি এখানে প্রায় বিপুল বর্ষণের ইঙ্গিতবাহী বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাটির মত। পরবর্তী চোদ্দ লাইনের মধ্যে (পাণ্ডুলিপি) সত্যজিৎ যেটা ঘটাচ্ছেন, তার প্রেক্ষিতে ঐ আলতো, হালকা পালকের মত 'সন্দেহ' শব্দটি বিপুল ওজন নিয়ে আমাদের কাছে ফিরে ফিরে আসে। গল্পের প্রথম বিয়াল্লিশ লাইনের (পাণ্ডুলিপি) মধ্যেই আমাদের বুঝিয়ে দেন সত্যজিৎ (আপাত-মজার প্রতারক আচ্ছাদনের তলা থেকে) সাধনবাবুর সন্দেহ-বাতিক আসলে বাতিকের চেয়ে অনেক বেশি কিছু। আমরা মনোরোগের আভাস পাই। মেঝেতে গাছের ডাল থেকেও সাধনবাবুর মনের মধ্যে শুরু হয়ে যায় সেই আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা যাকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় অ্যাংজাইটি রিঅ্যাকশনস্।

প্রথম 'রিঅ্যাকশন' : পচা ঠিক মত ঘর ঝাড়ু দেয় তো? কাজে ফাঁকি দিয়ে সাধনবাবুকে ঠকাচ্ছে না তো?

দ্বিতীয় 'রিঅ্যাকশন্' : পচার কথা যদি সত্যি হয় যে, সে ঠিকমত ঘর ঝাড়ু দিয়েছে এবং ঝাড়ু দেবার সময় ডালটা মেঝেতে পড়ে ছিল না, তাহলে ডালটা ওখানে এল কি করে? কিন্তু পচা ঠিক বলছে তো যে ঝাড়ু দেবার সময় ডালটা ছিল না? পচার কি দেখার ভুল হতে পারে না?

তৃতীয় 'রিঅ্যাকশন্' : পরদিন সকালে জানলায় একটা চড়ুই বসতে দেখে সাধনবাবুর সন্দেহ হল, বাসা বাঁধার ফন্দিতে পাখিটাই ডালটা নিয়ে আসেনি তো?

চতুর্থ 'রিঅ্যাকশন্' : সাধনবাবুর চোখের আড়ালে তাঁরই শোবার ঘরে কি তাহলে এমন একটা গোপন জায়গা রয়েছে যেখানে পাখি বাসা বাঁধতে পারে? তাহলে পাখিটা ঘুলঘুলিতে বাসা বাঁধছে না কি?

পঞ্চম 'রিঅ্যাকশন্' : কিন্তু তিনতলা ফ্ল্যাট বাড়ির এতগুলো ঘরের মধ্যে হঠাৎ সাধনবাবুর ঘরেতেই কেন পাখিটা বাসা বাঁধতে চাইবে? এই খটকা থেকেই আরও এক সন্দেহ—এমন কিছু কি রয়েছে তাঁর ঘরে যা পাখিদের অ্যাট্র্যাক্ট করতে পারে?

লক্ষ করতে হবে, পঞ্চম অ্যাংজাইটি রিঅ্যাকশন্ অবধি সত্যজিৎ ঘটাচ্ছেন পরপর, প্রায় রুদ্ধশ্বাস গতিতে। এরপরেই একটি নাটকীয় ছেদ ঘটাচ্ছেন তিনি। অনেক ভাবনার পর সাধনবাবুর মনে পাকিয়ে ওঠে ষষ্ঠ রিঅ্যাকশন্ : ওই যে নতুন কবরেজী তেলটা তিনি ব্যবহার করছেন—যেটা দোতলার শখের কবিরাজ নীলমণিবাবুর মতে খুসকির মহৌষধ,—সেটার উগ্র গন্ধই হয়ত পাখিদের টেনে আনছে। সেই সঙ্গে এমনও সন্দেহ হল যে এটা হয়ত নীলমণিবাবুর ফিচলেমি, সাধনবাবুর ঘরটাকে একটা পক্ষী-নিবাসে পরিণত করার মতলবে তিনি এই তেলের গুণগান করছেন। এই ছ-নম্বর উৎকণ্ঠার ধরনধারণ দেখে বোঝাই যায় সাধনবাবুর নিউরোসিস ক্রমশ স্কিটজোফ্রেনিয়ার চরম অবস্থায় এসে পেঁাছেছে।

এবারে একেবারে গল্পের শুরুতে ফিরে যাওয়া যাক। সত্যজিৎ লিখছেন : সাধনবাবু পিটপিটে স্বভাবের মানুষ। ঘরে যা সামান্য আসবাব আছে—খাট, আলমারি, আলনা, জলের কুঁজো রাখার টুল—তার কোনটাতে এক কণা ধুলো তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, ফুলকারি করা টেবিল ক্লথ—সবই তকতকে হওয়া চাই।

গল্পের শুরুতে যখন হঠাৎ এই কথাগুলি পড়ি তখনও সাধনবাবুর স্কিটজোফ্রেনিয়ার কোনও আভাস পাইনি বলে এই পিটপিটেমির আসল তাৎপর্যটা ধরতে পারি না। এইখানেই সত্যজিতের আসল নাটকীয়তা, প্রচ্ছন্ন আয়রনি। সাধনবাবুর মানসিক অসুখ কিংবা প্যারানোইয়া কোন্ অতল পর্যন্ত গড়িয়েছে সেটা জানতে পারার পরেই এই পরিষ্কার-পরিষ্কার বাতিকের সঠিক চেহারাটা আমরা চিনতে পারি। বুঝতে পারি, সাধনবাবুর স্কিটজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ হল তাঁর MYSOPHOBIA অর্থাৎ ধুলো এবং জীবাণু সম্পর্কে আতঙ্ক। এর পরে সমস্ত গল্পটির দিকে যখন তাকাই তখন ক্রমশই সাধনবাবুর মধ্যে ফোবিক অ্যাটাকের নানা চেহারা আমরা আবিষ্কার করতে থাকি। বিস্মিত হই কত সূক্ষ্ম ভাবে সত্যজিৎ সাধনবাবুর মনের এইসব টানা-পোড়েন গল্পের মধ্যে বুনে দিচ্ছেন তা দেখে।

সাধনবাবুর আতঙ্ক-রোগের এক মোক্ষম নিদর্শন দিয়ে সত্যজিৎ আসল কাহিনীর ভূমিকা রচনা করেছেন চমৎকার ভাবে। সাধনবাবু যে ফ্ল্যাটে থাকেন তারই এক তলার নবেন্দু চাটুয্যের মেয়ে মিনির অঙ্কের খাতার একটা ছেঁড়া পাতা সাধনবাবুকে দেখালে তিনি তার মধ্যে কোনও সাংকেতিক ভাষায় হুমকির আভাস পেয়ে ভয় পেয়ে যান। অর্থাৎ সাধনবাবু যে চূড়ান্ত ভাবে পারসিকিউশন

ম্যানিয়ার শিকার তাতে আর আমাদের কোনও সন্দেহ থাকে না। এই ভূমিকাটির শেষে সত্যজিৎ নিজেই লিখে দেন, 'সাধনবাবু বিশ্বাস করেন যে গোটা কলকাতা শহরটাই হল ঠক জুয়াচোর ফন্দিবাজ মিথ্যেবাদীর ডিপো। কারুর উপর ভরসা নেই, কাউকে বিশ্বাস করা চলে না।' এই নিউরোসিস কিংবা প্যারানোইয়ার কি কারণ? সত্যজিৎ রায় ইচ্ছে করেই কারণ দর্শাতে একটি কথাও খরচ করেন নি। অথচ গল্পের মধ্যেই চাপা ইঙ্গিতে এবং একাধিক অস্পষ্ট সম্ভাবনার মধ্যে তিনি সাধনবাবুর স্কিটজোফ্রেনিয়ার কারণ লুকিয়ে রেখেছেন। সাধনবাবুর অতীতের দিকে একটু তাকালেই আমরা দেখতে পাই তিনি বিত্তবান হয়েছেন খুবই সাধারণ অবস্থা থেকে। এক সময় তিনি থাকতেন পটুয়াটোলা লেনে ছাপোষা পরিবেশে। এই পটুয়াটোলা লেনের সুপ্তস্মৃতি তাঁর মানসিক তাড়নার একটি কারণ অবশ্যই। অবস্থার এই নাটকীয় পরিবর্তন এবং বাসা-বদল সাধনবাবুর মধ্যে স্কিটজোফ্রেনিয়াকে সাহায্য করেছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেননা, অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তন, গৃহ ও প্রাত্যহিক পরিবেশের পরিবর্তন এবং প্রসারিত বাণিজ্যের দায়িত্ব এবং ঝুঁকি সাধনবাবুর মানসিক অবস্থাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গেছে যাকে অবশ্যই বলা যায় 'স্ট্রেস সিচুয়েশন'। সবরকম পারসিকিউশন ম্যানিয়া ও ফোবিয়া এই ধরনের 'স্ট্রেস সিচুয়েশন' থেকেই পুষ্টি লাভ করে। সাম্প্রতিক গল্প 'লাখপতি'র কেন্দ্রীয় চরিত্র ত্রিদিব চৌধুরীও এই একই ধরনের 'স্ট্রেস সিচুয়েশনে'র অসহায় শিকার। তিনিও ব্যবসায় ফুলে-ফেঁপে প্রায় রাতারাতি বড়লোক হয়ে উঠে নিউরোসিস এবং সুপ্তস্মৃতির তাড়নায় ভুগছেন। 'লাখপতি'র একেবারে শুরুতে ত্রিদিব চৌধুরীর প্লেন চড়ায় আতঙ্ক এবং এসি ক্লাসে ট্রেন যাত্রায় তার গরম-বোধে কষ্ট পাওয়া প্যারানোইয়ার লক্ষণ। 'নায়ক' ছবিতে অবস্থার আকস্মিক উন্নতিতে কিভাবে স্ট্রেস সিচুয়েশন তৈরি হয় এবং মনের ওপর তার প্রভাব কত মারাত্মক হতে পারে সত্যজিৎ তা তুলে ধরেছেন আতঙ্কময় স্বপ্নদৃশ্যে। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিতেও সিদ্ধার্থর মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তার বাবার আকস্মিক মৃত্যু এবং অবস্থার অবনতি। মনের এই স্ট্রেস সিচুয়েশনের থেকেই উঠে আসে দিবাস্বপ্নের সেই দৃশ্য যেখানে সিদ্ধার্থ খুন পর্যন্ত করতে পারে অবলীলায়। অবস্থা ও পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে যে 'স্ট্রেস সিচুয়েশন' তৈরি হয় ডাক্তারি মতে তার আঙ্কিক লেভেল হল 'চল্লিশ'। মনে রাখতে হবে স্ট্রেস সিচুয়েশনের লেভেল যে কোনওভাবে তিনশ অতিক্রম করলে তার চাপে সুস্থ মনও চুরমার হয়ে যাবে। আর যে-মনের ভারসাম্যে কোনওরকম গন্ডগোল রয়েছে তার ক্ষতি হবে অপরিসীম।

সাধনবাবু দুর্বল মনের মানুষ অনেক আগে থেকেই, এটা আমরা ধরে নিতে পারি। এই মানসিক দুর্বলতা থেকেই জুয়ার প্রতি তাঁর আসক্তি। তিনি তিন-তাস খেলেন নিয়মিত। তাঁর একাকিত্ব, একঘেয়েমি এবং পটুয়াটোলা লেনের মলিন পরিবেশ থেকে পালানোর তাগিদেই জুয়া খেলার এসকেপিজম্ এবং উত্তেজনা সাধনবাবুকে পেয়ে বসেছিল। অবস্থার পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তিন-তাসের সূত্র ধরেই সাধনবাবুর অতীত সাধনবাবুর মধ্যে বেঁচে আছে। এই তিন তাসের আড্ডায় তাঁর পুরনো বন্ধু মধু মাইতির চাকুর আক্রমণ তাঁর মনে এমন একটা জায়গায় আঘাত করেছিল যে সেই স্মৃতি সুপ্তভাবে সাধনবাবুর স্কিটজোফ্রেনিয়াকে মদত দিয়েছে দীর্ঘকাল। সাধনবাবু বিয়ে করেছিলেন কিনা আমরা জানি না। থাকার মধ্যে ছিল খড়দার মাসীমা। কিন্তু তিনিও মারা গেছেন সম্প্রতি। এবং সত্যজিৎ আমাদের স্পষ্ট করে জানাচ্ছেন, 'আজ সাধনবাবুর নিকট আত্মীয় বলতে আর কেউই অবশিষ্ট নেই।' অর্থাৎ সাধনবাবু যে একে একে নিকট আত্মীয় হারানোর শোক পেয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। ধরে নেওয়া যেতেই পারে নিঃসঙ্গ জীবনে নানা শোক, দুঃখ, এবং ওলট-পালট তাঁর মনের স্ট্রেস সিচুয়েশনকে 'ডেনজার লেভেলে'র ওপারে নিয়ে গেছে।

এহেন সাধনবাবুর কাছে একটি নামগোত্রহীন পার্সেল এলে আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে তাই হল 'সাধনবাবুর সন্দেহ' গল্পের নির্যাস। আর এ গল্পের সাফল্যের চাবিকাঠি

রয়েছে যেভাবে সত্যজিৎ পাঠকের মধ্যেও সাধনবাবুর টেনশনকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন তার মধ্যে। শুধু গল্প দিয়ে নয়, একটি অসামান্য ইলাসট্রেশনে গল্পের টেনশনকে তরঙ্গায়িত করেন সত্যজিৎ। ইলাসট্রেশনে লো-অ্যাঙ্গেল ক্লোজআপে পার্সেলটাকে সত্যজিৎ এমনভাবে প্রোজেক্ট করেছেন যাতে মূর্তিমান বিভীষিকার মত সেটা যেন সাধনবাবুর সঙ্গে আমাদেরও গ্রাস করতে চাইছে! আশ্চর্য সিনেম্যাটিক এই ইলাসট্রেশন। এই বাক্সর দিকে তাকিয়ে সাধনবাবু প্রথমে বুঝতে পারেন না ভিতরে কি আছে। উৎকণ্ঠায় তিনি ক্রমশ 'রেস্টলেস' হয়ে পড়েন। এবং তার পরেই হঠাৎ একটা বোমা-পটকার শব্দ থেকে তাঁর মনে হয় পার্সেলটার মধ্যে আছে টাইম বোমা যেটা তাঁকেই হত্যা করবার জন্যে পাঠানো হয়েছে। টাইম বোমার এই আতঙ্ক আমাকে মনে করিয়ে দেয় আর এক আকস্মিক লাখপতির কথা যিনি সত্যজিতের ছবিতে (পরশ পাথর) ট্যাক্সির পিছনে কামানের লোহার গোলা নিয়ে ঘুরে বেড়ান। সাধনবাবুর বোমা-আতঙ্ক যেন এই অন্য লাখপতিটির 'গোলা-তৃপ্তির' উল্টোপিঠ। একজনের কাছে কামানের গোলা সোনায় রূপান্তরিত হলে হয়ে উঠবে অর্থনৈতিক শক্তির উৎস। অন্যজনের কাছে পার্সেলের মধ্যে লুকনো বোমা আগুন ও শব্দে রূপান্তরিত হয়ে ডেকে আনবে মৃত্যু। বোমার সঙ্গে আগুনের অনুষঙ্গ সাধনবাবুর মানসিক রোগ সম্পর্কে আর একটি ইঙ্গিত আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়। সাধনবাবু 'আগুন-আতঙ্ক' কিংবা **PYROPHOBIA**-তেও ভুগছেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যখন টাইম বোমা ফাটল না তখন সাধনবাবু খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে ভাবলেন সন্ধ্যায় মোড়কটা খুলে দেখতে হবে তার মধ্যে কি আছে। কিন্তু সাধনবাবুর স্কিটজোফ্রেনিয়ার সূত্র ধরে সত্যজিৎ এমনভাবে হঠাৎ গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন যে টেনশন বাড়ল বই কমল না। আপিস থেকে ফিরে সাধনবাবু একতলায় নবেন্দু চাটুয্যের ঘরে দাপাদাপি চলছে শুনে জিজ্ঞেস করে জানলেন যে পটুয়াটোলা লেনে এক ব্যক্তি খুন হয়েছে। ব্যক্তির নাম শিবদাস মৌলিক। লাশ শনাক্ত করার কোনও উপায় নেই। কারণ, 'ধড় আছে, মুড়ো নেই।' খুনী যে কোথায় সরিয়ে রেখেছে মুণ্ডু সেটা এখনও জানা যায়নি।

নতুন আতঙ্ক সাধনবাবুকে প্রায় অবশ করে দেয়। অতীতের তিন-তাসের আড্ডায় সাধনবাবু এক মৌলিককে চিনতেন। তার প্রথম নাম কি শিবদাস হতে পারে? সাধনবাবুর আবার সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। তাঁর মনে পড়ে তিন-তাসের আড্ডায় মধু মাইতি ছিল সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক চরিত্র। মধুসূদন যে জুয়াচুরি করত সাধনবাবুর সেটা সন্দেহ হয় গোড়া থেকেই। এই সন্দেহ একদিন প্রকাশ করতেই মধু মাইতি তাঁকে চাকু নিয়ে আক্রমণ করে। সাধনবাবু বেঁচে যান মৌলিক আর সুখেন দত্তর জন্য। এই মৌলিককেই যে মধু মাইতি খুন করে সাধনবাবুকে মৌলিকের মুণ্ডুটা পার্সেল করে পাঠিয়ে দিয়েছে তাতে আর সন্দেহ কি? মুণ্ডু সমেত মোড়কটিকে ঘিরে সাধনবাবুর আতঙ্ক গল্পটিকে নতুন খাতে বইয়ে দেয়। আমরা সাধনবাবুর স্কিটজোফ্রেনিয়ার গভীরতর পরিচয় পাই একটি ছোট্ট স্বপ্নদৃশ্যে। এটিকে বলা যায় আতঙ্ক রোগের ডিসোসিয়েটিভ রিঅ্যাকশন্। এই স্বপ্নদৃশ্যের বার্তাটি হল, সাধনবাবু তাঁর মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হারিয়েছেন, আতঙ্কের শিকড় চলে গেছে সুপ্তমনের অতল পর্যন্ত।

গল্পের শেষে রয়েছে একটা হাল্কা মজা, যা বন্ধ ঘরে একঝলক বাতাসের মত। যাঁরা গল্পটি পড়েন নি তাঁদের কাছে এই অন্তিম মজাটা আমি ফাঁস করতে চাই না। কিন্তু এটা বলতেই হবে যে এই মজাটাও এসেছে সাধনবাবুর প্যারানোইয়ারই সূত্র ধরে। প্যারানোইয়ার একটি লক্ষণ স্মৃতিভ্রম। সাধনবাবু প্রায় লক্ষ করছেন যে তাঁর স্মৃতি ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়েছে। এবং কবিরাজ নীলমণিবাবুকে একথা বলতে তিনি সাধনবাবুকে নিয়মিত ব্রাহ্মীশাক খেতে বলেছিলেন। 'সাধনবাবুর সন্দেহ' গল্পটি সম্পর্কে চূড়ান্ত কথাটা হল, বাংলা সাহিত্যে এ গল্প নিঃসন্দেহে স্কিটজোফ্রেনিয়ার 'স্টাডি' হিসেবে স্থান করে নেবে। আশ্চর্যের বিষয়, এহেন গল্পও লেখা হয়েছে ছোটদের জন্যে!

কোন কবি—একমাত্র কোনও কবির পক্ষেই সম্ভব 'সদানন্দের খুদে জগৎ'-এর মত একটি গল্প লেখা। এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সত্যজিৎ তাঁর কোনও চলচ্চিত্রেই কবিতার এত কাছাকাছি আসেন নি। 'চারুলতা'র বাগান-দৃশ্য, 'পথের পাঁচালী'র কাশবনের দৃশ্য, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র 'এ পরবাসে রবে কে' গানের দৃশ্যটির দূরপ্রসারী কাব্যময়তা মেনে নিয়েও 'সদানন্দের খুদে জগৎ'-এর গীতিধর্মিতাকে অনন্য বলে মনে হয় আমার। 'সদানন্দের খুদে জগৎ' বিষয় এবং শৈলীতে চমক-প্রদভাবে অভিনব। সদানন্দের বয়েস তের। সে নিজের কথা নিজেই লিখছে। সত্যজিৎ নিজেকে সদানন্দের লেখার ভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়েছেন। ফলে, এ গল্পের গদ্য একান্তভাবে সেই তের বছরের ছেলেটির যে পিঁপড়ের পায়ের শব্দ, মুখের কথা, কণ্ঠের গান শুনতে পায়। কেমন গদ্য লিখবে এই অসামান্য বালক, কতদূর স্পর্শকাতর হতে পারে তার ভাষা, তার গভীর উপলব্ধির বাহক ব্যঞ্জনাগুলি, 'সদানন্দের খুদে জগৎ' গল্পটি পড়লে তা বোঝা যায়। 'পিকুর ডায়েরি'তে পিকুও নিজের কথা নিজেই লিখেছে। এই দুটি গল্পেই সত্যজিৎ বাংলা গদ্য নিয়ে দু-ধরনের পরীক্ষা করেছেন। পিকুর গদ্য অসংলগ্ন, যতিচিহ্নহীন। এই গদ্যের স্বতঃস্ফূর্তি ব্যাকরণের ধার ধারে না। 'পিকুর ডায়েরি'র গদ্য 'স্ট্রিম অফ কনশাসনেস' স্টাইলের খুব কাছাকাছি। সদানন্দের গদ্য সাবলীল, স্বচ্ছন্দ, সেনসিটিভ। কিন্তু এ-গদ্যে ব্যাকরণের স্বীকৃতি আছে। লক্ষণীয় ব্যাপার, ব্যাকরণের শাসন মেনে নিয়েও সদানন্দের ভাষা এমন তৃতীয় মাত্রা খুঁজে পায় যা শুধু কবিতার পক্ষেই সম্ভব।

'সদানন্দের খুদে জগৎ' এমন এক আশ্চর্য আনন্দের গল্প যার অন্তরের চাবিকাঠিটা রয়েছে মন-কেমনের মত এক বিষণ্ণ আমেজের মধ্যে। বলা যেতে পারে সদানন্দ এমন এক অসুখে ভুগছে যার নাম আনন্দ। এই আনন্দ যত গভীর হয়, ততই তার অসুখ বাড়ে, ততই তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় পরিচিত পৃথিবী থেকে দূরে। সদানন্দের সঙ্গে বন্ধু-বান্ধব এমনকি বাবা-মার সম্পর্ক পালটে যায় এই আনন্দের সূত্র ধরে। সদানন্দের আনন্দ এত তীব্র, এবং সে আনন্দের উৎস এতদূর সূক্ষ্ম কিংবা অপ্রত্যাশিত যে তার পক্ষে সম্ভব নয় অন্য পাঁচজনের সঙ্গে এ-আনন্দকে ভাগ করে নেওয়া। অ্যালডস্ হাক্সলি এইরকম সব আনন্দের চরিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন 'দ্য ডোরস অফ পারসেপশন' বইটিতে। হাক্সলিকে এই আনন্দ পাওয়ার জন্যে খেতে হয়েছিল এল এস ডি ট্যাবলেট। সদানন্দ পিঁপড়েদের গান শুনে আনন্দ পায় কিন্তু তাকে কোনও ওষুধের কাছে ঋণ করতে হয় না। 'সদানন্দের খুদে জগৎ' সত্যজিতের প্রায় সব গল্পের থেকে আলাদা। সত্যজিতের অধিকাংশ গল্প আমাদের বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করে, একই সঙ্গে তৃপ্ত করে আমাদের কৌতূহল এবং কৌতুকবোধকে। 'সদানন্দের খুদে জগৎ' চ্যালেঞ্জ জানায় আমাদের কল্পনাকে, বুদ্ধির চেয়ে বোধকে নাড়া দেয় অনেক বেশি। পিঁপড়ের গান শুনে, পিঁপড়ের কথা শুনে সদানন্দের যে আনন্দ তার কোনও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা অসম্ভব। যেমন অসম্ভব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে অবনীন্দ্রনাথের 'কাটুম কুটুম'-এর রসগ্রহণ। 'কাটুম কুটুম'-এর প্রসঙ্গ আনলাম এই মনে করে যে অবনীন্দ্রনাথ গাছের ডাল-পালার মধ্যে থেকে যখন নানারকম পরিচিত আকার বা প্যাটার্ন আবিষ্কার করছিলেন, তখন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একাত্মতাবোধের তীব্রতা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তিনি যেন ডাল-পালার কথা শুনতে পেতেন।

'সদানন্দের খুদে জগৎ'-এর মত গল্প এমন একজন লেখকের পক্ষেই লেখা সম্ভব যিনি বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছেলেবেলাকে হারিয়ে ফেলেন নি। ছোটবেলার কোনও না কোনও সময়ে একটা ফড়িং-কে বার বার উড়ে এসে কাঠির ডগায় বসতে আমরা কে না দেখেছি, কিংবা দেখে মজা পেয়েছি। কিন্তু সেই স্মৃতি ক্রমশ মনের মধ্যে এতদূর সুপ্ত হয়ে যায় যে তা থেকে আর কোনও রকম মজা কিংবা মেদুরতা আমাদের কাছে ফিরে আসে না। সদানন্দ লেখে, 'যেমন ধরো, তুমি

হয়তো কিছু না ভেবে মাটিতে একটা কাঠি পুঁতেছে, আর হঠাৎ দেখলে একটা ফড়িং খালি খালি উড়ে উড়ে এসেই কাঠির ডগায় বসছে—এটা তো ভীষণ মজার ব্যাপার।' এইসব লাইন ইচ্ছে করলেই লেখা যায় না। লেখকের স্মৃতির স্বর্ণমহল থেকেই এরা স্ব-ইচ্ছায় উৎসারিত হয়। চমকে উঠেছিলাম এই লাইনগুলো প্রথম পড়ে। একটি সরু কাঠির ডগায় একটা ফড়িং-এর বার বার ঠোক্কর খাওয়া আর তড়িৎ গতিতে প্রায় স্প্রিং-এর মত সামনে দিকে মুখ করে পিছনে চলে যাওয়া—এ জিনিস দেখে আমিও যে এক সময় মজা পেতাম তা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘদিন বাদে বাল্যস্মৃতির গহন সুপ্তির অন্ধকার থেকে কেউ যে আবার আমার মনে একটা ছবি জাগিয়ে তুলতে পারবেন ভাবতেই পারি নি। সন্দেহ থাকে না সত্যজিতের গল্পের এই অংশটুকু আত্মজৈবনিক। এর পাশাপাশি আমরা 'অশনি সংকেত'-এর সেই দৃশ্যটির কথা ভাবতে পারি যেখানে প্রজাপতি আর ফড়িং-এর নাচের দৃশ্য ক্ষণিক পাংচুয়েশনের মত ব্যবহার করেন সত্যজিৎ। 'পথের পাঁচালী'তে অসংখ্য জলফড়িং-এর আঁকাবাঁকা উড়ন্ত ভঙ্গির প্যাটার্নও আশ্চর্যভাবে যেন সত্যজিতেরই বাল্যস্মৃতির 'সেলিব্রেশন'।

সদানন্দের আর একটি মজার মধ্যে রয়েছে এমন এক জিনিস যা হয়তো বেশিরভাগ লোকের চোখেই পড়ে না। সদানন্দ লিখছে, 'আমার বিছানায় শুয়ে শুয়েও তো কত মজার জিনিস দেখি আমি। মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে শিমুলের বিচি ঘরে উড়ে আসে। তাতে লম্বা রোঁয়া থাকে, আর সেটা এদিক-ওদিক শূন্যে ভেসে বেড়ায়। সে ভারি মজা। একবার হয়ত তোমার মুখের কাছে নেমে এল, আর তুমি ফুঁ দিতেই হুশ করে চলে গেল কড়িকাঠের কাছে।' তুলনাহীন এই বর্ণনা। সুপ্ত স্মৃতির প্রেরণা ছাড়া এই ছবি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। মনে আছে আমার নিজের ছেলেবেলার কথা। বাড়ির ছাদে তখন লেপ-তোষক তৈরি করার রেওয়াজ ছিল। ধুনুরিদের তুলো ধোনার যন্ত্র থেকে বাতাসে ভেসে আসত পালকের তারার মত রুপোলি রঙের শিমুল বিচি। আমরাও ফুঁ দিয়ে সেগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে যেতাম এ-ঘর থেকে ও-ঘরে। ভারি মজা হত। আজকাল আর কলকাতায় তেমন ঘরের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়া শিমুল বিচি দেখতে পাই না। এখনকার কলকাতার ছেলেরা অন্তত সদানন্দের শিমুল বিচি থেকে মজা পাওয়ার ব্যাপারটা বুঝবে কিনা জানি না। তবে যাদের বয়েস অন্তত চল্লিশ তারা বছর তিরিশ আগের ঘুমিয়ে পড়া স্মৃতি থেকে একটা বিষণ্ন আনন্দ পাবেন সত্যজিতের বর্ণনায়।

'সদানন্দের খুদে জগৎ' গল্পটা তৈরিই হয়েছে এই তের বছরের ছেলেটির এমন এক অসুখকে ঘিরে যেটা সত্যজিৎ শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর-এ অমলের অসুখের মত, আমাদের কাছে অস্পষ্ট রেখে দেন। গল্পের কেন্দ্রীয় স্ব-বিরোধ ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠে এই অসুখের সুখের মধ্যে। আগেই বলেছি, সদানন্দের অসুস্থতা যত গভীর হয়, তার ইন্দ্রিয়গুলি যেন তত বেশি সজাগ, তীব্র এবং স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। আমাদের চোখে সদানন্দের অসুখ (মনোরোগ? স্মর্তব্য, গল্পের গোড়াতেই সদানন্দ বলছে, আমার এক পাগলা দাদু ছিলেন) তাই ক্রমশ প্রতীকী তাৎপর্যে বড় হয়ে ওঠে। বুঝতে পারি কবি, ভাবুক এবং শিল্পীদের 'অসুখে'র মত সদানন্দের অসুখের উৎসও কল্পনার সংক্রাম। এই জন্যেই প্লেটো ভেবেছিলেন কবিরা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। এই জন্যেই শেলিকে মানসিক অসুস্থতার অভিযোগ মেনে নিয়ে নিজের সন্তানের পিতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, যিনি ভাবতে পেরেছিলেন চোখের চাওয়ার হাওয়ার কথা, ইয়েটস, যিনি দেখতে পেয়েছিলেন ঊষার ঘোমটা থেকে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে শান্তি, কীটস, যিনি শুনতে পেতেন শিশির বিন্দুর শব্দ, জীবনানন্দ, যিনি রোদ্দুরের চোখে পেয়েছেন শিশিরের ঘ্রাণ—এঁরাও কি ছিলেন না বালক সদানন্দের মতই সেই অজ্ঞেয় অসুখের শিকার, যাকে রিলকে বলেছেন 'এক আশ্চর্য সহজ বোধ'? সত্যজিৎ এই আশ্চর্য সহজ বোধ কিংবা অলৌকিক ইন্দ্রিয় সজাগতাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন 'সদানন্দের খুদে জগৎ' গল্পে। সদানন্দ শুনতে পায় পিঁপড়েদের সংলাপ, সঙ্গীত, আর্তনাদ, কান্না। তার সঙ্গে পিঁপড়েদের একটা ভাব-বিনিময়ের সম্পর্ক গড়ে

ওঠে। এবং পিঁপড়েদের সঙ্গে বন্ধুত্বের আনন্দ সদানন্দ কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে না। সে কবি, শিল্পী, ভাবুকদের মতই ক্রমশ নির্বাসিত হয় তার নিজস্ব আনন্দের জগতে। চোখের চাওয়ার বাতাসের মতই কিংবা শিশিরের শব্দের মতই, পিঁপড়ের গানেরও কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয় না। পিঁপড়ের কণ্ঠ নেই, শ্রবণ নেই। সে না পায় শুনতে, না পারে বলতে। সে শুধু জানে বডি-ল্যাংগুয়েজের প্রায় পঞ্চাশটি প্রয়োগ। সদানন্দ, আমরা ভেবে নিতে পারি, শুনতে পায় এই বডি-ল্যাংগুয়েজের শব্দ! পিঁপড়ের পা ফেলা, শুঁড় নাড়া, ঘোরাফেরা—এই সব কিছু থেকেও সৃষ্টি হতে পারে বাতাসে শব্দ-তরঙ্গ। কিন্তু কোনও মানুষের পক্ষে অলৌকিক অতীন্দ্রিয়তা ছাড়া সম্ভব নয় সেই শব্দ শুনতে পাওয়া। 'সদানন্দের খুদে জগৎ' তাই এক অনন্য ইন্দ্রিয়ময়তার গল্প।

সত্যজিতের চলচ্চিত্র ডিটেলের কাজে অদ্বিতীয়। আমি শুধু সাজ-পোশাক, পরিবেশ এবং দৃশ্যের খুঁটিনাটির কথা বলছি না। অভিনয়ের ডিটেলের কথাও বলছি। কিন্তু বর্ণনা ও বিশ্লেষণের ডিটেলে সত্যজিৎ রায়ের কোনও ছবিই 'সদানন্দের খুদে জগৎ'-এর কাছাকাছি আসতে পারে না। এবং যিনি এই রকম একটি ছোটগল্প লিখতে পারেন, তাঁর তৈরি চলচ্চিত্রে যে অভিনয় ও mise-en-scéne-এর অনুপুঙ্খ আমাদের চমকে দেবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? এ গল্পে পিঁপড়েদের চলন-বলন, আদব-কায়দা, ভাব-ভঙ্গি যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাতে যে ব্যাপারে ক্রমশই আর সন্দেহ থাকে না, তা হল এ গল্প লেখাই সম্ভব নয় তৃতীয় নেত্র এবং তৃতীয় শ্রবণের সাহায্য ছাড়া। আর প্রয়োজন ছেলেবেলার স্মৃতিকে অতল থেকে তুলে আনার অলৌকিক ক্ষমতা, যেমন দেখি রবীন্দ্রনাথ কিংবা ব্লেকের মধ্যে। আমার কাছে কিন্তু পিঁপড়ের বডি-ল্যাংগুয়েজ-এর শব্দ শুনতে পাওয়ার চেয়েও অপার্থিব এই ক্ষমতা। পিঁপড়েদের চাল-চলনের ছোট-ছোট নির্ভুল ডিটেল সারা গল্পে ছড়িয়ে আছে চুমকির কাজের মত। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি : ১। 'পিঁপড়েটা হঠাৎ থমকে থেমে গেল। তারপর আস্তে আস্তে দানাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে সেটাকে বার কয়েক এদিক থেকে ওদিক থেকে গুঁতিয়ে দেখল। তারপর হঠাৎ কি জানি ভেবে বোঁ করে ঘুরে নর্দমার ভিতর চলে গেল।' ২। 'একটুক্ষণ চেয়ে থাকতেই পিঁপড়ের বুদ্ধির নমুনাটা নিজের চোখেই দেখলাম। পিঁপড়েগুলো সবাই একজোটে চিনির দানাটাকে ঠেলতে-ঠেলতে নর্দমার দিকে নিয়ে চলল! সে যে কী মজার ব্যাপার তা না দেখলে বোঝা যায় না। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, আমি যদি পিঁপড়ে হতাম তাহলে নিশ্চয়ই শুনতাম ওরা বলছে,—'মারো জোয়ান হেঁইও! আউর ভি থোড়া হেঁইও! চলে ইঞ্জিন, হেঁইও!' ৩। 'এদিক-ওদিক চাইতেই আমার পিছনের দেয়াল চোখে পড়ল। দেখলাম একটা বিরাট লম্বা পিঁপড়ের লাইন দেয়াল বেয়ে নেমে আসছে। ঠিক সৈন্যের মতো সারি সারি অসংখ্য কালো কালো খুদে খুদে পিঁপড়ে, একটানা একভাবে চলেছে তো চলেছেই!' ৪। 'এবার ঠিক চিনলাম এ আমার সেই চেনা পিঁপড়ে—যাকে জল থেকে বাঁচিয়েছিলাম। আমার দিকে চেয়ে সামনের দুটো পা মাথায় ঠেকিয়ে নমস্কার করছে! আমি আমার হাতের তেলোটা চিত করে জানালার উপর রাখলাম। পিঁপড়েটা সামনের পা দুটো মাথা থেকে নামিয়ে আস্তে আস্তে আমার হাতের দিকে এগিয়ে এল। তারপর আমার কড়ে আঙুল বেয়ে হাতের উপর উঠে আমার তেলোর হিজিবিজি ম্যাপের নদীর মতো লাইনগুলোর উপর চলেফিরে বেড়াতে লাগল।' এই চারটি উদাহরণই এইটুকু বুঝে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যে, বর্ণনাগুলি উঠে এসেছে লেখকের শৈশব স্মৃতির অতল থেকে। সদানন্দের মধ্যে যেন সত্যজিৎ নিজেই খুঁজে পান তাঁর ছেলেবেলা।

সত্যজিৎ রায় এই গল্পের মাধ্যমে যেন নিজেই তুলে ধরেছেন একটি সুপার-সেনসিটিভ মানুষের আনন্দ, যন্ত্রণা ও বিষণ্ণতা। কোনও কোনও মানুষের তৃতীয় শ্রবণ, তৃতীয় নেত্র পরিচিত পৃথিবীর এমন কিছু অনাবিষ্কৃত উদ্ভাস আবিষ্কার করে যার সম্ভোগের আনন্দ অন্য কারো সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায় না। এই আনন্দই তাই ক্রমশ হয়ে ওঠে নিঃসঙ্গতার এবং বিষণ্ণতার উৎস।

জয়েস তাঁর 'এ পোর্ট্রেট অফ দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান' নামের আত্মজৈবনিক উপন্যাসে এই আনন্দপ্রসূত নির্জনতার কথা স্পর্শময় ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন।

আগেই বলেছি 'সদানন্দের' খুদে জগৎ'-এর গদ্য অনন্য। এই গদ্য-স্টাইলের সবচেয়ে বড় কথাটি হল এটা এক ধরনের 'সাইকিক প্রোজ' কিংবা অবচেতনা থেকে উৎসারিত ভাষা। এই ভাষার সঙ্গে জড়িয়ে আছে লেখকের নিজের স্মৃতি এবং সত্তা। একটা উদাহরণ দিচ্ছি : 'তারপর হঠাৎ কি জানি ভেবে বোঁ করে নর্দমার ভিতর চলে গেল'। লক্ষণীয় ঐ 'কি জানি' শব্দদ্বয়।

সাবজেক্টিভ প্রোজের এ এক চূড়ান্ত উদাহরণ। সদানন্দের পিঁপড়ে-অভিজ্ঞতার সঙ্গে সত্যজিৎ নিজে না জড়িয়ে পড়লে তিনি লিখতেন 'কি যেন'। 'কি জানি' বলার সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দের এবং লেখকের সঙ্গে পিঁপড়ের মনোভাবের একটা সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল। 'কি যেন' শব্দদ্বয়ের অবজেক্টিভ দূরত্ব এখানে একেবারেই আর নেই। সত্যজিৎ ইচ্ছে করেই 'কি যেন'র পরিবর্তে 'কি জানি' লিখেছেন তা নয়। সদানন্দের সঙ্গে গহন একাত্মতার তাগিদে তিনি এইভাবে লিখতে বাধ্য হয়েছেন। আবার যেখানে সদানন্দ পিঁপড়েদের চিনির দানা টেনে নিয়ে যেতে দেখে ভাবছে, আমি যদি পিঁপড়ে হতাম তাহলে নিশ্চয়ই শুনতাম ওরা বলছে মারো জোয়ান, হেঁইও, আউর ভি থোড়া, হেঁইও, চলে ইঞ্জিন, হেঁইও, সেখানেও ভাষা উঠে এসেছে সত্যজিতের শ্রবণ-স্মৃতি বা অরাল-মেমরি থেকে। সদানন্দের স্বপ্নের জগতে যান্ত্রিক সভ্যতার এই সোচ্চার অনুপ্রবেশ (চলে ইঞ্জিন, হেঁইও ইত্যাদি) লক্ষণীয়। পিঁপড়েদের মুখে জোয়ান মজুরের ছান্দিক ডাক প্রায় স্বপ্নের ওপর শ্রমময় প্রাত্যহিক জীবনের সুপারইম্পোজিশন-এর মতো। এই সুপারইম্পোজিশন থেকে সদানন্দ যে মজাটা পায় তা সত্যজিতের পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হত না যদি না তাঁর শৈশব স্মৃতির উস্কানি থাকতো এই বর্ণনার পিছনে।

'সদানন্দের খুদে জগৎ' এক অর্থে সিনেমাও ! এত স্পষ্ট ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সত্যজিতের বর্ণনা, এত সাবলীল এবং সচল তাঁর বাকপ্রতিমাগুলি যে গল্পটি থেকে যেন সরাসরি উঠে আসতে পারে একটি অ্যানিমেশন চিত্র।

।। ২৩ ।।

সত্যজিৎ রায় লেখক হিসেবে কী হতে পারতেন এবং ইচ্ছে করেই যেন হলেন না তার দুটি প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। একটি গল্পের নাম 'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু'। অন্যটি 'পিকুর ডায়রি'। দুটি গল্প নিয়েই ইতিমধ্যে কিছু আলোচনা করেছি। কিন্তু দুটি কাহিনীর বিষয় ও শৈলীর অভিনবত্ব এতদূর বিস্তৃত যে এদের আবিষ্কার করার সম্ভাবনা যেন ফুরোতেই চায় না। দুটি গল্পেই সত্যজিৎ গভীর এবং গম্ভীরভাবে সাহিত্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন যা দুটি গল্পকেই তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যচর্চা থেকে আলাদা করে দাঁড় করিয়ে দেয়। এইরকম গল্প তিনি আর কখনও যে লিখতে চাইলেন না তার কারণ গল্পের মধ্যে ঘটনার 'থ্রিল' এবং মজাকে তিনি শুধু যে আশ্রয় দিতে চাইলেন তাই নয়, ঘটনার পরিবেশন তাঁর গল্পে চরিত্রায়ণের চেয়ে ক্রমশই বেশি গুরুত্ব পেল। ছোটদের জন্যে লেখায় ঘটনার রোমাঞ্চ, মজা এবং ঘটনারই মাধ্যমে চরিত্রের বিস্তার না থাকলে চলে না। দ্বিতীয়ত, সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে ঘটনা-ভিত্তিক গল্প বলার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতারই প্ররোচনা তাঁর লেখার এবং ছবির পিছনে বিস্তারিতভাবে কাজ করে চলেছে। 'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু' এবং 'পিকুর ডায়রি'—এই দুটি গল্পে ঘটনার চেয়ে অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায় মানস বিশ্লেষণ। একটি প্রতিভাবান মানুষের মন এবং একটি শিশুর মন

কীভাবে জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় সাড়া দেয় তারই যেন পরীক্ষামূলক প্রতিবেদন রয়েছে এ দুটি গল্পে। সত্যজিৎ যদি ক্রমাগত এই রকম গল্পই লিখতে থাকতেন এবং বাংলা গদ্য নিয়ে এতদূর পরীক্ষামূলক হওয়ার সাহস দেখাতেন সর্বদা, তাহলে সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর ভাবমূর্তি ভিন্ন হত সন্দেহ নেই। আর যে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তা হল তাঁর জনপ্রিয়তা এবং সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর বেস্ট-সেলিং সাফল্য এই তুঙ্গে পৌঁছত না। 'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু' গল্পটি অনেকেই পড়েন নি। আর্যশেখর এক চাইল্ড প্রডিজি। সত্যজিৎ গল্পটা এইভাবে আরম্ভ করছেন : অনেকের মতে আর্যশেখর ছিলেন যাকে ইংরাজীতে বলে চাইল্ড প্রডিজি। তাঁর যখন দশ বছর বয়স তখন একদিন স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রথম পাতার নীচের দিকে এক লাইন লেখা তাঁর চোখে পড়ল—সান রাইজেজ টুডে অ্যাট সিক্স থার্টিন এ এম। আর্যশেখর কাগজ হাতে নিয়ে পিতা সৌম্যশেখরের কাছে উপস্থিত হলেন।

—বাবা,
—কী রে?
—কাগজে এটা কী লিখেছে!
—কী লিখেছে?
—ছটা বেজে তেরো মিনিটে সূর্য উঠবে।
—তা ত লিখবেই। সেই সময়ই ত সূর্য উঠেছে।
—তুমি ঘড়ি দেখেছিলে?
—ঘড়ি দেখতে হয় না।
—কেন?
—জানাই থাকে।
—কী করে?
—বিজ্ঞানের ব্যাপার। অ্যাস্ট্রোনমি।
—আর যদি ঠিক সময় না ওঠে।
—ঘড়ি ভুল।
—যদি ভুল না হয়?
—তাহলে আর কী। তাহলে প্রলয়।
সেদিন থেকে আর্যশেখরের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সূত্রপাত।

এহেন আর্যশেখর দুরূহ গাণিতিক প্রশ্নের সমাধান করতে শুরু করল ছেলেবেলার খেলাচ্ছলে। যেমন, আকাশে ঘূর্ণায়মান চিল দেখে তার গতির মাত্রা, মাটি থেকে তার উচ্চতা এবং তার বৃত্ত-পথের পরিধি নির্ণয়—এসব আর্যশেখরের কাছে হয়ে উঠল নস্যির মত।

আর্যশেখর কিন্তু প্রথম আঘাতটা পেল তার বাবার কাছ থেকে। বাপ একদিন ডেকে বলল তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল যাচ্ছে না। এই অবস্থায় আর্যশেখরের গাণিতিক প্রতিভাকে 'তামাসা' হিসেবে দেখিয়ে যদি একটা বাড়তি উপার্জনের ব্যবস্থা করা যায় ত মন্দ হয় না। ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত আর্যশেখর পিতা সৌম্যশেখরকে সরাসরি জানিয়ে দিল, তামাসা আর প্রতিভা এক জিনিস নয় বাবা। এর পরেই সত্যজিতের কাহিনী অপ্রত্যাশিত মোড় নিচ্ছে। আর্যশেখর নিজেকে প্রশ্ন করল তার বাবা হয়েও সৌম্যশেখর এমন হীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয় কী করে? এই প্রশ্নের তাড়না থেকেই আর্যশেখর হেরিডিটি ও প্রজনন সম্পর্কে শুরু করে দিল অধ্যয়ন। আর্যশেখর ক্রমশই বুঝতে পারল মানুষের প্রতিভার পেছনে 'জীন'-এর অবদান বিস্ময়কর। সুতরাং নিজের প্রতিভার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আর্যশেখরের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ প্রতিভাবান ছিলেন কিনা সেটা খুঁজে বার করা। বাবার কাছ থেকে আর্যশেখর জানতে

পায় : 'সাত পুরুষের মধ্যে কেউ ছিলেন না। এ-গ্যারাণ্টি দিতে পারি। তার আগের কথা জানি না'। এতে আর্যশেখরের চিন্তা আরও বেড়ে যায়। বাপের দিকে সাতপুরুষের মধ্যে প্রতিভার খোঁজ করা যেমন বৃথা তেমনি তার মাতৃকুলেও। সুতরাং আর্যশেখর বুঝতে পারে প্রতিভার ব্যাপারে হেরিডিটির প্রভাব অনিশ্চিত। পরিবেশের অবদান কতটা? আর্যশেখর থাকে পটুয়াটোলা লেনে। সুতরাং তার প্রতিভার ব্যাপারে অন্তত পরিবেশের প্রভাব তেমন আছে বলে মনে হয় না। তবে, বংশলতিকা জিনিসটাকে টেনে একেবারে সৃষ্টির আদিতে নিয়ে যাওয়া যায়। আর্যশেখরের মনের কথা সত্যজিৎ এইভাবে লিখছেন : 'জীনের প্রভাব কি তখন থেকেই প্রবাহিত হয়ে আসছে না? কে জানে আজ থেকে বিশ হাজার বছর আগে আর্যশেখরের পূর্বপুরুষ কে বা কেমন ছিলেন! এমনও ত হতে পারে তিনি আলতামিরার গুহার দেওয়ালে বাইসনের ছবি এ'কেছিলেন। এইসব আদিম গুহা চিত্রকরদের জিনিয়াসের পর্যায়ে ফেলা যায় না? অথবা হরপ্পা-মোহেনজোদারোর মত শহরের পরিকল্পনা করেছিলেন যাঁরা তাঁদের? অথবা বেদ উপনিষদের রচয়িতাদের? এ'দের মধ্যে কেউ যদি আর্যশেখরের পূর্বপুরুষ হয়ে থাকেন তাহলে আর চিন্তার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু তবু তাঁর মনটা খচখচ করতে লাগল। সৌম্যশেখরের মত কল্পনা-বিমুখ বৈষয়িক-চিন্তাসর্বস্ব স্থূল ব্যক্তি যে তাঁর জন্মদাতা হতে পারেন এর কোন বৈজ্ঞানিক সমর্থন তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না।'

এই ভাবনার পরেই এমন একজন সত্যজিৎকে আমরা পাই যাঁর দেখা এরপরে আর কখনও পাইনি। আর্যশেখরের মধ্যে একটি ভাবনা ক্রমশ দানা বেঁধে উঠে দুরমুশের মত তাঁকে আঘাত করে। ভাবনাটা হল, আর্যশেখর যদি জারজ সন্তান হয়ে থাকেন, যদি সৌম্যশেখরের ঔরসে তাঁর জন্ম না হয়ে থাকে? সত্যজিৎ লিখছেন : 'কথাটা মনে হতেই আর্যশেখর বুঝলেন এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র তাঁর বাবাই দিতে পারেন এবং সে উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। সত্যান্বেষণের খাতিরে পুত্র পিতাকে প্রশ্ন করবে এটা আর্যশেখরের কাছে খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হল। নশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ ল ডাইজেস্টে নিমগ্ন সৌম্যশেখর পুত্রের প্রশ্ন প্রথমবার অনুধাবন করতে পারলেন না।

—যমজ সন্তান? কার কথা বলছিস।
—যমজ নয়, জারজ। আমি জানতে চাই আমি জারজ সন্তান কিনা।'

আমার মনে হয় না সত্যজিৎ রায়ের পক্ষে আর এই ধরনের গল্প, এই ধরনের সংলাপ লেখা সম্ভব। তাঁর লেখায় সেক্স ত দূরের কথা, নারী চরিত্র পর্যন্ত খুব বেশি আসেনি। 'তারিণী খুড়ো ও লখনৌর ডুয়েল' গল্পটি অবশ্যই ব্যতিক্রম। সত্যজিতের ছবিতেও নারী পুরুষের সম্পর্ক যতই জটিলভাবে তুলে ধরা হোক না কেন, এইসব সম্পর্কের বিশ্লেষণে আমরা লক্ষ করি তাঁর ইনহিবিশনস্-এরই সাবলিমেশন।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, সত্যজিতের এই ইনহিবিশনস্-এর কারণ কি? তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু এ-প্রশ্ন আজও কেউ তুলেছেন বলে মনে হয় না। সত্যজিৎ বিষয়ে এ-প্রশ্ন তোলাও কোনও অলৌকিক কারণে 'স্যাক্রিলেজ' বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রশ্নটা নিঃসন্দেহে জরুরী—তাঁকে এবং তাঁর লেখা ও ছবিকে বোঝার জন্যে।

সত্যজিৎ পিতৃহীন হয়েছিলেন শৈশবে। বিধবা মার তিনি একমাত্র সন্তান। মানুষ হয়েছিলেন ব্রাহ্ম পরিবারের রক্ষণশীল পরিবেশে। তাঁর পরিবারের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য। শান্তিনিকেতনে তিনি কলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন কিছুদিন। এইসব প্রভাবের সমন্বিত ছায়ায় তাঁর মনে রোম্যান্টিকতার প্রশ্রয় খুবই স্বাভাবিক। তাঁর লেখা পড়লে বা তাঁর ছবি দেখলে মনেই হয় না তিনি কামু এবং সার্ত্রের সমসাময়িক। এমনকি মনেই হয় না তিনি

ষাট সত্তর এবং আশির দশকের একজন শিল্পী যাঁর উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার বৃত্তের মধ্যেই ঘটে গেছে ভারতবর্ষের নকশাল আন্দোলন, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিবর্তন এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পট পরিবর্তন, বাংলাদেশের অভ্যুত্থান, আসাম এবং পাঞ্জাব সমস্যার ক্রনিক বিস্ফোরণ এবং ভিয়েতনামের যুদ্ধ, কিউবা কেন্দ্রিক আলোড়ন, আফগানিস্তান সমস্যা, পোল্যান্ডের তোলপাড়, আয়ারল্যান্ডের পাশবিক দমন, এবং মধ্যপ্রাচ্যের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। সমসময়ের এই বৃত্তের মধ্যে থেকেও তিনি এর দ্বারা যেন কোনও ভাবেই চিহ্নিত নন।

সুতরাং 'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু' গল্পে যখন দুম্ করে পুত্র পিতাকে জিজ্ঞেস করে সে জারজ সন্তান কি না, মনে হয় এই লেখা যেন অ্যাংরি জেনারেশনের অন্য কোনও লেখকের, যে লেখক সমসময়ের বৃত্তের মধ্যে নিঃশ্বাস নিতে নিতে অভিমানে, ক্রোধে এবং স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় জর্জর। সত্যজিতের নিজস্ব উচ্চারণের স্থিতমিত সফিস্টিকেশন এখানে এতটাই অনুপস্থিত।

এতগুলো কথা বললাম সত্যজিতের লেখায় এবং ছবিতে ইনহিবিশনস্-এর কথা বলতে গিয়ে। আমাদের সমাজে চিরায়ত মূল্যবোধ, ট্যাবু এবং যৌনতা সংক্রান্ত আড়ষ্টতা যে ক্রমশ ভেঙে পড়েছে তার কারণই হল আধুনিক পৃথিবীতে রাজনৈতিক ও সামাজিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আমাদের রোম্যান্টিক স্বপ্নভঙ্গ। সত্যজিৎ রায় মূলত এই আন্তর্জাতিক ডিসইলিউশন-মেন্টের দ্বারা যেন প্রভাবিত নন, তিনি তাঁর নিজস্ব রোম্যান্টিকতায় এতদূর বিধুর। আমি একথা বলছি 'অশনি সংকেত', 'জন অরণ্য', 'প্রতিদ্বন্দ্বী' এবং 'সদ্‌গতি'-র কথা মাথায় রেখেও। 'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু' একটি মাত্র 'সৃষ্টি' যেখানে সত্যজিৎ আধুনিক ক্রোধকে উচ্চারণ দিয়েছেন, এ যুগের সেক্সুয়াল ডিসইলিউশনমেণ্টকে তুলে ধরেছেন। আর্যশেখর যখন নিজেই পিতাকে বলছে সে বিয়ে করবে না, কারণ তার নিজেরই প্রজনন ক্ষমতা সম্পর্কে তার সন্দেহ আছে, আধুনিক পৃথিবীর যৌন স্বপ্নভঙ্গের আর এক চূড়ান্ত ঘোষণা আমরা শুনতে পাচ্ছি। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যায় সত্যজিৎ রায় তাঁর গল্পে যেটা ঘটালেন তা হল মাতার প্রতি পুত্রের সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের ছবি ফুটিয়ে তোলা এবং এই অবিশ্বাস থেকেই পুত্রের ইমপোটেন্সির সূত্রপাত করা। আধুনিক পৃথিবীর সেক্সুয়াল ডিসইলিউশনমেণ্ট মাতা-পুত্রের সম্পর্ককে চূড়ান্ত ভাবে আঘাত করে আমাদের সামাজিক কাঠামোটাকেই নড়বড়ে করে দিয়েছে। আর্যশেখর যখন সন্দেহ প্রকাশ করে পিতা সৌম্যশেখরের ঔরসে তার জন্ম কি না তখন সে ভারতীয় মাতৃমূর্তিকে চুরমার করে দেয় এবং এই আঘাত থেকে সে নিজেই এতটা আঘাত পায় যে সেল্ফ ক্যাস্ট্রেশন-এর শাস্তি সে মাথা পেতে গ্রহণ করে। মৃত্যুর আগে আর্যশেখর একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেছিল—'মাগো'। সত্যজিতের আর কোনও উচ্চারণ কখনও পোসিমিজম-এ এত গভীর, শ্লেষে এত তীব্র এবং কারুণ্যে এত সুদূরস্পর্শী হয়ে ওঠেনি। আশ্চর্য এই গল্প যেখানে একবার, মাত্র একবারই, সত্যজিৎ রায় চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছিলেন মাতা-পুত্রের সম্পর্কের পবিত্রতাকে, এবং নস্যাৎ করতে পেরেছেন এই স্বপ্নভঙ্গের অন্ধকার গহ্বর থেকে একই সঙ্গে মাতৃজঠর এবং পুরুষের ঔরসের অবদানকে। কেন তিনি এই অভিমান আর ক্রোধের উচ্চারণকে আর একবারের জন্যেও প্রশ্রয় দিলেন না, এড়িয়ে গেলেন এখনও পর্যন্ত, তার সঠিক উত্তর হয়ত তাঁর জীবনের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে একদিন না একদিন। আর্যশেখরের লেখক নিঃসন্দেহে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। কোনও সেলিব্রিটির জীবনই তাঁর নিজের, তাঁর পরিবারের, তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সম্পত্তি নয়। সে-জীবন আন্তর্জাতিক গবেষণা ও বিশ্লেষণের দাবি মেটাতে বাধ্য। বহু বিশেলষণ, বহু গবেষণার মাধ্যমে একদিন আর্যশেখরের লেখককে আমরা নতুন ভাবে আবিষ্কার করবই। সত্যজিৎ রায় 'অন্যভাবে' উদ্ঘাটিত হবেন সেদিন।

॥২৪॥

'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু' গল্পে আর্যশেখর যখন তার বাবার কাছ থেকে সরাসরি জানতে চায় সে জারজ সন্তান কিনা, আমরা বিশ্বাস করতে পারি না এই গল্পের লেখক এবং 'অপরাজিত' ছবিটির পরিচালক একই ব্যক্তি। 'অপরাজিত'-তে অপু এবং মা সর্বজয়ার সম্পর্কের রোমান্টিক স্পর্শময়তা অনস্বীকার্য। আর্যশেখরের প্রশ্ন মাতা-পুত্রের সম্পর্কের রোম্যান্টিক সৌন্দর্য শুধু চুরমারই করে দিচ্ছে না, ভারতীয় মনে মাতৃত্বের আদর্শকেই তছনছ করে দিচ্ছে। কী লেখায়, কী চলচ্চিত্রে, সত্যজিৎ রায় আর কখনও আধুনিক মানুষের স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার এমন অমোঘ এবং তীব্র উচ্চারণ খুঁজে পান নি।

১৯৭০ সালের শারদীয় আনন্দবাজারে সত্যজিৎ রায় 'পিকুর ডায়রি' নামে একটি গল্প লেখেন (পরে 'তিন রকম'-এ প্রকাশিত) যেখানে আর্যশেখরের ক্রোধ যেন জড়িয়ে গেছে গহন অভিমানের মধ্যে। আর্যশেখর এক অনিকেত সময় ও সমাজের সেই যন্ত্রণাকাতর অবিশ্বাসী মানুষ যে তার বাবার ঔরসে, মার চারিত্রিক সততায়, নিজের প্রজনন ক্ষমতায় আস্থা হারিয়ে ফেলে। লক্ষণীয় যে, আর্যশেখরের স্বপ্নভঙ্গ সম্পূর্ণভাবেই নারীপুরুষের যৌন-সম্পর্ককে ঘিরে। আর্যশেখর যখন শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে গল্পের শেষে 'মাগো' শব্দটি উচ্চারণ করে, মনে হয় তার স্বপ্নভঙ্গের এক অপ্রত্যাশিত উত্তরস্রোত যেন মৃত্যুকেই রূপান্তরিত করে দিল মাতৃজঠরের জলজ কোমল অন্ধকারে যেখানে সে ভ্রূণের মত আশ্রিত হতে চায়! আর্যশেখরের ক্রোধ, অভিমান, স্বপ্নভঙ্গ এবং মাতৃতৃষ্ণা—সব কিছুর উৎসসন্ধানী এক আশ্চর্য গল্প হল 'পিকুর ডায়রি'। আধুনিক পৃথিবীর সেক্সুয়াল ডিসইলিউশনমেণ্টের একেবারে গোড়ার কথা বলা হয়েছে এই গল্পে। অন্য পুরুষের সঙ্গে মা-র সম্পর্ক, বাবা-মার মধ্যে ক্রমশ বেড়ে ওঠা টেনশন এবং মা-র অবহেলা কিভাবে শিশুর অবচেতন মনের ওপর ধীরে ধীরে প্রভাব ফেলে, তার মধ্যে একটা অব্যক্ত অভাববোধ জাগিয়ে তোলে, তাই হল 'পিকুর ডায়রি' গল্পের নির্যাস। 'অবচেতন' কথাটা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিতেশকাকু, বাবা, আর মা—এই তিনজনের সম্পর্ক এবং মার স্বেচ্ছাচারিতার সূত্র ধরে যে পারিবারিক অশান্তি, অনিশ্চয়তা ও ভাঙন অনিবার্যভাবে ঘনিয়ে আসে, পিকু তার কিছুই প্রায় বুঝতে পারে না। শুধু সে তার চোখ দিয়ে যা দেখে, তার খুদে মন দিয়ে অস্পষ্টভাবে যা বোঝে, তাই লিখে রাখে তার ডায়রিতে। গল্পের শেষে পিকু কত নিঃসীমভাবে অসহায়, ভাবতে আমাদের সত্তার গভীর পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। তার দাদুর মৃত্যু ও মার চলে যাওয়ার মধ্যে পিকু কী হারালো তা সে বুঝতে পারে না। এবং যেহেতু 'পিকুর ডায়রি'র বাইরে এসে সত্যজিৎ রায় নিজে একটিও বাড়তি খবর বা বর্ণনা দেন না আমাদের, পিকুর দাদু সত্যিই মারা গেলেন কিনা, এবং হিতেশকাকুর সঙ্গেই পিকুর মা বাড়ি ছেড়ে চলে গেল কি না, সেটাও খুব স্পষ্ট নয়। ডায়রির শেষে পিকু শুধু লেখে : 'আর কেউ নেই খালি আমি আর দাদু আর খালি মাছি আছে খালি খালি আসছে জ্বালাতোন ভারি বদমাইস মাছিটা আর বাস এইবার পাতা শেস খাতা শেস বাস শেস।'

১৯৫৬ সালে যে-মানুষ মা-ছেলের গভীরপ্রসারী সম্পর্কের বিচিত্র উদ্ভাসকে প্রকাশ করে 'অপরাজিত'-র মত ছবি করতে পারেন, সেই মানুষই ১৯৭০-এ এসে 'পিকুর ডায়রি'-র মত একটি গল্প লিখলেন কেন যেখানে নারীর যৌন জীবনের তাড়না তার মাতৃত্বের বোধ ও দাবিকে মোচার খোলার মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়? মনে রাখতে হবে, 'পিকুর ডায়রি'র মত গল্প শুধু প্রতিভার নির্দেশে লেখা যায় না। এ-গল্প উঠে এসেছে লেখকের স্মৃতি ও সত্তার গভীর থেকে এবং সত্যজিৎ রায় এখনও পর্যন্ত আর এমন কিছুই লেখেননি যা 'পিকুর ডায়রি'র প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে।

'পিকুর ডায়রি' কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। অন্তত আমি এমন একটি কালজয়ী সাহিত্যসৃষ্টিকে আকস্মিক বা প্রক্ষিপ্ত ঘটনা বলে ভাবতে পারি না। ১৯৬৫ সালে 'কাপুরুষ' ছবিতে নারী-পুরুষের সম্পর্কে সেক্সুয়াল ম্যালঅ্যাডজাস্টমেন্টের দিকটা যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সত্যজিৎ, তার মধ্যেই যেন পিকুর বাবা-মার দাম্পত্যজীবনের বীজ লুকিয়ে ছিল। ঠিক পরের বছরেই নিজেরই গল্প থেকে সত্যজিৎ তৈরি করলেন 'নায়ক', যেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্রের সেক্সুয়াল ডিসইলিউশনমেন্টের পিছনে কাজ করছে যৌনতাতাড়িত নারীর প্রতারণা। ১৯৭০ সালে, অর্থাৎ 'পিকুর ডায়রি'র বছরেই দুটি ছবি করেন সত্যজিৎ—'অরণ্যের দিনরাত্রি' এবং 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। এবং এই দুটি ছবিতেই নারী-পুরুষের সম্পর্কে সহজ বিশ্বাসের সুর যেন কোনওভাবেই বেজে ওঠে না। আধুনিক নারীর উগ্র কামনাই যেন নারী-পুরুষ সম্পর্কের অনিশ্চিত নব-নিয়ন্ত্রক।

১৯৬৫-১৯৭০ : এই পাঁচ বছরের প্রেক্ষিতে বিচার করলে 'পিকুর ডায়রি' গল্পটিকে মনে হয় এক অনিবার্য ক্লাইম্যাক্সের মত। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গণ্ডিতে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে এমন কোনও ঘটনার প্রভাব কি সম্ভব, যা তাঁর প্রতিভাকে ঠেলে দেবে রোম্যান্টিক স্বপ্ন-ভঙ্গের এই চূড়ান্ত উচ্চারণের দিকে? এবং যা তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারদের একজন হয়েও পর্দায় ঘোষণা না করে লুকিয়ে রাখবেন একটি স্বল্প-পঠিত গল্পে? 'পিকু' ছবিটির কথা মনে রেখেও আমি 'লুকিয়ে রাখা'র ব্যাপারটিতে জোর দিচ্ছি, কেন না 'পিকুর ডায়রি'তে যা লুকানো আছে, 'পিকু'তে তা নেই।

'পিকু' ছবির সঙ্গে 'পিকুর ডায়রি' ছোট গল্পের তফাৎটা প্রায় আকাশ-পাতালের। 'পিকুর ডায়রি'তে পিকু মা-বাবা-হিতেশকাকু ও দাদুর মাধ্যমে বড়দের পৃথিবীটাকে নিজের অনুভূতি দিয়ে অস্পষ্টভাবে বুঝছে এবং নড়বড়ে ভাষায় সেই বোধকে সে প্রকাশ করছে। 'পিকু' ছবিতে সত্যজিৎ রায় নিজেই পিকুর জীবনের একটি দিনের ঘটনা সিনেমার ভাষায় 'বর্ণনা' করছেন। অর্থাৎ ছবিতে গল্পটা বাইরের থেকে বলা হচ্ছে আর সেই সঙ্গে চরিত্রগুলোকেও বাইরে থেকে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। গল্পে ঘটনা এবং চরিত্র শুধুমাত্র পিকুর দৃষ্টিকোণ থেকে ফুটে উঠছে। সত্যজিৎ রায় যেখানে একান্তভাবে আগাগোড়া নেপথ্যে রয়েছেন। এবং নেপথ্যচারিতার সুযোগটাই ১৯৭০-এ সত্যজিতের পক্ষে হয়ত নিতান্ত জরুরী ছিল। নারী স্বাধীনতা, মেয়েদের সেক্সুয়াল লিবারেশন এবং নারী-অগ্রগতির সূত্র ধরে আধুনিক পরিবারে যে অনিশ্চয়তা এবং যন্ত্রণা দেখা দিয়েছে তার করুণ প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার জন্যে 'পিকুর ডায়রি'র মত গল্পের অন্তরাল কেন দরকার হয়েছিল, এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর পেতে গেলে সত্যজিৎ রায়ের ব্যক্তিগত জীবন এবং অভিজ্ঞতার যে ধরনের ক্লিনিকাল বিশ্লেষণ প্রয়োজন তা অন্তত এখন আমাদের দেশে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই এদেশে জীবনী লেখার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গড়ে ওঠে নি। আমরা যে সমস্ত জীবনী সচরাচর পড়ে থাকি তা মানুষকে তার কীর্তির থেকে মহৎ করে তোলে, স্রষ্টার ইমেজকে করে তোলে সত্যের চেয়ে অনেক বেশি পূজনীয়। 'পিকুর ডায়রি'র মত গল্প কিন্তু লেখকের গহন মনের সঙ্গে এতদূর যুক্ত, নিবিড় জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে এতদূর সম্পৃক্ত যে সত্যজিৎ রায়ের সামগ্রিক সত্তা থেকে গল্পটিকে ছাড়িয়ে নেওয়া যায় না। 'পিকুর ডায়রি'র মত গল্প বাংলা ভাষায় আর আছে বলে মনে হয় না। এ গল্পের সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন শুধুমাত্র লেখকের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নভঙ্গ এবং যন্ত্রণার বিশ্লেষণ সূত্র ধরেই হতে পারে।

'পিকুর ডায়রি' গল্পের গদ্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যে কথাটা প্রথমেই মনে হচ্ছে তা হল এ গল্পে সাহিত্যিক সত্যজিৎ বাংলা ভাষা নিয়ে যে ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তার একাংশও পাওয়া যাবে না সত্যজিতের সিনেমা-ভাষার শৈলী ও বিন্যাসে। অসামান্য সাহিত্য-প্রতিভা ছাড়া 'পিকুর ডায়রি' যে লেখা যায় না তার কয়েকটি উদাহরণ পরপর তুলে দিচ্ছি। একটি পাঁচ-ছ বছরের ছেলে বাংলা গদ্য যে ভাষায়, যে বানানে লিখবে এবং যেভাবে সেই ভাষাকে করে তুলবে

তার আধো-আধো ভাবনাচিন্তার বাহক, সত্যজিৎ সেই ভাবেই এই গল্পে আগাগোড়া ভাষা ও ব্যাকরণের ব্যবহার করেছেন। এবং করেছেন আশ্চর্য স্বতঃস্ফূর্ততায়। সারা গল্পে পূর্ণ-চ্ছেদ ছাড়া আর কোনও যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন নি সত্যজিৎ। এবং একটি পাঁচ বছরের ছেলের মন যেভাবে ভাবনা থেকে ভাবনায়, একটি ঘটনা থেকে অন্য ঘটনায় গড়িয়ে যায়, ঠিক সেইভাবেই সেই মনের ভাষাকে চালিয়ে নিয়ে যান তিনি। যেভাবে পিকু তার ডায়রিতে মা আর হিতেশকাকুর সম্পর্কের প্রাথমিক ইশারাটা আমাদের ধরিয়ে দিচ্ছে তা বিস্ময়করভাবে রিয়েলিস্টিক। পিকু লিখেছে, 'ভাগ্গিস লাইন টানা খাতা তাই লেখা বেকে যাচ্ছে না দাদা কিন্তু লাইন ছাড়াই সোজাই লেখে আর বাবা তো লেখেই বাবার কিন্তু ছুটি নেই। দাদারো নেই। মারো নেই। মা তো কাজ করে না আপিসে বাড়িতে খালি কাজ। এখন মা নেই মা হিতেশ কাকুর সংগে গেছে আর বলেছে আমায় একটা জিনিস একটা দেবে নিউ মারকেট থেকে এনে দেবে। আজকাল মা খুব জিনিস দেয়।' পিকুর অস্পষ্ট বোধ আমাদের কাছে যে তথ্যগুলি অব্যর্থভাবে পৌঁছে দেয় তা হল—এক, পিকুর মা রোজগেরে মেয়ে নয়, তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই। আপাতভাবে সে অতিবিশ্বাস্য, নির্ভরযোগ্য গৃহবধূ এবং সন্তানের মা। দুই, সংসারের কাজ করার পরেও এবং ছেলের সঙ্গে আপাত স্নেহের সম্পর্ক বজায় রেখেও এই গৃহবধূর মন ও শরীরের তৃষ্ণা তাকে টেনে নিয়ে গেছে বিবাহের বাইরে আরও এক 'সম্পর্কে'র মধ্যে। তিন, পিকুর বাবার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে পিকুর মা হিতেশের সংগে দুপুরবেলা বেরিয়ে যায়। চার, পিকু যাতে হিতেশকে সহজে গ্রহণ করতে পারে সেই কথা ভেবে এবং প্রচ্ছন্ন অপরাধ বোধ থেকেও পিকুর মা পিকুকে আজকাল প্রায়ই উপহার কিনে দেয়। পিকু যে এতটা এইভাবে বুঝতে পারছে তা নয়। এবং সেইখানেই এই গল্পের মহত্ত্ব, করুণতা।

পিকুর মা একটা এয়ারগান হিতেশের হাত দিয়ে পিকুকে দেওয়ার পর পিকু লিখছে : 'কাল মা এয়ারগান দিলেন নিউ মারকেট থেকে সেটা হিতেশ কাকু দিলো, বল্ল পিকুবাবু আমি এটা দিলাম কিন্তু তোমার মা কিন্তু না।......বাবা আপিস থেকে বাবা এসে বল্লেন আবার বোনদুক কেন মা বল্লেন তাতে কি বাবা বল্লেন এমনিতেই দুমদাম লেগেই আছে আবার কেন বোনদুক বাড়িতে মা বল্লেন তাতে কি হয়েছে বাবা বল্লেন তোমার কোনো সেনস নেই মা বল্লেন চেচামেচি আপিস থেকে এসেই কেন বাবা বল্লেন না বাবা হ্যাঁ বাবা বাবা বল্লেন ইংরিজিতে মাও ইংরিজিতে।' হিতেশকাকুকে ঘিরে বাবা-মার মধ্যে যে টেনশন গড়ে উঠেছে পিকু তা খুব অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে মাত্র। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি এই ছোট্ট ছেলেটির পায়ের তলায় আর মাটি নেই, তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

পিকুর পরিবারে আর একজন সদস্য আছে, তার দাদা। পিকুর সঙ্গে দাদার যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন। দাদা রাজনীতি করে, এবং প্রায়ই বাড়িতে থাকে না। পিকু লিখছে : 'দাদা নেই পরসু কিম্বা তরসু থেকেই নেই তা জানি না কোথায়। দাদা তো পলিটিস করে তাই হোপলেস বাবা খালি খালি বলে আর মাও বলে।' এই কটি লাইন প্রায় তীব্র আর্তনাদের মত ফেটে পড়ে আমাদের চেতনায়। পিকুর দাদার বয়েস অন্তত ষোল। ষোল বছরের ছেলের মা পরপুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে আমাদের বাঙালী পরিবারে—এতটাই বলা হল পিকুর এই কটি লাইনের মধ্যে দিয়ে। ধসে গেল হিন্দু বিবাহের পরিচিত কাঠামোটা। এ গল্প পড়ার পরে মনে হতেই পারে হিন্দু বিবাহের নৈতিক ভিত্তি কত প্রতারক। দ্বিতীয়ত, পিকুর লেখা এইসব কথা থেকে আর একটা ইঙ্গিতও যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পিকুর দাদা যে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে রাজনীতি করে তার কারণও হয়ত পারিবারিক জীবনের অনিশ্চয়তা। পিকু যা বোঝে না, পিকুর দাদা তা বোঝে, এতটা আমরা ধরে নিতেই পারি। এবং এই বোধের যন্ত্রণা থেকেই সে সামাজিক বিপ্লবে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে, রাজনীতিতে যায়।

বাড়িতে একটা পার্টি হচ্ছে একদিন। পিকু যে কত একা সেটা বোঝা যায় পার্টির দিনে তার

ডায়রি থেকে : 'একবার মা চলে এলো ঘরে আর এসে বাতরুমে গেল আর আয়নায় একবার দেখল আর একবার একজন আরেকজন মেয়ে বাতরুমে গেল আর খুব জোরে তার সেনটের গন্ধে একটা নতুন সেনট কিন্তু মার সেটা নেই। আরেকবার মা এলো আর বল্ল একি সোনা জেগে আছো ঘুমো ঘুমো আর আমি বল্লাম একা একা ভয় আর মা বল্ল কিসের ভয় বোকা ছেলে ঘুমো এগারটা বাজে চোখ বোজ আপনি ঘুম আমি বল্লাম দাদা কোথায় মা বল্ল ঢের হয়েছে ঘুমো বলে চলে গেল।'

গভীর কান্না থেকে যেন উঠে এসেছে লাইনগুলো। আমার মনে পড়ে যায়, স্টিফেন স্পেনডারের আত্মজীবনী 'ওয়ার্ল্ড উইদিন ওয়ার্ল্ড'-এর সেই পার্টির বর্ণনা যেখানে ছোট্ট স্টিফেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখত মা সেজেগুজে পার্টিতে বেরিয়ে যাচ্ছে, এবং যাবার আগে বিছানায় ঝুঁকে স্টিফেনকে চুমু খেয়ে যাচ্ছে। এবং মা চলে যাবার পরেও মার পার্ফিউমের গন্ধ স্টিফেন পেত ঘুমের মধ্যে। পশ্চিমী শিশুর এই একাকিত্ব আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে ছিল না। কিন্তু আজ বিশেষ করে এদেশের সমাজের ধনী পরিবারগুলির মধ্যে ছোটরা বড় হয়ে উঠছে পিকুর একাকিত্ব, অভিমান এবং যন্ত্রণা নিয়ে। এই অভিমান থেকেই পরবর্তী জীবনে গড়ে উঠছে আধুনিক সমাজের এলিয়েনেশন। 'পিকুর ডায়রি' যেন এই এলিয়েনেশনের উৎস উদ্ঘাটন করে দেয় আমাদের সামনে। দুঃখের কথা 'পিকুর ডায়রি'র মত গল্প আর সত্যজিৎ লিখলেন না, ইচ্ছে করেই লিখলেন না। যেন নিজের প্রতিভার কাছ থেকে নিজেই দায়িত্বহীন ভাবে পালিয়ে গেলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'পিকুর ডায়রি' গল্প হিসেবে এবং 'বাদশাহী আংটি' বই হিসেবে একই বছরে প্রকাশিত। 'বাদশাহী আংটি'র তুমুল বাণিজ্যিক সাফল্য এবং জনপ্রিয়তা যেন তীরের মুখের মত সাহিত্যিক সত্যজিতের ভবিষ্যৎ পথ বাতলে দিল। তিনি ছোটদের জন্য যা লিখেছেন তার সাহিত্যিক তাৎপর্যকে এতটুকু ছোট না করেও এ কথা বলতেই হয় যে 'পিকুর ডায়রি'র প্রতিযোগী গল্প তিনি খুব বেশি লেখেন নি।

।। ২৫ ।।

সাহিত্যিক সত্যজিতের জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের একটি কারণ অবশ্যই তাঁর গদ্য। সত্যজিতের ভাষা তাঁর ব্যক্তিত্বের এবং চরিত্রের আরশি। ঠিক তেমনই সরস অথচ গম্ভীর, ঋজু অথচ লাবণ্যময়, সাবলীল অথচ ওজস্বী। সত্যজিৎ যেমন আটপৌরে, ঘরোয়া পোশাকেও নিজস্ব ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল, তেমনি তাঁর গদ্যেরও চারিত্র্য নির্ভর করে না আভরণ এবং পোশাকী বিন্যাসের ওপর।

সত্যজিতের গদ্য একান্তভাবে কলকাতার। তাঁর বাংলা এই শহরের মুখের ভাষার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তিনি যে-ভাবে তাঁর বাংলায় পশ্চিমবাংলার কথ্যভাষার শব্দ, মেজাজ, ঢং এবং আটপৌরে বাঙালী গলার ওঠানামা পর্যন্ত নিয়ে আসেন তার মধ্যেই রয়েছে সত্যজিতের ভাষার মূল চরিত্র। তাঁর ভাষায় তদ্ভব শব্দের সংখ্যা তৎসম শব্দের চেয়ে অনেক-অনেক বেশি। ফলে, তাঁর ভাষায় আসছে কথ্য বাংলার নির্ভেজাল সারল্য ও নির্মেদ দ্রুতি। তিনি তাঁর 'যখন ছোট ছিলাম'-এ কত সহজেই লিখতে পারেন, 'উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণে চলে আসার ফলে বাপের দিকের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগ কমে গেলেও, ধনদাদু আর ছোটকাকা প্রায়ই আসতেন আমাদের বাড়ি।' 'বাপের' শব্দটি আমরা হয়তো লক্ষই করি না, এত স্বাভাবিক, সাবলীলভাবে শব্দটা এসেছে। কিন্তু নিজেরা লিখতে গেলে হয়তো বাবা কিংবা পিতা লিখে বসব। একেবারে ঘরোয়া বাংলার এত কাছাকাছি আসার সাহস আমরা দেখাতে পারি না। এমনিভাবেই সত্যজিৎ 'স্তূপাকার' বোঝাতে 'ডাঁই', 'থেঁতো'র বদলে 'ছাঁচা', 'অবশ্য'র বদলে 'অবিশ্যি', 'বৃহস্পতিবার'-এর জায়গায় 'বিষ্যুৎবার', 'বৃহৎ'-এর জায়গায়

'ঢাউস', 'এতদিন'-এর বদলে 'অ্যাদ্দিন', 'বিদ্যা'র জায়গায় 'বিদ্যে', 'প্রাচীন' বোঝাতে 'আদ্যিকালের', 'মিস্ত্রী'র জায়গায় 'মিস্তিরি', 'স্কুল'-এর জায়গায় 'ইসকুল', 'সপ্তাহ'র জায়গায় 'হপ্তা', 'ত্রিকোণ'-এর বদলে 'তেকোণা'—এইসব শব্দ জলের মত ব্যবহার করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর গল্পের মধ্যে তিনি যখন সংলাপ লেখেন তখন তা কত স্বাভাবিক হতে পারে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি : 'তিন হপ্তা লেগেছিল ঘা শুকুতে। তারপর একদিন মওকা বুঝে পকেটে এগারোটি টাকা আর কাঁধে একটা পুঁটলি নিয়ে দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়লুম কাউকে কিচ্ছু না বলে। তিনবার ট্রেন বদল করে বিনি-টিকিটে ঝ্যাকড়-ঝ্যাকড় করে তিন দিন তিন রাত্তির স্রেফ চা-বিস্কুট খেয়ে শেষটায় একদিন কামরার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি তাজমহল দেখা যাচ্ছে। নেমে পড়লুম। শহরে ঘুরতে ঘুরতে কেল্লায় গিয়ে হাজির হলুম। পেছনে মাঠ, তার পেছনে যমুনা, আর তারও পেছনে দূরে আবার দেখলুম তাজমহল। তারপরই আমার চোখ গেল উলটো দিকে। কেল্লার গায়ে উপর দিকে বারান্দা, তার নিচে বাইরে ঘাসের উপর খেলা হচ্ছে। এক পাশে সাপ খেলছে, এক পাশে ভালুক নাচছে, আর মধ্যিখানে, আসাদুল্লা দু-হাতে বল নাচাচ্ছে—তার চোখ রুমাল দিয়ে বাঁধা! ভক্তি কি সাধে হয়রে ফটকে? গায়ের লোম খাড়া হয়ে চোখে জল এসে গেস্‌ল। মানুষের এত খ্যামতা হয়? (ফটিকচাঁদ)' লক্ষণীয় কিভাবে সত্যজিৎ ব্যবহার করেছেন 'শুকুতে', 'মওকা', 'দুগ্‌গা', 'কাউকে', 'বিস্কুট', 'ভালুক', 'খ্যামতা', 'গেস্‌ল' এবং 'দেখলুম' 'পড়লুম' প্রভৃতি শব্দগুলি। অসামান্য aural memory বা শ্রবণস্মৃতি না থাকলে এই ধরনের সংলাপ লেখা সম্ভব নয়। গল্পটা পড়া না থাকলেও এই সংলাপ পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বক্তার চাল, চলন, চেহারা, শিক্ষা-দীক্ষা সবকিছু আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বাংলা গদ্য এখানে নির্ভুল আয়নার কাজ করছে নিঃসন্দেহে।

বাংলার এই সংলাপী বা কথ্য মেজাজের বিরোধিতা না করেও যেন ভারসাম্য বজায় রাখতেই সত্যজিৎ পাশাপাশি লেখেন, 'বারীন ভৌমিক একটা হাই তুলে নিজেকে নিরুদ্বিগ্ন প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন' (বারীন ভৌমিকের ব্যারাম); কিংবা, 'গতকাল খুব স্বাভাবিক কারণেই রতনবাবু ট্রেনের দৃশ্যটা উপভোগ করতে পারেন নি। আকাশে মেঘ অবিশ্যি কাটে নি, কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না' (রতনবাবু আর সেই লোকটা); কিংবা, 'বাইরে পূর্ণিমার চাঁদ; উত্তরের জানালা দিয়ে ঘরের মেঝেতে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, তারই প্রতিফলিত আলোয় ধূর্জটিবাবুকে দেখতে পাচ্ছি' (খগম)। তৎসম এবং তদ্‌ভব শব্দের সহজ সমন্বয় থেকে কীভাবে জন্ম নিচ্ছে গদ্যের সুষমা এবং ওজন তার নমুনা পাওয়া যাবে ওপরের উদাহরণগুলিতে।

লেখার মেজাজ অনুযায়ী সত্যজিতের গদ্যের চরিত্রও অবশ্যই পালটে-পালটে যায়। ভাষার ওপর স্বাভাবিক দখল ছাড়া গদ্যের এই পরিবর্তন সম্ভব হত না! 'ফটিকচাঁদ'-এর গদ্য একেবারে ভিন্ন জাতের। সত্যজিৎ তাঁর আর কোনও গল্পে এই ধরনের গহন মনের ভাষা লেখেন নি। 'ফটিকচাঁদ' শুরু হচ্ছে এইভাবে : 'ও যে কখন চোখ খুলেছে ও জানে না। চোখে কিছু দেখার আগে ও বুঝেছে ওর শীত করছে, ওর গা ভিজে, ওর পিঠের তলায় ঘাস, ওর মাথার নিচে একটা শক্ত জিনিস। আর তার পরেই বুঝেছে ওর গায়ে অনেক জায়গায় ব্যথা। তবু ডান হাতটাকে তুলে আস্তে আস্তে ভাঁজ করে মাথার পিছনে নিতেই হাতে ঠান্ডা পাথর ঠেকল। বড় পাথর, হাত দিয়ে সরাতে পারবে না। তার চেয়ে মাথাটা সরাই না কেন? ও তাই করল, আর তাতে ও আর একটু চিত হয়ে গেল।'

ছোট ছোট শব্দ আর সংক্ষিপ্ত বাক্যের ঠোকাঠুকিতে গড়ে উঠেছে এই নাটকীয় গদ্য। আমাদের বুঝতে দেওয়া হচ্ছে না ঠিক কার বিষয়ে এতগুলো লাইন। কিন্তু, ক্রমশ ফুটে ওঠা চৈতন্যের মত একটা ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠছে এখানে—অজ্ঞান অবস্থা থেকে জ্ঞান ফিরে আসার ছবি, অস্পষ্ট

অস্বস্তি থেকে তীব্র যন্ত্রণার ছবি এবং অপরিচিত পরিবেশের ছবি। এখানে ভাষার নাটকীয়তা এবং অন্তর-ছন্দ তৈরি হচ্ছে প্রত্যেকটি বাক্যের নির্দিষ্ট নিস্বন থেকে। লাইনগুলো পড়তে গেলেই যেন কণ্ঠস্বরের এই ওঠানামা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে : 'ও যে চোখ খুলেছে ও জানে না। চোখে কিছু দেখার আগে ও বুঝেছে ওর শীত করছে, ওর গা ভিজে, ওর পিঠের তলায় ঘাস, ওর মাথার নিচে একটা শক্ত জিনিস। আর তার পরেই বুঝেছে ওর গায়ে অনেক জায়গায় ব্যথা। তবু ডান হাতটাকে তুলে আস্তে আস্তে ভাঁজ করে মাথার পিছনে নিতেই হাতে ঠান্ডা পাথর ঠেকল। বড় পাথর, হাত দিয়ে সরাতে পারবে না। তার চেয়ে মাথাটা সরাই না কেন? ও তাই করল, আর তাতে ও আর একটু চিত হয়ে গেল'। বাক্য বিন্যাসের এই স্বাভাবিক অথচ নাটকীয় চেহারাটা সত্যজিৎ-চলচ্চিত্রের সংলাপ শৈলীকেও ঘনিষ্ঠ সাহায্য করেছে আগাগোড়া। সত্যজিতের সাহিত্যভাষা ও চলচ্চিত্রভাষার মধ্যে সাযুজ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চলচ্চিত্রের ভাষাতেও সত্যজিৎ নিয়ে আসেন নাটকীয় অথচ সহজ দৃশ্যবিন্যাস, মৌলিক অথচ মনোগ্রাহী মন্তাজ, এবং সিনেমা-ব্যাকরণের ধ্রুপদী শাসনের সঙ্গে তিনি মিশিয়ে দিতে পারেন তাঁর নিজস্ব উচ্চারণের স্বাধীন ভঙ্গি, ঠিক যেমন ঘটে তাঁর সাহিত্যে।

বাংলা গদ্যের ব্যবহারে 'পিকুর ডায়রি'র মত 'ফটিকচাঁদ'ও অনন্য। এ-গল্পে সত্যজিতের গদ্য অবশ্যই একটি ভিন্ন মাত্রা খুঁজে পেয়েছে। দুভাগে এই দ্বিতীয় মাত্রার সন্ধান পেয়েছে বাংলা গদ্য এ গল্পে। ফটিকচাঁদের ভাষার ছান্দিক সুষমা এই গল্পের বিশেষ আকর্ষণ নিঃসন্দেহে। ভাষার আপাত লাবণ্যের চাদরের তলায় সত্যজিৎ যে কান্ডটা এখানে ঘটান তাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলা গদ্যকে টেনে নিয়ে যায় রূপান্তরের বিন্দুতে। আমরা বলতেও পারি সারল্য ও সুষমাকে বর্জন না করেও সত্যজিৎ এখানে এক ধরনের মনোবিশ্লেষণী গদ্যকে সম্ভব করে তুলেছেন। কয়েকটা লাইন এলোমেলোভাবে এখানে তুলে দিচ্ছি :

(১) 'চ্যাপটা সাদা গোল জিনিসটার নাম যে লুচি সেটা ওর কিছুতেই মনে পড়ছিল না, শেষে আকাশে অনেকগুলো পাখিকে একসঙ্গে উড়তে দেখে চিল মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লুচি মনে এসে গেল।'

(২) 'রাস্তায় কাঁচ আর লাল দেখে ভয় পেল। লাল আর কোথাও নেই। হ্যাঁ, আছে। ওর জামায় আছে, হাতে আছে, মোজায় আছে। ও আর থাকবে না এখানে। ওই যে রাস্তা এঁকে-বেঁকে চলে গেছে।'

(৩) 'সবচেয়ে হাসি পায় মনে করলে, দিদির বিয়েতে গ্রামোফোনে বিসমিল্লার সানাই, আর পুরনো রেকর্ড ফাটা জায়গায় এসে প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও একই জিনিস বারবার আর তাই শুনে সামিয়ানার তলায় যত লোক সব খাওয়াটাওয়া ফেলে হো হো হো হো। আর হ্যাঁ, দার্জিলিং তো মনে পড়েই, আর তার আগের বছর পুরী, তার আগে মুসুরি, তার আগে আবার দার্জিলিং, আর তারও অনেক অনেক আগে ছোটবেলায় ওয়ালটেয়ারে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে পায়ের তলায় বালি সরে সরে যাচ্ছে আর সুড়সুড়ি লাগছে আর মনে হচ্ছে ভিজে ভিজে ঠান্ডা ঠান্ডা লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে সরসর সরসর করে সরে যাচ্ছে, আর মা যেই বললেন, পড়ে যাবে বাবলু সোনা, অমনি ধপাস্ ঝপাং!—মা'র কথা অবিশ্যি বেশি মনে নেই। এখন খালি একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। এখন বাড়িতে লোক আর নেই। এত বড় বাড়ি আর তিনজন মাত্র লোক। ছোটকাকার তো মাথাই খারাপ। আগে ছিল বাড়িতেই, যখন মাথা ঠিক ছিল। এখন লুম্বিনীতে।......'

(৪) 'জোনাকি মানে ওখানে গাছ। গাছে আশেপাশেই জোনাকি ঘোরে। আর ঝোপেঝাড়ে ঘোরে জোনাকি। ওখানে অনেক জোনাকি। ওই যে কাছে, আবার একটু দূরে, আবার অনেক দূরে। তার মানে অনেক গাছ। অনেক গাছ একসঙ্গে থাকলে কী বলে? মনে পড়ছে না।.....

ও জানে উঠলে ব্যথা লাগবে। তাও ও উঠল। উঠেই আবার পড়ে গেল। তারপর আবার উঠে এগিয়ে গেল গাছের দিকে, গাড়ির উলটো দিকে।

এটা জঙ্গল। একে বলে জঙ্গল। মনে পড়েছে। এখনো রাত।'

নিঃসন্দেহে বলা যায় এখানে ভাষার ছান্দিক বৈচিত্র্য স্মৃতির নিজস্ব বিচরণ-ভূমির কাছে ঋণী। যেভাবে, যেপথে একটি বিপন্ন, বিপর্যস্ত মন অস্পষ্টভাবে স্মৃতির সূত্র ধরে খুঁজে পাচ্ছে তার বিচরণক্ষেত্র ঠিক সেইভাবে, সেই পথে সত্যজিৎ রচনা করেছেন সেই মনের সমস্ত উচ্চারণ। ভাষার প্লাস্টিক ধর্মিতা এখানে বিস্ময়কর। একটি মনের সমস্ত ওঠানামা, ভাঙচুর, স্মৃতি-বিস্মৃতির বিভঙ্গ কত সহজে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওপরে উদ্ধৃত লাইনগুলির মধ্যে!

সত্যজিতের গদ্য তাঁর প্রবন্ধে স্বকীয়তা খুঁজে পায় সহজতা এবং ধ্রুপদী ঋজুতার সমন্বয়ে। তাঁর প্রবন্ধের আঁটসাঁট গঠন শুধু ভাবনাচিন্তার লজিক্যালিটি থেকে জন্ম নেয় না, ভাষার নীরন্ধ্রতাও এই গঠনের মূল উৎস। কোথাও কিন্তু তাঁর প্রবন্ধের গদ্যে অ্যাকাডেমিক চাপ পাঠককে কষ্ট দেয় না। কোথাও মনে হয় না ভাবনার প্রসার কিংবা মৌলিকতা আড়ষ্ট হয়ে পড়ছে পন্ডিতি গদ্যের কৃত্রিম দাবি মেটাতে। তাঁর প্রবন্ধ থেকে একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি: 'সত্যজিৎ রায় সমসাময়িক শহুরে সমস্যা নিয়ে ছবি তোলেন না—এধরনের একটা মতবাদ বাজারে চালু হচ্ছে বলে কানে আসে। এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে নাগরিক জীবনের ছবি তুলতে গেলে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে নগরের চেহারাটাকেও ছবিতে তুলে ধরতে হয়। অর্থাৎ, সে ছবির কাহিনীকে স্টুডিওর চৌহদ্দির মধ্যে বন্দী করে রাখা চলে না, মাঝে মাঝে তাকে শহরের রাস্তাঘাটে নিয়ে ফেলতে হয়। নাটকে নেপথ্যে ঘটনার যে রীতি হাজার বছর ধরে লোক মেনে এসেছে, চলচ্চিত্র একেবারে প্রথম থেকেই সে রীতি বর্জন করেছে। তাছাড়া চলচ্চিত্রে—বিশেষ করে আধুনিক সমস্যামূলক কাহিনীতে—বাস্তবধর্মিতাই হল শিল্পের রীতি। সুতরাং স্টুডিওতে কৃত্রিম উপায়ে শহরের বাইরের চেহারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কাজেই ক্যামেরা নিয়ে রাস্তা-ঘাটে শুটিং করা ছাড়া কোন উপায় নেই। গত পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে একটিবারও যিনি এ কাজ করতে চেষ্টা করেছেন, তিনিই জানেন এটা কী দুরূহ কাজ' (দুটি সমস্যা—বিষয় চলচ্চিত্র)। চিন্তার স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা ছাড়া প্রবন্ধের ভাষাকে এই জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় না। সত্যজিৎ এখানে যেন সরাসরি কথা বলছেন আমাদের সঙ্গে। তাঁর কন্ঠস্বর গম্ভীর অথচ তাঁর ভাষায় কোনও পোশাকি বাহুল্য নেই। তাঁর গদ্য আমাদের টেনে রাখে, তরতর করে এগিয়ে যায় আটপৌরে স্বচ্ছতা এবং মৌলিক গাম্ভীর্যের যুগ্ম অভিঘাতে।

সত্যজিৎ রায়ের ইংরেজি গদ্যের ওপর একটি পৃথক প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে। তা এখানে সম্ভব নয় বলেই একটি প্যারাগ্রাফে তাঁর ইংরেজি গদ্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে উল্লেখ করছি মাত্র। অনেকে বলেন, সত্যজিৎ ইংরেজের মত ইংরেজি লেখেন। অধিকাংশ ইংরেজ ভাল ইংরেজি লেখেন না। বার্নাড শ দুঃখ করেই বলেছিলেন ইংরেজ বাপ-মায়েরা কবে তাদের ছেলেমেয়েদের একটু ইংরেজি শিক্ষা দেবে? সত্যজিতের ইংরেজি একান্তভাবে সত্যজিতের—তাঁর বাংলার মতই ঋজু, সরস, স্বাভাবিক এবং মৌলিক।

যেহেতু সত্যজিতের ব্যক্তিত্বে কোনও খাদ নেই, নামমাত্র কৃত্রিমতার আভাস নেই, তাঁর বাংলা এবং ইংরেজি গদ্যেও তাই কোনও কৃত্রিমতার খাদ মেলে না। এই অর্থে তাঁর ভাষা মৌলিক। তাঁর ইংরেজি ভাষার বিদ্যুৎবাহিতা এবং আকর্ষণ ক্ষমতা একই সঙ্গে উৎসারিত ভাষার অসামান্য চিত্রধর্মিতা থেকে। এবং যেখানে ভাষা চূড়ান্তভাবে চিত্রধর্মী কিংবা রুক্ষ ভাবে বিশ্লেষণী—উভয়-ক্ষেত্রেই ইংরেজি ইডিয়মের ওপর সত্যজিতের অসামান্য নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে কাজ করছে যে আমাদের অবাক হয়ে যেতে হয়। বাইরে থেকে একটা ভাষা শিখে সেই ভাষার 'জিনিয়াস'-এর মধ্যে এতদূর প্রবেশ করা অসম্ভব। তাঁর ইংরেজি পড়তে পড়তে মনে হয় ভাষার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি 'টার্ন'

অফ ফ্রেজ', প্রতিটি 'ইডিয়ম' যেন তার নিজস্ব উচ্চারণের ভঙ্গি নিয়ে তৈরি—একটি পরদেশী ভাষায় তিনি এতটাই সাবলীল।

এ-ছাড়া তাঁর ইংরেজিতে স্যাক্সন শব্দের বাহুল্য এবং ল্যাটিন শব্দের ইচ্ছাকৃত বর্জন নিয়ে আসে আধুনিক ইংরেজির ঈপ্সিত টার্সনেস। মনোসিলেবিক শব্দের প্রতি তাঁর ঝোঁক এই টার্সনেসকে কিংবা ঋজুতাকে আরও প্রসারিত করে। নিচের উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে কিভাবে তিনি এগারোটি মনোসিলেবিক শব্দকে ব্যালেন্স করছেন দুটি বিশেষণের অভিঘাতের বিরুদ্ধে। 'Much of the best things in a Ford film have the mysterious, indefinable quality of poetry.' সত্যজিৎ রায়ের ইংরেজি ইডিয়ম ব্যবহারের ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি 'A loud-speaker offered the use of a telephone with connections to Osaka.' ব্যাপারটা সত্যজিৎ এত সহজে ছোট কথায় বলতে পারলেন একটাই কারণে—তিনি সেই বিরল 'না-ইংরেজদের' একজন যিনি ইংরেজি ভাষায় লিখতে পারেন, 'এ লাউডস্পিকার অফারড দি ইউজ অফ এ টেলিফোন'।

সত্যজিতের ইংরেজি ভাষার ছন্দ এবং গতি তৈরি হচ্ছে ছোট ছোট শব্দের ঠোকাঠুকি, ছোট শব্দের সঙ্গে পোশাকি শব্দের সচেতন সমন্বয়, এবং বিশ্লেষণেব চাটুল্য কিংবা গাম্ভীর্য থেকে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি, 'We were on our way back to Tokyo from Kyoto. The time was around midday. Pink-cheeked girls in uniforms wheeled food-trolleys up and down the gangway of the compartment selling packed curry and rice.' এইভাবে শুরু হচ্ছে কুরোসাওয়ার ওপর সত্যজিতের বিখ্যাত প্রবন্ধ। ভাষার চিত্রধর্মিতা এবং সূক্ষ্ম হিউমার এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সত্যজিতের ইংরেজিতে কখনও কখনও ব্যাকরণ আলগা হয়ে পড়ে এত সহজ, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে যা বিদেশীর লেখা ইংরেজিতে প্রায় দেখাই যায় না। এই সহজ, অনাড়ম্বর, আত্ম-অচেতন শৈথিল্যই যেন তাঁর ইংরাজিকে মুখের কথার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর একেবারে সাম্প্রতিক লেখা "TELLUS" থেকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি : "What makes it function are nerve-cells called neutrons" (The Illustrated Weekly, May 26). ইংরেজির মাস্টারমশাইরা "makes" কেটে "make" করে দেবেন অবশ্যই। কিন্তু শতকরা ৯৯ জন শিক্ষিত ইংরেজ কথা বলতে গেলে এখানে "makes"-ই বলবেন, কেন না "nerve-cells" যে "what"-এর মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ভারব্-এর প্লুরাল ফর্ম দাবি করবে, সে কথা স্বাভাবিকভাবে মনে থাকবে না। একমাত্র অতি সচেতনভাবে ইংরেজি বলতে বা লিখতে গেলেই সর্বদা এই ধরনের ভুল এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু সেই আড়ষ্টতা, দ্বিধা, ব্যাকরণ-সচেতনতা থেকে সত্যজিতের মত ইংরেজি লেখা যায় না।

।। ২৬ ।।

সত্যজিৎ-চলচ্চিত্রের চরিত্র অনেক দূর পর্যন্ত সংলাপ-নিয়ন্ত্রিত। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় আর কোনও ভারতীয় চলচ্চিত্রকার সংলাপ রচনায় এতদূর বাস্তবধর্মী অথচ মর্মস্পর্শী, এতদূর নাটকীয়তা বর্জিত অথচ আকর্ষণীয়, এতদূর সাহিত্য রসে সিঞ্চিত অথচ সিনেম্যাটিক হতে পারেন নি। 'উদয়ের পথে' ছবির চটকদার কৃত্রিম সংলাপ বাংলা ছবিতে সংলাপের যে ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং যে ধারাটি সাহিত্যিক এবং বাংলা সিনেমার সংলাপ লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অবদানে সমৃদ্ধ হয়, তারই যেন সোচ্চার প্রতিবাদ সত্যজিৎ-রচিত সংলাপ। 'পথের

পাঁচালী'র সংলাপ জাতে, গোত্রে, ধর্মে এতদূর ভিন্ন যে বাংলা ছবিতে এর কোনও পূর্বাভাস খুঁজতে যাওয়া বৃথা। 'পথের পাঁচালী'র চিত্রনাট্যটি পড়লে বোঝা যায় সিনেমার সংলাপ লেখার এই ধরন এবং ধারার কোনও পূর্ব নজির নেই। অভিনবত্বটা আসছে সংলাপের সিনেমা-ধর্মিতা থেকে। প্রশ্ন উঠতে পারে সিনেমা-ধর্মিতা বলতে ঠিক কি বোঝাচ্ছি আমি?

সত্যজিৎ রায় যখন চলচ্চিত্রের পরিচালনায় এলেন তখন বাংলা সিনেমার সংলাপ ছিল পুরোপুরি নাট্যধর্মী। অর্থাৎ সেই সংলাপের চরিত্র, ভাষা, সংলাপ উচ্চারণে কণ্ঠের ভঙ্গি, উচ্চারণের ওঠা-নামা, সবকিছু নির্ধারিত হত মঞ্চাভিনয়ের কতকগুলি আবশ্যিক শর্তের দ্বারা। সিনেমায় যেমন প্রায় প্রতি মুহূর্তে দৃশ্যের ছেদ থাকে এবং দৃশ্যের একটি ভগ্নাংশে যাওয়া হয় কাটিং-এর সাহায্যে, মঞ্চাভিনয়ে সেরকম ঘটে না। সেখানে ঘটনা ঘটতে পারে একটানা, ছেদহীন ভাবে। নাটক এবং সিনেমার এই মৌলিক ভিশুয়াল পার্থক্য থেকে যে রচিত হতে পারে থিয়েট্রিক্যাল এবং সিনেম্যাটিক সংলাপের সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন চরিত্র, এই কথাটা 'পথের পাঁচালী'র আগে আর কোনও ভারতীয় চলচ্চিত্রকারের মনে আসেনি। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, আজকের অধিকাংশ বাণিজ্যিক ভারতীয় ছবির সংলাপ থিয়েটারের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছে। পারেনি তার কারণ অধিকাংশ বাণিজ্যিক ভারতীয় ছবিই সিনেমাকে বিশুদ্ধ ভিশুয়ালের মাধ্যমে এমন ভাবে আবিষ্কার করতে পারেনি যেখানে সংলাপ হয়ে উঠবে টুকরো টুকরো দৃশ্য এবং এডিটিংয়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। একথা অধিকাংশ চলচ্চিত্রকারই মনে রাখেন না যে একটি সিকোয়েন্সকে যেমন টুকরো-টুকরো দৃশ্যে কিংবা ভিশুয়ালে ভেঙে না ফেললে চলচ্চিত্রায়ণ সম্ভব নয়, তেমনি এই কাটিং বা ভাঙচুরের ছন্দের সঙ্গে সংলাপের ছন্দকে মিলিয়ে দিতে না পারলেও সিনেম্যাটিক সংলাপ রচনা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, চলচ্চিত্রের এডিটিংয়ের ছন্দকে, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার ভঙ্গিকে মাথায় রেখেই সম্ভব এমন সংলাপ রচনা যেখানে সংলাপের ছন্দের সঙ্গে ভিশুয়ালের এবং স্ট্রাকচারের সামগ্রিক ছন্দের কোনও গরমিল থাকবে না। সত্যজিতের এডিটিংয়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল 'কাটিং থ্রু অ্যাকশন' অর্থাৎ নির্দিষ্ট ঘটনার মাধ্যমে (সে যত সামান্য ঘটনাই হোক না কেন) দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়া। এতে দৃশ্যান্তরের জার্ক বা ধাক্কাটা প্রায় বোঝাই যায় না। সত্যজিতের সংলাপ এই হোঁচটহীন এডিটিংয়ের কোনও বিরোধিতা করে না। এডিটিংয়ের সঙ্গে, সিনেম্যাটিক সংলাপ কীভাবে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে পারে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি 'পথের পাঁচালী' থেকে।

দাওয়া। সর্বজয়া তোরঙ্গ থেকে বাসন বের করছে। এমন সময় আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ইন্দির উঠোনে ঢোকে। ইন্দিরের গায়ে নতুন চাদর সর্বজয়ার নজরে পড়ে।
সর্বজয়া : ঠাকুরঝি!
রোদে মেলা কাপড়ের পাশ দিয়ে ইন্দির ঘরে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করে। সর্বজয়া ছাড়ে না।
সর্বজয়া : ঠাকুরঝি!
ইন্দিরকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়, ঘুরে সর্বজয়ার দিকে তাকায়।
সর্বজয়া : শোন—এদিকে এস।
এগিয়ে আসতে আসতে ইন্দির হাসতে চেষ্টা করে।
ইন্দির : কি হল?
সর্বজয়া : চাদর কোথায় পেলে?
ইন্দির হাসে, উত্তর দেয়, তারপর ঘুরে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।
ইন্দির : ওই—ও পাড়ার রাজু—দিল।
সর্বজয়া : দিল মানে? শোন—তুমি না চাইতেই দিল?
ইন্দির তাকায় না।

ইন্দির : চাইব কেন?
ভয়ানক রেগে সর্বজয়া সশব্দে তোরঙ্গের ডালাটা বন্ধ করে, ওঠে, তারপর যেতে গিয়ে তার শাড়ির আঁচল পাখির খাঁচায় আটকে যায়। ইন্দির ইতিমধ্যে তার ঘরের দাওয়ায় পেঁছে গেছে।
ইন্দির : বুড়ো মানুষ—সন্ধের পর একটু শীত শীত করে—তাই বললুম—

লক্ষণীয় যত তীব্র নাটকীয় এবং মর্মস্পর্শী এই দৃশ্য তত আপাতভাবে নাটকীয়তা বর্জিত এবং সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক সর্বজয়া এবং ইন্দির-এর সংলাপ। বাংলা ছবির সাধারণ প্রবণতা অনুযায়ী এমনি একটি দৃশ্যে সংলাপে নাটকীয়তা আসত অনিবার্যভাবে। সত্যজিৎ এখানে সংলাপকে আপাতভাবে এতদূরে স্তিমিত করে রেখেছেন যাতে দৃশ্যের আবেদন, মুহূর্তের জন্যেও ব্যাহত না হয়। সংলাপের নাটকীয়তা-বর্জিত স্বাভাবিকতার আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি 'অপরাজিত' থেকে।

কাশীর জমিদার বাড়ি। অসুস্থা জমিদার-বউ (ল্যাহিড়ী গিন্নি) বিছানায় শুয়ে আছে। সর্বজয়াকে লক্ষ্য করে বলছে—
গিন্নি : কাশীতে কদিন আছো?
সর্বজয়া : একবছর।
গিন্নি : ওটি তোমার ছেলে বুঝি?
সর্বজয়া : হ্যাঁ।
গিন্নি : এর আগে কোথাও রান্নার কাজ করেছো?
সর্বজয়া : না।
সর্বজয়া ও অপু দাঁড়িয়ে।
গিন্নি : সামলিয়ে নিতে পারবে তো? আমিষ নিরামিষ, দুরকমই রান্না করতে জানো তো?
সর্বজয়া : হ্যাঁ।
গিন্নি : বেশ। পাঁচ টাকা করে দেবো। এর আগে যে ছিলো সে তাই পেতো। তাতে তোমার চলবে তো?
সর্বজয়া : তাই দেবেন।
গিন্নির মাথার দিকে খাটিয়া ধরে দাঁড়িয়ে আছে মোক্ষদা ঝি।
গিন্নি : হ্যাঁ, আমরা থাকি কিন্তু দেওয়ানপুরে—বছরে একবার কাশীতে আসি। এবার অবিশ্যি বেশিদিন থাকব, শরীরটা না সারা পর্যন্ত যাব না। তোমার কাজ যদি পছন্দ হয়......তাহলে কিন্তু তোমায় সঙ্গে করে দেওয়ানপুরে নিয়ে যাব......তোমার আপত্তি হবে না ত?
সর্বজয়া : না।
ল্যাহিড়ী গিন্নি ম্লান হাসেন।
গিন্নি : তোমার ছেলের নাম কি?
সর্বজয়া অপুকে বলে—
সর্বজয়া : নাম বল—
অপু : শ্রী অপূর্বকুমার রায়।
সর্বজয়া : অপু বলে ডাকি।
গিন্নি : অপু......তাহলে তোমাকে অপুর মা বলে ডাকব। মোক্ষদা, এনাকে এনার ঘরটা দেখিয়ে দাওগে যাও।
ল্যাহিড়ী গিন্নি আঁচল থেকে চাবিটা খুলে মোক্ষদার হাতে দিলেন। মোক্ষদা সর্বজয়া ও অপুকে নিয়ে বারান্দা দিয়ে ওদের থাকার জায়গা দেখিয়ে দিতে যাচ্ছে।
মোক্ষদাকে অনুসরণ করে সর্বজয়া ও অপু সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়।
একতলার বারান্দা দিয়ে মোক্ষদা, সর্বজয়া ও অপু ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

মোক্ষদা : এই নিন—আমি আপনার জিনিসপত্রগুলো দেখিগে।
সর্বজয়ার থাকার ঘরের অবস্থা দেখা যায়।

সর্বজয়ার দারিদ্র্য, অপমান, অপুর অসহায়তা এবং লাহিড়ী গিন্নির শীতল দূরত্ব সবকিছু কত সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখানে সংলাপের মাধ্যমে। সংলাপের কোনও জায়গায় কোনও অতি-শয়োক্তি নেই, নেই ভাবাবেগ। অথচ সংলাপ থেকে ভেসে উঠছে একটা স্তিমিত দুঃখের ছবি যা আমাদের কষ্ট দেয়।

সত্যজিৎ-রচিত সংলাপের আর এক বৈশিষ্ট্য হল প্রচ্ছন্ন হিউমার। সংলাপ যেখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, পরিমিত সেখানেও হাস্যরসের বিস্তার কোনভাবেই বাধা পায় না। 'চারুলতা' থেকে এমন একটি উদাহরণ দিচ্ছি যেখানে সংলাপের চূড়ান্ত সিনেম্যাটিক পরিমিতি বা ডিসিপ্লিনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে রয়েছে হিউমার। এবং দৃশ্যের টেনশনকে বিপুলভাবে সাহায্য করছে ছোট ছোট, কাটাকাটা এই সংলাপ।

চারু ও তার বৌদি মন্দাকিনী নকশা-করা শীতলপাটির উপর বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে তাসের সহজতম খেলাটি, অর্থাৎ গাধা-পেটাপিটি খেলছে। আমরা কিছুক্ষণ খেলাটা খুঁটিয়ে দেখি। তাসটা পড়লে খুব কাছ থেকে সেটা দেখছি, একটার উপরে আর একটা—যতক্ষণ না তাসের চেহারা মিলে গিয়ে একজন খেলায় জয়ী হয়।

ক্যামেরায় খুব কাছ থেকে তাসগুলো দেখা যায়।
মন্দা : রুইতন......হরতন...... চিড়িতন।
দূর থেকে কুলপীঅলার ডাক শোনা যায়—'কুলপি মালাই'......'মালাই বরফ' ! মন্দা হঠাৎ সেই ডাকে উঠে আসে।
মন্দা : ওই কুল্‌পি !
চারু : থাক্ আর কুল্‌পি খায় না—
মন্দা ধমক খেয়ে আবার খেলায় মন দেয়।
মন্দা : রুইতন......হরতন......চিড়িতন......
চিড়িতন চিড়িতন মিল হয়ে মন্দা পিঠ পেয়ে যায় !
মন্দা : তোকে বললুম পারবিনে আমার সঙ্গে।
চারু : পারাপারির আর কী আছে এতে ! বুদ্ধি ত লাগে না !
মন্দা : মনের জোর চাই—ইস্কাপন-চিড়িতন—কর্তাকে ত বলি, তোমার মনের জোর নেই—তাই তোমার—
দু'জনকে একত্রে খেলতে দেখা যায়। তাস ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত কে জিতবে কে জানে !
মন্দা : ইস্......কাপন—আয় চিড়েভাজা......এস বাবা হরুঠাকুর......ও মা, আর মাত্র তিনটে তাস !
মন্দা : ওমা.........ঈস্ ?
চারুর মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য নেই। সে যেন জানে সেই জিতবে। এবং হলও তাই। মন্দার রুহিতনের উপর চারু শেষ তাস খেলল—রুহিতন।
চারু তাসগুলো একত্র করে নেয়।
চারু : হল ত, মনের জোর।—এই শোন্, চারটে বেজে গেছে—ব্রজকে বল না, আপিসে চা দিয়ে আসবে।
মন্দা বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই চিৎকার দেয়।
মন্দা : ব্রজ—

চারু : উঃ তুই না !—
মন্দা : যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি। তোর চাকরও বাপু কানে খাটো—সাতবার না ডাকলে সাড়া দেবে না।
মন্দা খাট থেকে উঠে অঙ্গভঙ্গী করে বেরিয়ে যায়।

মন্দা এবং চারুর মধ্যে তাস খেলার টেনশন যে ভাবে সত্যজিৎ গড়ে তুলেছেন প্রায় শুধুমাত্র সংলাপের মাধ্যমে তা সম্ভব হত না সূক্ষ্ম রসবোধ ছাড়া। কাটাকাটা সংলাপ এখানে দৃশ্যটির সম্পূর্ণ পরিপূরক একাধিক দিক থেকে। এক, এই স্বাভাবিক সংলাপ তাস খেলার দৃশ্যটিকে অত্যন্ত বাস্তব করে তুলেছে। দুই, সংলাপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হাস্যরস সিকোয়েন্সটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তিন, সংলাপের মাধ্যমে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মন্দা ও চারুর মানসিক ও চারিত্রিক বৈপরীত্য। চার, মন্দা যেখানে বলছে মনের জোর চাই, সেখানকার লুকনো, আয়রনি দৃশ্যের মজাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা ক্রমশ বুঝতে পারি মন্দার আর যাই থাক মনের জোর নেই। চারু যখন বলে, গাধা পেটাপিটি খেলার আছেটা কি, কারণ এতে তো বুদ্ধি লাগে না, আমাদের চোখে মুহূর্তে ধরা পড়ে মন্দার সঙ্গে চারুর পার্থক্য।

সত্যজিতের সংলাপের ধরন ক্রমশ পালটেছে। কখনও কখনও মনে হয় তিনি নিজেই নিজের সংলাপী দক্ষতার প্রেমে পড়ে গেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক ছবিগুলি সংলাপের সমস্ত বিদ্যুৎ-চমক সত্ত্বেও কিংবা হয়ত সেই কারণেই শব্দের ভারে কিছুটা আড়ষ্ট। 'ঘরে-বাইরে'র বেশ কিছু দৃশ্যের সংলাপ এতবেশি ভারি এবং দীর্ঘ যে মনে হয় কথাকে তিনি যেন দৃশ্যের অভাব পূরণের জন্যে ব্যবহার করেছেন। আগে যে তিনি দীর্ঘ সংলাপ লিখতেন না তা নয়, কিন্তু সংলাপকে কখনও ভারী হয়ে ঝুলে পড়তে দিতেন না। চমৎকার একটা উদাহরণ দিচ্ছি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' থেকে। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রনাথ ও অশোক এগিয়ে আসছে। ইন্দ্রনাথ রীতিমত উদ্দীপনার সঙ্গে কথা বলে চলেছে, আর অশোক গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে-কথা শুনছে।

ইন্দ্রনাথ : ফুটবলটা আমি খেলিনি কখনো। ওটা আমার এস্থেটিক সেন্সে লাগত। Too rowdy, তবে ক্রিকেটটা যে শুধু খেলিচি তা নয়—ভাল খেলতুম। একবার বালিগঞ্জের এগেন্স্টে প্রায় সেঞ্চুরি করেছিলুম। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ অবশ্য। ওদের spin bowler ছিল Paxton তখন গুগ্লি-টুগ্লির অত চলন হয়নি। লেগ ব্রেক, অফ্ ব্রেক—এই জানতুম। Paxton দিত লেগ ব্রেক। ওই বল করছিল। আমার তখন নাইন্টি সিক্স। রোদ পড়ে এসেছে, বুঝেচ। Over এর third কি fourth ball এর আগে হঠাৎ আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলছে—I'll bowl you an easy one now. Let's see you send it to the ropes. শুধু বললে না—কথাও রাখলে। সোজা বল—কিন্তু কোথায় ropes? আমার nerves তখন shattered আর ওদিকে wicket ও shattered!.....খেলাচ্ছলে ত নিতে পারি না। কোনো জিনিসটাকে! খেলাটাকেও না। আমরা বাঙালী! আমাদের কাছে সবই হল matters of life and death! অথচ এই খেলা জিনিসটাকে কী ভাবে নিচ্ছে—তার থেকে পরিষ্কার একটা জাতের calibre বোঝা যায়। বাঙালীদের sporting spirit নেই। তাদের ছিল, আর তাই তাদের মধ্যে কোনো pettiness ছিল না। একটা ভালো কাজ দেখলে তারা সেটার মর্যদা দিত......আর আজকাল? সব ফাঁকি। তাই backing ছাড়া এগোবার জো নেই। নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই তাই পরের কাঁধে ভর করে দাঁড়াও। আরে, একটু influential লোকের backing এ যে কাজ হবে তাতে আর আশ্চর্য কী? কিন্তু একটা অকেজো লোককে—একটা undeserving লোককে—বলে কয়ে একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলে তার পরিবার না হয় খেয়ে পরে বাঁচতে পারে—কিন্তু একটা আপিসের একটা গোটা ডিপার্টমেণ্ট যে ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে তার কী হবে? তোমরা—you are on the threshold of a career—তোমাদের এই কথাগুলো জানা দরকার। ইউনিয়ন

করলাম, strike করলাম, মিছিল করলাম, মনুমেণ্টের তলায় দাঁড়িয়ে কতগুলো গরম গরম কথা বললাম—এতে যেটুকু কাজের স্পৃহা থাকে তাও নষ্ট হয়ে যায়।

ইন্দ্রনাথ দাঁড়ায়। অশোকও। অশোক গম্ভীর। ইন্দ্রনাথের কথা যে তাকে ভাবিয়ে তুলেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এত দীর্ঘ সংলাপ অথচ কি আশ্চর্য নির্ভার! এখানে অশোক এবং ইন্দ্রনাথ পাশাপাশি হাঁটছে। এই দৃশ্যটি ব্যর্থ হয়ে যেত যদি না সত্যজিৎ এই সংলাপের মাধ্যমে ইন্দ্রনাথের চরিত্র ও মেজাজ প্রায় সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। সমস্ত দৃশ্যটাই ইন্দ্রনাথের সংলাপের গায়ে যেন হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

।।২৭।।

সত্যজিৎ রায় নিজেই নিজের দুরন্ত প্রতিযোগী—ক্রমশ এই কথাটাই প্রতিপন্ন হল এই দীর্ঘ ধারাবাহিক আলোচনা থেকে। এমন কথাও বলা যায় যে চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ এবং সাহিত্যিক সত্যজিৎ পরস্পরের মুখোমুখি এবং তাঁদের হাতে অস্ত্রের জায়গায় আয়না যাতে পরিপূরক প্রতি-বিম্বের যেন শেষ নেই। পরিচালক সত্যজিতের আন্তর্জাতিক সাফল্য এবং জনপ্রিয়তার বীজ সন্ধানে সত্যজিৎ-সাহিত্যের কাছে আমাদের যেতেই হবে। যে মানুষ এমন ছবি করতে পারেন, তিনিই এমন লিখতে পারেন। আবার যে লেখক এমন লিখতে পারেন, তাঁর পক্ষেই সম্ভব এমন সব চলচ্চিত্রের পরিচালনা।

সত্যজিতের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি তুখোড় গল্প-বলিয়ে, কী লেখায়, কী চলচ্চিত্রে। 'সদানন্দের খুদে জগৎ' কিংবা 'পিকুর ডায়রি' কিংবা 'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু'র মত অসামান্য গল্পে যে ধরনের স্টাইলিস্টিক এবং স্ট্রাকচারাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অভিনবত্ব রয়েছে, কিংবা 'ঘরে-বাইরে', বা 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি'র মত চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ যে ধরনের শৈলীগত এক্সপেরিমেণ্ট করার চেষ্টা করেছেন—এইসব কিছুকেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধৃত থাকতে হয়েছে নির্দিষ্ট কাহিনীর সনাতন কাঠামোর মধ্যে।

সত্যজিতের গল্প পড়লে বোঝা যায় এসব গল্পের অন্তরের জোর ভাষায়, ভঙিগতে এবং বিষয়ের বিন্যাসে। তাঁর চলচ্চিত্রের বিষয়েও এই একই কথা বলা যায়। স্বচ্ছতা, ঋজুতা, স্পষ্টতা এবং সাবলীলতা—এই হল মূলত সত্যজিৎ-সাহিত্য এবং সত্যজিৎ-চলচ্চিত্রের চারটি বিশেষ গুণ। এই চারটি বিশেষ গুণের কাছে চলচ্চিত্রকার এবং সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তাও ঋণী। আলোচনার উপসংহারে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সত্যজিৎ মূলত শিশু-সাহিত্যিক এবং তিনি 'সন্দেশ' নামের ছোটদের পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তাঁর প্রতিভা ও সময়ের এক বিপুল অংশ ব্যয় করে থাকেন হাজার কাজের মধ্যেও। অর্থাৎ ছোটদের জন্যে ভাবনায়, ছোটদের আনন্দ দেবার চেষ্টায়, তিনি মশগুল। চলচ্চিত্রকার হিসেবে কিন্তু তিনি তত বেশি ছোটদের কথা ভাবেন নি। মাত্র চারটি ছবি করেছেন ছোটদের জন্যে—'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'সোনার কেল্লা', 'জয় বাবা ফেলুনাথ' এবং 'হীরক রাজার দেশে'। 'পিকু' ছবিটি একটি শিশুকে নিয়ে, কিন্তু শিশুদের জন্যে নয়। ছোটদের জন্যে মাত্র চারটে ছবি করলেও, এই চারটি ছবি থেকেই বোঝা যায় ছোটদের পৃথিবীকে, ছোটদের আনন্দ, ভয়, ইচ্ছে, স্বপ্ন—সবকিছুকে কত গভীরভাবে সত্যজিৎ বোঝেন, কত সহজে ছোটদের একজন হয়ে যেতে পারেন তিনি। আবার

যেমন তাঁর লেখায় তেমনি ছোটদের জন্যে তৈরি তাঁর চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ বড়দেরও আনন্দের ইন্ধন এবং ভাবনার খোরাক যোগান অতি সহজেই।

ছোটদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সারা পৃথিবীতে সত্যজিতের জুড়ি মেলা ভার। আশ্চর্য লাগে যখন ভাবি তাঁর তুমুল ব্যক্তিত্বের সামনে বড়রাও যখন আড়ষ্ট হয়ে যান, তখন কিভাবে তিনি ছোটদের কত সহজে সহজ করে নেন। এ প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া যায় সত্যজিতের লেখায়। তাঁর লেখা এবং তাঁর 'সন্দেশ' সম্পাদনা উঠে আসছে একটা বিশেষ জীবনবোধ, একটা বিশেষ অ্যাটিটিউড থেকে। তিনি সুকুমার রায়ের ছেলে, উপেন্দ্রকিশোরের নাতি। ছোটদের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা তাই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বলতেও দ্বিধা করব না। ছোটদের কাছে তিনি যেন ম্যাজিকের মত মুছে দেন তাঁর ব্যক্তিত্বের দাপট, দূরত্ব। যে মানুষ ছোটদের জন্যে এমন লিখতে পারেন তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছোটদের কাছ থেকে এমন 'অভিনয়' জিতে নেওয়া। এই কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জোরের সঙ্গে বলা উচিত। তিনকন্যার 'পোস্টমাস্টার'-এ সেই ছোট্ট মেয়েটির অভিনয় কি কোনদিন ভুলতে পারব আমরা? কিংবা 'পথের পাঁচালী'র অপু-দুর্গার অভিনয়ও কি ভোলা সম্ভব? ছোটদের কাছ থেকে এমন অভিনয় প্রায় মিরাকল যা সত্যজিৎ রায়ের পক্ষেই ঘটান সম্ভব। তাঁর লেখায় শিশুচরিত্রগুলি এত স্বাভাবিক, এত জীবন্ত যে ক্রমশ তারা ছাপা পাতা থেকে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে, কচি কচি কণ্ঠস্বর আর ছোট ছোট মনের সব মান-অভিমান, ভয়-আনন্দ, দুষ্টুমি, কৌতূহল এবং নিষ্ঠুরতা নিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে আমাদের চোখের সামনে, যেন সিনেমার ছবির মত আমরা তাদের নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই। এতদূর ভিশুয়াল এই ট্রিটমেণ্ট যে সত্যজিৎ শুধু সিনেমা পরিচালনা করেন না, তিনি সিনেমা লেখেন বলতেও আমার সংশয় নেই। এইভাবে তাঁর লেখা এবং তাঁর চলচ্চিত্র পরস্পরের পরিপূরক।

সত্যজিতের চলচ্চিত্র এবং সত্যজিতের লেখা পাশাপাশি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় তিনি খুব বেশি এক্সপেরিমেণ্টাল মারপ্যাচে বিশ্বাস করেন না। তিনি অবশ্যই ভাবনার স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী এবং কী লেখায় কী চলচ্চিত্রে তিনি স্পষ্ট ভাষায় যেমন গল্প বলতে চান, তেমনি কেন্দ্রীয় বার্তাটিকেও পেঁছে দিতে চান তাঁর পাঠক এবং দর্শকের কাছে। এক্সপেরিমেণ্টাল মারপ্যাচ কমিউনিকেশনকে নানাভাবে ব্যাহত করতে পারে, এ-ধারণা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কৃত্রিম মারপ্যাচের মধ্যে না গিয়েও তিনি নিঃসন্দেহে ভারতীয় চলচ্চিত্রের যুগস্রষ্টা। তাঁর লেখা এবং তাঁর চলচ্চিত্র অন্তরের প্রেরণার দ্বারা পুষ্ট, এক অবিশ্বাস্য সৃষ্টিশীল প্রতিভার দ্বারা চালিত। সত্যজিৎ-সাহিত্যে এবং সত্যজিৎ-চলচ্চিত্রে তাই কৃত্রিম জটিলতার, সোচ্চার দেখানোপনার কোনও জায়গা নেই। 'সদানন্দের খুদে জগৎ'-এর মত গল্প কিংবা 'চারুলতা' অথবা 'অপরাজিত'র মত ছবি বিশুদ্ধ প্রতিভার ফসল ছাড়া আর কিছু নয়।

উপসংহারে আর একটি কথাও খুব জরুরীভাবে বলা প্রয়োজন। সত্যজিৎ-চলচ্চিত্র এবং সত্যজিৎ-সাহিত্যকে সম্পূর্ণভাবে বুঝে ওঠা, তার সব আভাস, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করা সম্ভব নয় সত্যজিতের জীবনের সব ঘটনা, সব খুঁটিনাটি, সব ওঠানামার সঙ্গে পরিচিত না হওয়া পর্যন্ত। আগেই বলেছি এদেশে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণী জীবনীলেখার তেমন কোনও ধারা এখনও গড়ে ওঠে নি, তার কারণ আমরা মানুষের সৃষ্টির চেয়ে তার ভাবমূর্তিকে বড় করে দেখি। এই 'রোম্যাণ্টিক' দৃষ্টিভঙ্গি বা অ্যাটিটিউড জীবনীলেখার বৈজ্ঞানিক ধারার বিরোধী। আমার ধারণা একদিন না একদিন সত্যজিৎ রায়ের সেই জীবনীটি লেখা হবে (এদেশে না হলেও বিদেশে) যেখান থেকে উঠে আসবে তাঁর চলচ্চিত্রে এবং তাঁর লেখায় বহু আভাস এবং ব্যঞ্জনার ব্যাখ্যা, বহু দ্যোতনার পাদটীকা।